জীবভূগোল

মুহাম্মদ মকবুল হুসেন

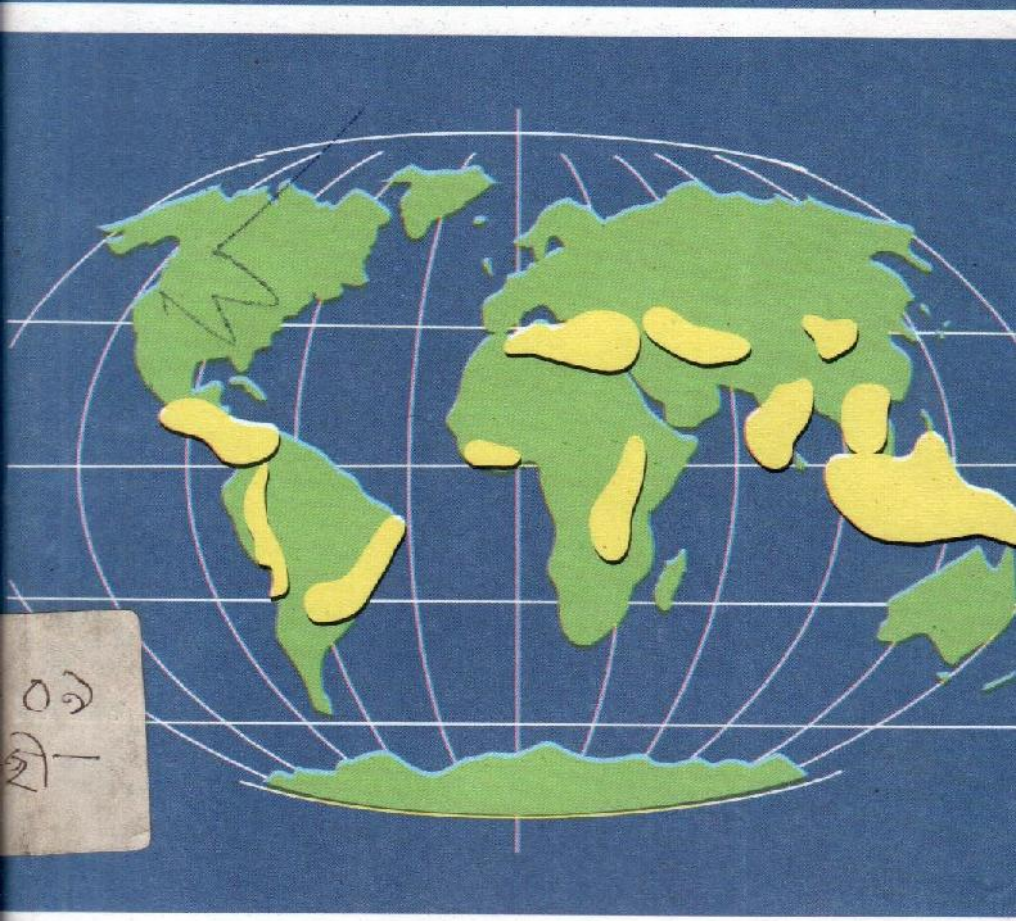

Web.

জীবভূগোল

BANSDOC Library * Dhaka

মুহাম্মদ মকবুল হুসেন
প্রাক্তন প্রফেসর, ভূগোল বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

BANSDOC Library
Accession No. 20900
Date 25.6.09 Sign

BANSDOC Library * Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবভূগোল
(উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভৌগোলিক পরিচয়)

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪ / জুন ২০০৭

বাএ ৪৫৭৯
(২০০৬–২০০৭ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ১০)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩২৫

প্রকাশক
ড. আব্দুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন খান

মূল্য
একশত বিশ টাকা

JIBOBHUGOL (Biogeography) by Mohammad Mokbul Hussain. Published by Dr. Abdul Wahab, Director (In charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2007. Price : Taka 120.00 only.

ISBN 984-07-4588-3

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ
এবং
স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

ভূমিকা

জ্ঞান আহরণের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠ। পৃথিবীর উপরিভাগকে অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের মিশ্রণ এবং মিলনস্থল হিসেবে গণ্য করা হয়। ভূতাত্ত্বিক সময়, সারণির তথ্য-উপাত্ত হতে প্রতীয়মান হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠের ধীরগতির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রথমে সমুদ্রতলে জীব এবং পরে স্থলপৃষ্ঠে ভূ-আবরণে উদ্ভিদ তথা বনানী এবং আরও পরে প্রাণীর আগমন ঘটে।

ভূ-পৃষ্ঠের এই আবরণ বনানী এবং প্রাণিভূগোলের আলোচনার এক অন্যতম ক্ষেত্র। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যার সম্মান শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে সীমিত পর্যায়ে বনানী ও প্রাণিসংক্রান্ত জ্ঞানের পাঠদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ বাংলা ভাষায় এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। তাই আমি 'জীবভূগোল' নামের এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি। বর্তমান পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবসম্বন্ধীয় যেসব গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে তা পর্যালোচনা করা এবং সেই মানের গ্রন্থ প্রণয়ন করা আমার সাধ্যাতীত। তদুপরি ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সেইসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়বস্তু খুব একটা প্রয়োজনীয়ও নয়।

জীবভূগোল গ্রন্থটিতে গতানুগতিক ধারায় বনানীর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ, প্রফেসর সিরাজুল আরিফিন ; মরহুম প্রফেসর এ.বি.এম. রেজাউল হক ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মউদুদ ইলাহী ও প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র দাস ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুল হক খান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর মোঃ আব্দুল মান্নান ও প্রফেসর সাইদুর রহমান ; ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ; উপ-প্রধান কার্টোগ্রাফার জনাব মোঃ খয়রাত আলী প্রামানিক, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিয়ান জনাব এ.কে.এম. সিদ্দিক এবং সেকশন অফিসার জনাব মোঃ আব্দুর রহিম-এর নিকট আমি অনুপ্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি। তাই আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই বিভাগের উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ কেরামত আলী পাণ্ডুলিপিটির কম্পিউটার কম্পোজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সেকশন অফিসার জনাব গোবিন্দ চন্দ্র ব্যানার্জি গ্রন্থভুক্ত মানচিত্র প্রণয়নে সহায়তা করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থটির ভুল-ত্রুটির সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজে বহন করছি। ছাত্র-ছাত্রীগণ গ্রন্থটির সাহায্যে উপকৃত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পরিশেষে বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা ও গর্ব বোধ করছি।

জুন ২০০৭

মুহাম্মদ মকবুল হুসেন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	জীবভূগোলের আওতাক্ষেত্র ও গুরুত্ব	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জীব ও উদ্ভিদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও শ্রেণিবিভাগ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	বনানী ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকা মানবকুলীয় নিয়ামক	৫৪
চতুর্থ অধ্যায়	:	প্রাকৃতিক বনানীর শ্রেণিবিভাগ ও বিস্তারণ	৭১
পঞ্চম অধ্যায়	:	তৃণ ভূমি পরিচয়	১০১
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	মরু অঞ্চলের বনানী	১১৫
সপ্তম অধ্যায়	:	প্রাণী : ভূ-পরিবেশগত প্রেক্ষাপট	১২৯
অষ্টম অধ্যায়	:	মানুষ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী	১৬৬
নবম অধ্যায়	:	বাংলাদেশের জীবকুল এবং প্রাণিকুল	১৯৬
		গ্রন্থপঞ্জি	২১৫

প্রথম অধ্যায়

জীবভূগোলের আওতাক্ষেত্র ও গুরুত্ব

১. জীবমণ্ডল

জীবভূগোলে জীবমণ্ডলের (Biosphere) উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক ধারায় ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবভূগোলে বনানী (vegetation) ও প্রাণীর বিস্তারণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। প্রথম শাখাটি উদ্ভিদভূগোল (Phytogeography or the geography of plants) এবং দ্বিতীয়টি প্রাণিভূগোল (Zoogeography or the geography of animals) নামে পরিচিত।

জীবভূগোলের আওতাক্ষেত্র স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। অনেক জীবভূগোলবিদ যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণী ভূগোলের ক্ষেত্রে শুধু বনানীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতি, তেমনি অনেকে আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়াও বিষয়টির ক্ষেত্র মৃত্তিকা ও মানবিক ভূগোলের কিছু অংশ পর্যন্ত বর্ধিত করার পক্ষপাতি।

বিজ্ঞানী ড্যানসেরু (Danscreau) এর ভাষায় প্রাণী ভূগোলের সীমিত ও সংক্ষিপ্ত অংশ হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি, বিস্তারণ, অভিযোজন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা (In the words of Danscreau, (Animal geography deals with the origin, distribution, adaptation and association of plants and animals)।[১] অবশ্য আলোচনার সময় ড্যানসেরু উল্লেখ করেছেন যে, এই বিষয়ের আওতাক্ষেত্র বনানী ও প্রাণী বাস্তুবিদ্যা (Ecology) এবং ভূগোলের বিষয়বস্তু ছাড়াও অনেক বিষয় যেমন, কৌলিবিজ্ঞান, মানবিক ভূগোল, নৃবিদ্যা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অনেক অংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে থাকে।

মারগারেট অ্যানডারসন বলেছেন যে, জীবভূগোল হচ্ছে মানুষকে প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ এবং তার প্রাণ ও প্রাণবিহীন সমগ্র পরিবেশের সাথে জীববিজ্ঞানভিত্তিক সম্বন্ধের পাঠ (Biogeography ; she said (Margaret Anderson), was the study of the biological relations between man, considered as an animal, and the whole of his animate and inanimate environment)[২] এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষ এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীববিজ্ঞানভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ লক্ষ্য করেছেন এবং মন্তব্যে পৌঁছেছেন যে, এই সংযোগের ভাল বা মন্দ ফলাফল মানুষ যেখানে এবং যেভাবেই কাজ করুক না কেন সেখানেই প্রকাশ পায়।

১. Robinson, H. 1972. Biogeogrophy, পৃষ্ঠা ৬

২. Robinson, H. 1972. Biogeogrophy, পৃ. ৭

সুতরাং প্রাণী ভূগোলের কিছু অংশ মৃত্তিকা এবং মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য জীবভূগোলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অবশ্য মানুষকে উচ্চতর প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সম্বন্ধীয় বিষয় নৃবিজ্ঞান ও মানব জাতির বিবরণ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনায় না এনে বরং প্রাণী হিসেবে জীবমণ্ডলে মানুষের কার্যকলাপ ও এই কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্যের পরিবর্তন, বিপর্যয় ও ধ্বংস করার কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয় জীবভূগোলের অন্তর্ভুক্ত (...shall not be concerned with man as man, for this is the subject of anthropology and ethnography, but rather with man as an animate being who plays an important role in the biosphere through his activities, activities which change, alter, upset and destroy the balance of nature)।[৩]

গতানুগতিক ধারায় উদ্ভিদ ভূগোল প্রকৃতির বনানীর বিস্তারণ বিশেষ করে সংবহন নালিকাবিশিষ্ট বনানী অর্থাৎ তরল পদার্থ পরিবাহী শিরাবিশিষ্ট দেহের বনানী ও এগুলোর পরিবেশ এবং বনানীর, একে অপরের উপরে প্রভাব বিষয়ক ব্যাপক গবেষণা জীববিজ্ঞানীগণের দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তু, বিশেষ করে বনানীর ইতিহাস ও বাস্তুবিদ্যা বা বাস্তুব্যবিদ্যার দ্বার উদ্ঘাটিত করেছে।

অন্যদিকে প্রাণী ভূগোল, যা প্রাণীর বিস্তারণ ও পরিবেশ এবং প্রাণীর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া অথবা অধ্যয়ন নির্দেশ করে তা উদ্ভিদ ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব সহকারে এবং ভিন্ন প্রবাহে গড়ে উঠেছে—যদিও শেষের দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইন, ওয়ালেস ও রিচার্ড হেসের প্রাণী ভূগোলে বাস্তুবিদ্যা (Ecological Animal Geography) এবং ডারলিংটন, এলটন, সিমসন ও ইয়ং-এর প্রাণীর বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রমের মূল্য কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এডওয়ার্ড এর ভাষায় এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ

> মানুষের অনুরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব সার্বিকভাবে বনানীর উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রাণী পরিবেশের সাথে বনানীর অনুরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশ করে না। এই কারণে প্রাণীর পাঠ বাস্তুবিজ্ঞান বা বাস্তুব্যবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে উঠেছে। এজন্য প্রাণী বিজ্ঞানীগণ প্রাণীর বিবর্তনভিত্তিক (evolutionary) বিস্তারণস্থল ও সাগরের পরিবর্তনের সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠে ক্রমাগত প্রাণীর ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন।[৪]

মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Pedology or Soil science) বর্তমানে এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই বিজ্ঞান অর্থাৎ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য ভূগোলবিদ এবং কৃষিতত্ত্ববিদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী বি.টি. বানটিং এর মতে, এই গুরুত্ব বিশেষভাবে জীবভূগোলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গবেষক এডওয়ার্ড তা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন :

> যেহেতু বনানী মৃত্তিকায় জন্মলাভ করে এবং মৃত্তিকার উপর ও অভ্যন্তরের জলবায়ুর অবস্থা বনানীর জন্ম ও পরিবর্ধনে সাহায্য করে সেহেতু জীবভূগোলের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া ও মৃত্তিকার প্রকার এবং জলবায়ুর প্রকৃত (সাধারণরূপ বা সংক্ষিপ্তসার হিসেবে নয়) বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জলবায়ু মৃত্তিকা ও

৩. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ.৭

৪. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ৮

বনানীকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং জীবভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মৃত্তিকা-বনানী বিষয়ক মিশ্র জটিলতার (soil vegetation complex) বিষয়বস্তু। মৃত্তিকার জীবাণু ও অণুজীবসহ বনানীর আবরণই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে জীবমণ্ডল (The soil with its organisms and micro-organisms together with plant cover constitute a true biosphere)।[৫]

জীবভূগোলকে জীবসমূহের পাঠ, বিশেষ করে জীবসমূহের যোগসূত্র ও সম্বন্ধের পাঠ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীব-ভৌগোলিক সমস্যা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা ও সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো। তিনটি জীব-ভৌগোলিক সমস্যা—প্রথমটি প্রাণীর কার্যক্রম। অস্ট্রেলিয়ার ভূ-দৃশ্যের (চিত্র ১. অ) মধ্যস্থলের শশক-অভেদ্য তারের বেড়ার বাম পার্শ্বের প্রতিটি ভূমিখণ্ডের চারণের তৃণ ও লতাপাতা নতুন প্রতিষ্ঠিত দ্রুত সংখ্যার প্রাণী, শশক খুঁটে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু চিত্রের ডান অংশে, যেহেতু, শশকের অনুপ্রবেশ ঘটেনি সেখানে গৃহপালিত পশুর যথেষ্ট খাদ্য, তৃণ ও লতাপাতা বিদ্যমান রয়েছে। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতি প্রদত্ত শত্রুবিহীন বনানী পরিবেশ এলাকায় ধ্বংসাত্মক প্রাণী থাকতে না দিলে এগুলোর সংখ্যা অবাধ গতিতে এত বৃদ্ধি পাবে যে, এগুলো শত শত বছরের প্রকৃতি দ্বারা লালিত বনানীর আচ্ছাদন ধ্বংস করে ফেলবে। ফলে পশু খাদ্য ও পশুর মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংস হবে। এজন্য নতুন পরিবেশে নতুন শ্রেণীর প্রাণীর প্রচলনের পূর্বে ভবিষ্যৎ ফলাফলের মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি এই প্রকারের ধ্বংসাত্মক ফলাফল ঘটে

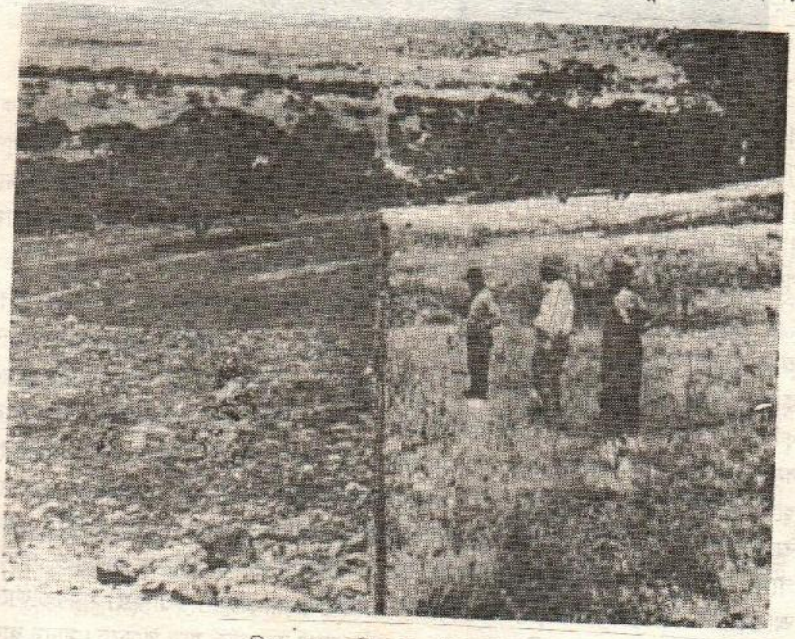

চিত্র ১. অ : জীব ভৌগোলিক সমস্যা

৫. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ৯

তাহলে এর সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধুলিঝড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা ক্ষয় (চিত্র ১. আ)। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় সমতলভূমিতে সাময়িক শুষ্ক অবস্থার

চিত্র ১. আ : ধূলিঝড়ে মৃত্তিকা সমস্যা

পর ধুলিঝড় উন্মুক্ত অবস্থার মৃত্তিকার ক্ষয় সংঘটিত করছে। অনুরূপভাবে উন্মুক্ত মৃত্তিকা পৃষ্ঠে ভারী বৃষ্টিপাত (torrential rainfall) মৃত্তিকা ক্ষয় করে থাকে। প্রান্তীয় বা সংকটপূর্ণ বৃষ্টিপাত (marginal rainfall) এলাকায় মানুষ মৃত্তিকা চাষ এবং অধিক হারে পশুর সংখ্যা বৃদ্ধির লিপ্সা লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ভূমির ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষা মানুষ অধিক সংখ্যায় পশুচারণ করে থাকে। এই কার্যক্রম মৃত্তিকার ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

পৃথিবীর অনেক অংশে মানুষের হস্তক্ষেপ, বিচার বুদ্ধিহীন ও বেপরোয়া কার্যক্রম এবং অতি আকাঙ্ক্ষা (man's interference, thoughtlessness and greed) পূরণ করার কারণে লক্ষ লক্ষ একর মূল্যবান ভূমি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষিভূমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে অন্যদিকে এসব ক্ষয়িত পদার্থ দ্বারা নদী ভরাট হবার ফলে বন্যার সংঘটন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদী পরিবহণ বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। শেষ সমস্যার উদাহরণ হচ্ছে জলজ বনানী (চিত্র ১.ই)। এই চিত্রে জলজ বনানী দ্বারা পানি পৃষ্ঠের আচ্ছাদনের অংশবিশেষ উপস্থাপিত হয়েছে। শ্বেত নীলনদের অবরোধক ও ভাসন্ত উদ্ভিদ নদটির প্রবাহ পথে কিলক আকারে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতে সম্ভবত পানির আলঙ্কারিক শোভা বর্ধনের–দৃশ্য প্রবর্তনের জন্য কচুরিপানার প্রচলন করা হয়। পরবর্তীকালে এটা এত ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় যে তা বর্জ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ দ্বারা

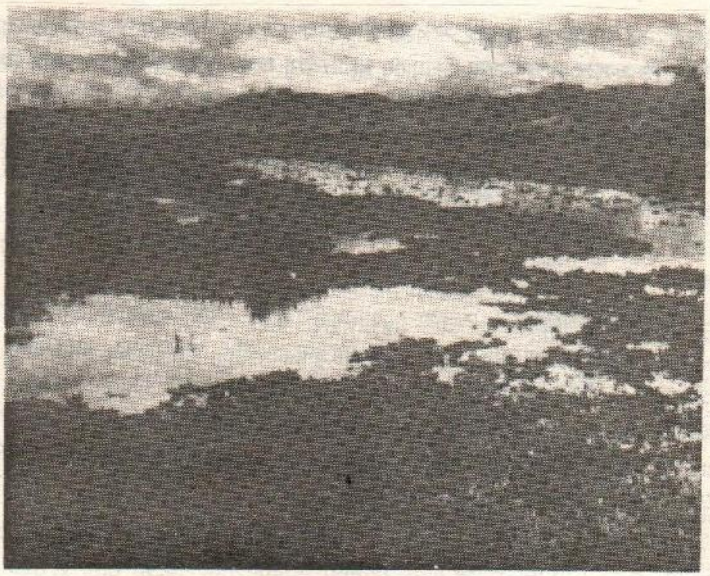

চিত্র ১. ই : জলজ উদ্ভিদ

বর্তমানে হ্রদ বা বৃহৎ জলাশয়ে সৃষ্ট তিন শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। এগুলো হচ্ছে ভাসমান জলজ কচুরিপানা, জলজ ফার্ন বা পূর্ণাঙ্গ ও জলজ লেটুস। এই শ্রেণীগুলোর ব্যাপক পুঞ্জিভূত জলজ বনানীর আগাছা জলাশয়ে জলযান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানির পরিমাণ হ্রাস করে। এ ছাড়াও এগুলো পানির অক্সিজেন কমিয়ে ফেলে—ফলে মাছ বাসের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং নদী ও হ্রদের বিনোদনমূলক দৃশ্য হারিয়ে যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর প্রকৃতি ও ক্ষতিকর প্রভাবের সমাধানে যথোপযুক্ত যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, জীবভূগোলবিদগণ জীব জগতের সমস্যার উপর আলোকপাত করে থাকেন। সমস্যাভিত্তিক কিছু প্রশ্ন হচ্ছে—কেন ও কোথায় বিশেষ কিছু প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়? কেন শুধু অস্ট্রেলিয়তে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বহু সংখ্যক মারসুপিয়াল লক্ষ্য করা যায়? ক্রান্তীয় তৃনভূমি কি শুধু জলবায়ুর প্রভাবে, না মানুষ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সৃষ্ট? মরুভূমির আয়তন কি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিরক্ষীয় বনাঞ্চল কি কমে যাচ্ছে?

জীবভূগোলবিদগণ পরিবেশগত নিয়ামক যেমন—জলবায়ু, মৃত্তিকা, বন্ধুরতা এবং পানির প্রভাবে জীবের পরিবর্ধন ও বিস্তারণের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। উদ্ভিদ দ্বারা সংঘটিত পরিবেশগত পরিবর্তনও জীবভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ দ্বারা বনানী এবং প্রাণী প্রজাতির ধ্বংস ও বিনাশ এই আওতাক্ষেত্রের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত।

উপাদানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে জীবভূগোলবিদগণ আলোকপাত করতে পারেন। যেমন ভূমি কি ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত, না প্রান্তীয় ফসল চাষে ব্যবহৃতব্য ভূমি হিসেবে পতিত রেখে চারণভূমি হিসেবে পরিগণিত করা বাঞ্ছনীয় অথচ ভূমিটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে প্রাকৃতিক বনানী, সম্ভবত বনে পরিণত করা যায় কি–না—এসব সমস্যার উপর জীবভূগোলবিদগণ আলোকপাত করতে পারেন। পৃথিবীর বর্তমান ভারসাম্যহীন বা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশের ক্ষেত্রে জীবভূগোলবিদগণ জীব–ভৌগোলিক নীতিসমূহ প্রয়োগ করে পরিবেশের ভারসাম্য অবস্থা পুনরুদ্ধার করে মানবকুলকে শান্ত, স্থায়ী ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে এক নতুন পৃথিবী উপহার দিতে পারেন।

ভূগোলবিদগণ অশ্মমণ্ডল/শিলাস্তর, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল নামে তিনটি আরবণে (envelope) ভূ–পরিবেশকে বিভক্ত করে থাকেন। অর্থাৎ অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল দ্বারা পৃথিবীর পরিবেশ গঠিত। ভূগোলবিদগণের বিভক্তি অনুসারে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়–অজৈব এই পরিবেশ অঞ্চল (Realm) তিনটির সাথে চতুর্থ, প্রাণ–অঞ্চল (sphere of life) সংযুক্ত। এই চতুর্থ অঞ্চল (fourth realm) জীবজগৎ নামে পরিচিত। এর মধ্যে বনানী ও অণুজীব ও মানুষ অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্নভাবে জীবমণ্ডলের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানের সংজ্ঞা–পৃথিবীর উপরে বিদ্যমান প্রাণের সকল বস্তু (The totality of living things on the earth)[৬] একত্রে জীবমণ্ডল নামে পরিচিত। ওয়েবারের অভিধানের সংজ্ঞা হচ্ছে—অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বসবাসকারী প্রাণবিশিষ্ট জীবসমূহকে (The living organisms penetrating the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere)[৭] জীবমণ্ডল হিসেবে গণ্য করা যায়। এফ.জে. মোঙ্কহাওসের ভূগোলের অভিধানে উপস্থাপিত জীবমণ্ডলের সংজ্ঞা হচ্ছে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলসহ পৃথিবীর পৃষ্ঠ–অঞ্চলের জীবজবস্তুসমূহের সমষ্টি। পিয়ারে ড্যানসেরুর মতে, জীবমণ্ডল হচ্ছে ভূত্বক এবং বায়ুমণ্ডলের সেই অংশ যেখানে কোনো না কোনো জীবনের অনুকূল বা সহায়ক অবস্থা বিদ্যমান (The biosphere is that part of the Earth's crust and atmosphere which is favourable to at least some form of life)।[৮]

প্রাণভিত্তিক সকল বস্তুসমূহের জীবমণ্ডলীয় এই মতবাদটি বিজ্ঞানীগণ আরো ব্যাপক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। ভি.আই. ভ্যারনস্কি মনে করেন যে, পরিসরে বিদ্যমান শুধু জীবিত বস্তুর দ্বারা জীবমণ্ডলের সংজ্ঞা প্রদান করা অসম্পূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ। কারণ জীবন্ত জীবাণু প্রাণ–রাসায়নিক বাহক হিসেবে ভূত্বক পরিবর্তন করে। এই মতবাদটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

> জীবমণ্ডলে তিনটি প্রধান উপাদান অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি হচ্ছে জীবন্ত পদার্থ (living matter)। জৈব স্তূপ যা জৈব পদার্থের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে (Totality of organisms determined quantatively by the biomass)। দ্বিতীয়টি জীবমণ্ডলের জীবজনি বিষয়ক পদার্থ। অর্থাৎ জীবন্ত পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট জৈব খনিজ এবং জৈব পদার্থ (i.e. organo-mineral

৬. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ১৬
৭. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ১৬
৮. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ১৬

and organic products created by living matter) এবং এগুলো হচ্ছে কয়লা, বিটুমেন (Bitumen), দাহ্যগ্যাস (combustible gas), সম্ভবত পেট্রোলিয়াম এবং বিশেষ করে পীট স্যাপ্রোপেল (Peat sapropel), মৃত্তিকার জৈব পদার্থ (soil humus) এবং বর্জ্য (Litter)। তৃতীয়টি হচ্ছে বায়োকসনিক পদার্থ (Biocosnic matter)। এই শব্দ ভ্যারনস্কি কর্তৃক ব্যবহৃত যা জীবন্ত জীবাণু ও অজৈব প্রকৃতির পদার্থ দ্বারা খনিজ পদার্থ আকারে সৃষ্ট—যেমন গ্যাসের গঠন দ্বারা বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর, পাললিক শিলা, কর্দম খনিজ এবং পানি নির্দেশ করে।[৯]

স্পষ্টত, এই সংজ্ঞা অত্যন্ত অন্তর্মুখী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক (more penetrating and purposive)। যদি জীবমণ্ডলের জৈব বস্তুসমূহের জীব ভূ-রসায়ন কার্যক্রমকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে এটি পৃথিবীর জীবমণ্ডলকে প্রাচীন, অত্যন্ত জটিল, বহুবিধ, সমগ্র ভূমণ্ডলীয়, উন্মুক্ত তাপ-গতি সম্বন্ধীয়, জৈব ও মৃত উপাদানসমূহের স্ব-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যেগুলো ব্যাপক গতিশক্তি হিসেবে প্রচুর সম্পদ-শক্তি আকারে ভূত্বক, বায়ুমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলে জমা ও পুনর্বন্টিত হয়েছে তা নির্দেশ করে (This provides a basis for considering the biosphere of the Earth as an ancient, extremely complex, mutiple, all planetary, thermodynamically open, selt controlling system of living matter and dead substance, which accumulates and redistributes immense resources of energy and determines, the composition and dynamics of Earth's crust, atmosphere and hydrosphere)।[১০] সহজ আলোচনার ক্ষেত্রে জীবমণ্ডলকে জৈব পদার্থের জগত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জীবন্ত পদার্থের উপস্থিতি কেবল বিদ্যমানই নয় বরং এগুলো জীবজনি এবং বায়োকসনিকরূপে (biogenically and biocosnically) প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এজন্য জীব জগতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া পৃথিবী এক অনুর্বর গ্রহে পরিণত হতো এবং মানব জীবন ও তাদের কার্যক্রম সংঘটিত হতো না।

১.১. জীবমণ্ডলের সীমা

জীবমণ্ডল এই গ্রহের উপরের এক অতি পাতলা প্রাণের স্তর (Thin film of life on this planet)। এটি পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্র বিন্দু হতে (অনেকের মতানুসারে) বহিঃআকাশ-সীমা দূরত্বের মাত্র $\frac{১}{৫৫০}$ অংশ অর্থাৎ ২৪ কি.মি. (১৫ মাইল) নির্দেশ করে। এই স্তর ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ; ভূখণ্ড (terrain), পানি এবং জলবায়ুর মিশ্রণ দ্বারা সৃষ্ট।

বর্ণিত ২৪ কিলোমিটারের স্তর জীবমণ্ডলের সর্বাধিক প্রস্থ নির্দেশ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা আরো ক্ষুদ্র আকারের স্তর বিশেষ। বুনো হাঁস সর্বাধিক ১,৮০০ মি. (৬,০০০ ফুট) উচ্চতায় বিচরণ বা উড্ডয়ন করে। এগার কিলোমিটার (৭ মাইল) উর্ধ্বে এলাকায় ছত্রাকীয় রেণু সংগৃহীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় এরোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিসট্রেশন

৯. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ১৭
১০. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ১৭

(Aeronautics and Space Administration) এর দ্বিগুণ উচ্চ এলাকায় জীবাণুর সন্ধান লাভ করেছে। কিছু জীবন্ত বস্তু বায়ুমণ্ডলে বাস করলেও এগুলো ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। তাই এগুলো প্রধানত ভূমিভিত্তিক (land based)। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হতে প্রধান জীবমণ্ডল (Biosphere proper) উল্লম্বভাবে সর্বোচ্চ গাছের সর্বাধিক উচ্চতা ৩৫০ ফুট (১০৫ মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত।

খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের জন্য মানুষ কয়েক হাজার ফুট ভূ-ত্বক খনন করলেও লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রাণী ভূত্বকের অনেক গভীরে প্রবেশ করে না। গর্ত সৃষ্টিকারী জীব মৃত্তিকার মাত্র কয়েক ফুট গভীরে বিচরণ করে থাকে এবং স্থলভাগের গভীরে প্রোথিত শিকড় এলাকা পর্যন্ত জীবাণু বিদ্যমান থাকে। পোস্টগেট উল্লেখ করেছেন, তেল অনুসন্ধানকারীগণ সর্বাধিক ১,২০০ ফুট (৩৬৫ মি.) গভীরের শিলাতে অণুজীব লক্ষ্য করেছেন। বর্তমানে সমুদ্র খাতের ৬ মাইল (১০ কি.মি.) গভীরতায় প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

জীবন্ত বস্তুসমূহ যদিও বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের অনেক ঊর্ধ্বের বা গভীরে বিচরণ করতে পারে তবুও লক্ষ্য করা গেছে যে, কষ্টকর পরিবেশ হতে এগুলো সত্বর অনুকূল পরিবেশে ফিরে আসে। ঊর্ধ্বে অক্সিজেনের অভাব, জলীয় বাষ্পের স্বল্পতা, শীতলতা বৃদ্ধি এবং চাপের হ্রাস বায়ুমণ্ডলে জীবের সীমা নির্ধারণ করে ; গভীরে অক্সিজেন ও আলোর স্বল্পতা এবং সম্ভবত চাপ বৃদ্ধির কারণে কেবল মৃত্তিকা এবং সমুদ্রের স্বল্প গভীর এলাকায় জীবের বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এজন্য জীবমণ্ডলের সঠিক সীমা নয় বরং আনুমানিক সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব। বারিমণ্ডলের অনুরূপ জীবমণ্ডল আন্তঃভেদ্য বা আন্তঃপরিব্যপ্ত। বনানী মৃত্তিকায় জন্মায় ও মৃত্তিকা হতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। কিন্তু এগুলোর জন্য বনানীর বায়ু ও পানিরও প্রয়োজন পড়ে। অনুরূপভাবে মানুষসহ প্রাণীর বায়ু এবং পানি ছাড়াও খাবার হিসেবে বনানীর প্রয়োজন পড়ে। ভূ-প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলো পানিতে বসবাসকারী যেমন—মাছ, প্রবাল ও সমুদ্র শৈবাল (sea weed) ; বায়ু ব্যবহারকারী জীব যেমন পাখি, জীবাণু ও অণুজীব এবং অশ্মমণ্ডলে বাসকারী মুষিক (mole), পোকামাকড় ও জীবাণু লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং জীবমণ্ডলে হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য আওতা ক্ষেত্রের সাথে এক প্রকার সংযোগ পদ্ধতি। এই সংযুক্ততা অন্যান্য ক্ষেত্র (other spheres) যেমন—শিলার আবহাওয়াবিকারের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কিছু কার্যক্রম লক্ষণীয়। কিছু বনানী ও প্রাণী কিছু শিলা সৃষ্টি করে, যেমন—কয়লা, চুনাপাথর এবং গুয়ানো (সামুদ্রিক পাখির বিষ্ঠা)। এই উভয় প্রক্রিয়া মৃত্তিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বনানী স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জীবমণ্ডল বায়ু, স্থল ও পানিমণ্ডলের অঞ্চলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১.২. জীবমণ্ডলের উপাদান

জীবমণ্ডল চারটি উপাদান–উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ এবং অণুজীব দ্বারা গঠিত। মানুষ অবশ্যই এক শ্রেণীর প্রাণী কিন্তু সে ভবিষ্যৎ চিন্তাবিদ, যুক্তিপূর্ণ ও ভৌগোলিক সর্বব্যাপিতা (geographical uniquity) বিশিষ্ট এক বুদ্ধিমান প্রাণী। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষকে পৃথকভাবে রাখা বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মৃত্তিকাকে জীবজগতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এটা প্রাণের অনুরূপ (very much a living entity) বৈশিষ্ট্য বহন করে।

এটা গতিশীল অঞ্চল এবং উচ্চমাপের পারস্পরিক অধীনতা (interdependence) বিদ্যমান। এটা পরিষ্কার যে, মানুষ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বনানীর উপর নির্ভরশীল। রোগজীবাণু এবং অণুজীব মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদকে পরাগায়ন বা প্রভাবান্বিত করে। উদ্ভিদ আবার অনেকক্ষেত্রে পরাগিতকরণে (fertilization) পোকামাকড়ের উপর নির্ভরশীল। জীবন্ত পোকামাকড় বর্ণিত সকল উপাদানসমূহকে মৃত্তিকার জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে। এই জৈব পদার্থ ছাড়া মৃত্তিকা নিষ্ক্রিয় বা জড় খনিজ কণার স্তূপে পরিণত হতো।

১.২.১. জৈব ও অজৈব বা জীবন্ত ও মৃত পদার্থ : বলা হয়ে থাকে চলনশীল, পরিবর্ধন, আকৃতির পরিবর্তন এবং উদ্দীপনা বা অনুভূতি প্রদানের বৈশিষ্ট্য জীবকে জড়পদার্থ হতে পৃথক করে থাকে এবং এসব বৈশিষ্ট্যের পদার্থই জীবন্ত বস্তু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু জীবন্ত ও জড় পদার্থের মধ্যের এই বর্ণিত পার্থক্যগুলো অতি জটিল ও দুর্বোধ্য।

জীবন্ত বস্তুসমূহের চলাচলের সক্ষমতা হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রায় সকল প্রাণীর ভৌত গতি বা স্থানান্তরে চলন অর্থাৎ চলনশীলতা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বনানী গতিহীন বা নিশ্চল। বনানীর গতির পরিবর্ধনের সাথে জড়িত এবং তা দৃষ্টিগোচর নয়। জড়জগতে বায়ু প্রবাহ, পানি প্রবাহ, মৃত্তিকা প্রবাহ, পৃথিবীর কম্পন প্রভৃতি গতি নির্দেশ করে। জীবনের ক্ষেত্রে সহজ বৈশিষ্ট্যের এরূপ গতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ভৌত পরিবর্ধন জীবন্ত বস্তুসমূহের অন্য এক বৈশিষ্ট্য। পদার্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে আকারের পরিবর্ধনে হয় জড় পদার্থ, যেমন—অতি সম্পৃক্ত দ্রবণে (supersaturation solution) খনিজ স্ফটিকের আকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্ট্যালাকটাইট ও স্টালাগমাইট এবং আগ্নেয়গিরিও পরিবর্ধিত হয়। বর্তমানে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীগণ সম্প্রসারণশীল ও পরিবর্ধনশীল বেলুনের (inflaming balloon) অনুরূপ অতি ধীরগতির সম্প্রসারণশীল বা পরিবর্ধনশীল পৃথিবী (Biosphere II) প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্ধন বলতে জটিল প্রক্রিয়ার বৃদ্ধিসহ আকারের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি হওয়া বোঝায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জীবন্ত বস্তুর পৃথক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য। জীবন্ত বস্তু রাসায়নিক উপাদান অঙ্গীভূত করে প্রাণকোষের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজমে রূপান্তরিত করতে পারে অর্থাৎ জীবন্ত বস্তু খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু প্রাণহীন বস্তুসমূহের (যেমন—পূর্বের খনিজ স্ফটিক) একই প্রকার উপাদান বহিরাবরণে যুক্ত হবার ফলে বস্তুগুলোর আকার বৃদ্ধি পায়।

প্রাণীর অনুরূপ উদ্ভিদের অনুভূতির অঙ্গ না থাকলেও উদ্দীপক বস্তু যেমন— জলীয় বাষ্প, আলো বা উষ্ণতার ক্ষেত্রে সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে এগুলোর দিকে বেঁকে যায়। এই বৈশিষ্ট্য প্রাণহীন বস্তু হতে জীবকে পৃথক করে রাখে অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু শক্তি দ্বারা নয় বরং বাইরের শক্তির দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু জীবন্ত বস্তু অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে।

জীবন্ত বস্তুর পুনরুৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা জড় পদার্থ হতে এগুলোকে পৃথক করা যায়। জড় পদার্থের অনুরূপ (যেমন স্ফটিকের পরিবর্ধন) জীবন্ত পদার্থের পরিবর্ধন অনির্দিষ্ট (Indefinitie) নয়। জীবন্ত পদার্থের পরিবর্ধনের এক নির্দিষ্ট সীমা বিদ্যমান। এই সীমা

বস্তুটির পরিপক্বতা প্রাপ্তি নির্দেশ করে। জীবন্ত বস্তু পরিবর্ধনের সময় ক্ষুদ্র হলেও জীবন্ত বস্তুর প্রতিরূপের বংশধর সৃষ্টি করে।

জীবন্ত বস্তুর জটিল কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বকার্যক্রম সমাধার মাধ্যমে সমগ্র বস্তুটির প্রধান কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত (Coordinated) হয় এবং ফলে বস্তুটি লাভবান হয়। এই শ্রেণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাঠামো জড় পদার্থে লক্ষণীয় নয়। জড় পদার্থের প্রতি প্রত্যঙ্গ অথবা একক কণা অন্য কণার সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকে।

জীবন্ত বস্তুর মৃত্যু ঘটে। ফলে বস্তুটির জীবন্ত অবস্থার সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। জড় পদার্থ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয় বা ভেঙে যেতে পারে কিন্তু মৃত্যুবরণ করে না। জীবন্ত বস্তু স্ব উপাদান নয় বরং ভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে উপাদানগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারা সংশ্লেষণ (synthesize) করে আত্মীকরণের (assimilation) মাধ্যমে বস্তুর কাঠামো গড়ে তোলে এবং বস্তুর আকার বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়া জড় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিভিন্ন উপাদান গ্রহণের পর এগুলোর কিছু অংশ গ্রহণ করে এবং অন্য অংশ পরিত্যাগ করে। এই অত্যন্ত জটিল আত্মীকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জীবন্ত বস্তু প্রয়োজনীয় পদার্থ একদিকে যেমন গ্রথিত কোষসমূহ তৈরি করে তেমনি অন্যদিকে আবার পরিবর্ধনের প্রয়োজনে শক্তি পেয়ে থাকে। এই জটিল কার্যক্রম বিপাক (metabolism) নামে পরিচিত এবং তা শুধু জীবন্ত বস্তুর জন্য প্রযোজ্য।

১.২.২. জীবের বিপাক কার্যক্রম : বিপাক হচ্ছে জীবন্ত বস্তুর অভ্যন্তরে সকল রাসায়নিক পরিবর্তনের পর্যায় এবং দুই কার্যক্রম অপচিতি বা অপচয় কার্যক্রম (Catabolism or destructive activities) এবং উপচিতি বা দেহকলার পুষ্টি সংশ্লেষণ কার্যক্রম (Anabolism or Synthetic activities) নির্দেশ করে। অপচিতি কার্যক্রমে জীবন্ত বস্তু জটিল রাসায়নিক গঠনের উপাদান ভেঙে সহজ রাসায়নিক যৌগে পরিণত করে যেন জীবন্ত বস্তুটি এগুলো ব্যবহার করতে পারে। উপচিতি কার্যক্রমে জীবন্ত বস্তুটি এর দৈহিক পদার্থ বৃদ্ধির জন্য উপাদানগুলোর সংশ্লেষণ সাধন করে। উভয় কার্যক্রম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ —শেষের প্রক্রিয়া দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি অপচিতি কার্যক্রমের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রথিত কোষসমূহের বা কলার ক্ষতিপূরণ বা মেরামত করে পুনরুৎপাদন বা পুনঃপূর্ণকরণ (reproduction or replenishment) করে। প্রথম কার্যক্রমটি জীবন্ত বস্তুটির উৎপাদন, পরিবর্ধন, গতি প্রভৃতির জন্য শক্তি প্রদান করে।

অপচিতি কার্যক্রমে শ্বসন উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। শ্বসন হচ্ছে বায়ু, পানি এবং মৃত্তিকা হতে অক্সিজেন গ্রহণের দ্বারা উপাদানের জারণের (oxidation) মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ। শ্বসন কাজের জন্য দ্রুত সরবরাহের অক্সিজেন প্রয়োজন এবং এই অক্সিজেন ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তভাবে (free state) পাওয়া যায়। অতি উঁচু এবং গভীর এলাকায় অক্সিজেন প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে। প্রায় এই অক্সিজেন শূন্য পরিবেশ তীব্রভাবে জীবন্ত বস্তুর বিতাড়ন সংঘটিত করে। কিছু সংখ্যক অণুজীব ছাড়া কোনো জীবন্ত বস্তু অক্সিজেন ছাড়া বেশি সময় বাঁচে না।

১.২.২.১. পুষ্টি সাধন : পুষ্টিসাধন বিপাকের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রমের দ্বারা জীব গৃহীত উপাদান অঙ্গীভূত বা শোষণ করে গ্রথিত প্রাণপঙ্কে পরিণত করে অর্থাৎ এটি জীবন্ত বস্তুর দেহ-উপাদানে পরিণত হয়। বস্তুর জীবন্ত উপাদান-গ্রথিত প্রাণপঙ্ক, পানি এবং অন্যান্য উপাদান-কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, লোহা, সালফার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি হতে সৃষ্টি হয়। এগুলো অতি অস্থিতিশীল জোটে (unstable combination) এবং অহরহ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানে বিদ্যমান থাকে।

১.২.২.২. শ্বসন : শ্বসন কার্যক্রম উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে, এক হলেও পুষ্টিসাধনের প্রক্রিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এই বিপরীত বৈশিষ্ট্য দুই শ্রেণীকে পৃথক করে রেখেছে। সবুজ উদ্ভিদ প্রোটিন উপাদান, শর্করা, সেলুলোজ, চর্বি, লিগনিন, জটিল রাসায়নিক গঠন-যৌগ পানি হতে ; কার্বন ডাই-অক্সাইড, খনিজ লবণ-উপাদান মুক্ত পরিবেশ হতে অতি সহজে সংশ্লেষণ করে। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে উদ্ভিদ উপাদানগুলো হতে সালোকসংশ্লেষণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা শক্তি সংগ্রহ করে এবং জৈব বা ভৌত মিশ্র জৈব উপাদান তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে বনানী পত্রের ক্লোরোফিল, সবুজ রঞ্জক কার্যকরী বাহক হিসেবে কাজ করে। পুষ্টি সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণী উদ্ভিদের তুলনায় পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে। অতি সহজ পদার্থ হতে প্রাণী বনানীর অনুরূপ সংশ্লেষণ করতে পারে না। প্রাণী বনানী-উপচিতির (Plants anabolism) উৎপাদিত বস্তু ব্যবহার করে। এই উৎপাদিত বস্তু প্রাণী পরিপাক করে সারা দেহে বন্টন এবং পুনঃ সংশ্লেষণ করে থাকে। সারণিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করা হলো।

সারণি ১.১ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য	
উদ্ভিদ ও প্রাণী	উদ্ভিদ	প্রাণী
উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই কেন্দ্রীকা, ক্রোমজোম এনজাইম প্রভৃতির দ্বারা তৈরি।	প্রায় সকল উদ্ভিদের বহিরাবরণে সেলুলোজ নির্মিত শক্ত পর্যায় কোষ বিদ্যমান।	প্রাণীর কোষের বহিরাবরণের শক্ত পর্দা বিদ্যমান নয়।
সকল জীবন্ত বস্তুর পরিবর্ধন, দেহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর পদার্থের স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন।	উদ্ভিদ সাধারণত স্ব-খাবার তৈরি করে। সবুজ উদ্ভিদ স্বভোজী এবং সূর্যালোকের শক্তি দ্বারা সালোক সংশ্লেষ সমাধা করে।	প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে। এরা পরভোজী (Heterotrophic)। ইহার শক্তি গ্লুকোজ, শর্করা, ইত্যাদির জারণ হতে সংগৃহীত হয়।
উদ্ভিদ ও প্রাণী খাবার পরিপাক করে, বর্জ্য পদার্থ নিঃসারণ করে, পরিবর্ধন লাভ করে এবং বংশ বৃদ্ধি করে।	বনানী স্থির অবস্থানের জীবন্ত বস্তু হিসেবে প্রথম কলামে বর্ণিত অনুরূপ জীবন প্রক্রিয়া চালায়।	প্রাণী সাধারণতঃ স্বয়ং বল বিশিষ্ট অর্থাৎ এদের পরিবেশে এরা স্বাধীনভাবে চলতে পারে।

১.৩. জীবমণ্ডলীয় চক্র

ভূমণ্ডলের জীবন্ত বস্তুর সূক্ষ্ম স্তর বৃহৎ পরিমাপের চক্র প্রক্রিয়ার (grand scale cyclical mechanisms) দ্বারা গঠিত এবং এটি সতত রক্ষিত হয়। এই চক্র হচ্ছে শক্তি, পানি এবং রাসায়নিক উপাদান। ভূ-মণ্ডলভিত্তিক এই সূক্ষ্ম স্তরের জীবন্তবস্তু সূর্য হতে শক্তি লাভ করে, সকল প্রাণের পানির প্রয়োজন পড়ে এবং সকলের অক্সিজেন এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপাদানেরও প্রয়োজন পড়ে।

সকল প্রাণীর জীবন (biospheric life) সূর্যরশ্মির শক্তির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিঃসীমায় প্রাপ্ত সৌরশক্তির প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর স্থল ও পানি পৃষ্ঠে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আকারে পৌঁছে। কিছু পরিমাপের, বিশেষ করে অতি বেগুনি রশ্মির তরঙ্গকে ওজন স্তর বাধা প্রদান করে। ফলে এগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণের ক্ষতিকারক রশ্মি হিসেবে পৌঁছে না। পৃথিবী পৃষ্ঠে এই শক্তির তারতম্য অক্ষাংশ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রাকৃতিক কারণে ঘটলেও এই শক্তি বায়ু ও সমুদ্রের পানি প্রবাহের সাহায্যে প্রায় সমভাবে বণ্টিত হয়। এই শক্তি জীবমণ্ডলের বনানীর সালোকসংশ্লেষণ সম্ভবপর করে তোলে। সবুজ বনানীর পত্রহরিৎ (chlorophyll) এর দ্বারা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড কমিয়ে ফেলে এবং জৈব যৌগ ও অক্সিজেন উৎপাদন করে। সহজে বলা যায়, যেসব প্রাণী, বনানী এবং মানুষের পরিবর্ধন, গতি, প্রজনন কার্যক্রম এই শক্তির উপর নির্ভরশীল।

বর্ণিত শক্তি ছাড়াও জীবের উৎপত্তি ও রক্ষার জন্য পানির প্রয়োজন। মঙ্গল গ্রহে সম্ভবত পানির অভাবে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। আমাদের এই গ্রহ পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভবত সমুদ্রে আরম্ভ হয়েছিল। এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে যে জীবন প্রক্রিয়া এবং জীবের জন্য হাইড্রোজেনের উৎসের মাধ্যম হচ্ছে পানি। উদ্ভিদ পুষ্টিকর গ্যাসীয় এবং কঠিন পদার্থ পানির সাহায্যে দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে। জীবের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন শুধু পানির সংস্পর্শে ঘটে থাকে তেমনি পানিও এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। শর্করা, যেমন—স্টার্চ ও সেলুলোজ তৈরির ক্ষেত্রে পানির হাইড্রোজেনেরও প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং বসবাসের পরিবেশে বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং বাষ্পীভবনের হার জীবের শারীরবৃত্তীয় বর্ধন এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন জীবের পানি গ্রহণের পরিমাণে তারতম্য থাকলেও এই পানির অবিরত সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি সরবরাহের অভাবে জীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, জীবের বর্ধন বন্ধ হয় এবং শুষ্ক অবস্থা অথবা মৃত্যু ঘটে।

পরবর্তী বৃহৎ পর্যায়ের চক্র রাসায়নিক উপাদানের সাথে জড়িত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই চক্র একক রাসায়নিক উপাদান-চক্রের সিরিজ যেমন—নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র, ফসফরাস চক্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত (চিত্র ১.১)। উদ্ভিদের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাহিদা অতি সহজে বায়ু সরবরাহ করে। কিন্তু প্রায় সকল অন্য উপাদান উদ্ভিদকে মৃত্তিকা-দ্রবণ হতে সংগ্রহ করতে হয়। নাইট্রোজেন বায়ুতে বিদ্যমান থাকলেও বায়ুর নাইট্রোজেন উদ্ভিদ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য এই নাইট্রোজেন অন্য কোনো জীবে আবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজন পড়ে। উদ্ভিদের যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন, কার্বন এবং

হাইড্রোজেন ছাড়াও উপলব্ধি করা যায় এমন পরিমাণের ছয়টি স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপাদান (trace elements), যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও

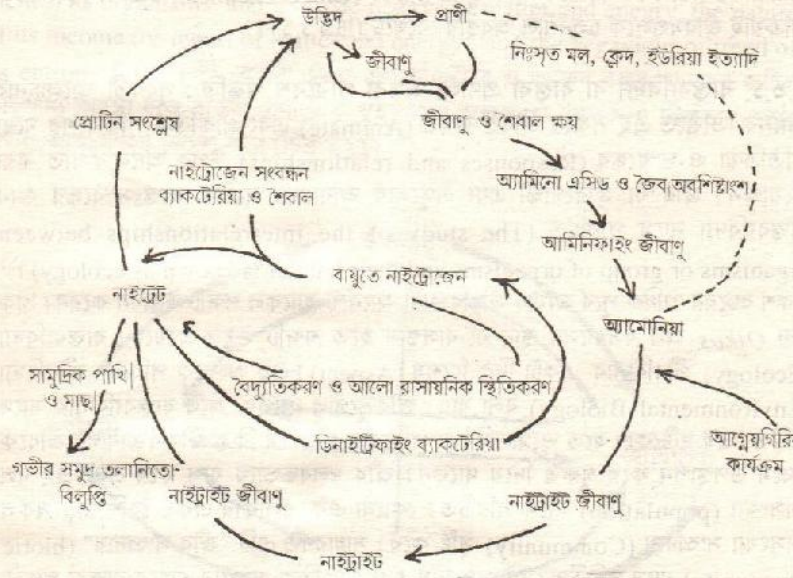

চিত্র ১.১ : নাইট্রোজেন চক্র (ওডামের মত অনুযায়ী)। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বায়ুতে নাইট্রোজেন মুক্তভাবে প্রাপনীয় নয়। উদ্ভিদ ইহা প্রধানত মৃত্তিকা হতে নাইট্রোজেনীয় লবণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে অণুজীবাণু নাইট্রোজেনকে বন্ধন/স্থিরক হিসেবে আটকে রাখে এবং পরিত্যক্ত করে।

সালফার সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলো সচরাচর অন্যান্য উপাদানের সাথে সন্নিবেশন খনিজ লবণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। যেহেতু পানি সার্বজনীন দ্রাবক (universal solvent) সেহেতু এসব লবণ পানি হতে দ্রব হিসেবে উদ্ভিদ পেয়ে থাকে। প্রাণের প্রয়োজনে এই সকল অপরিহার্য গলনশীল লবণ বায়োজেনিক (biogenic) লবণ নামে পরিচিত। উপরে বর্ণিত নয়টি উপাদানের বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। এই কারণে এগুলো ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস (macronutrients) নামে পরিচিত। অন্যান্য প্রায় ১০০ বা অনুরূপ উপাদান (এই সংখ্যার উপাদানের মধ্যে মাত্র ১/৩ ভাগ উপাদানের পরিচিতি জানা আছে) উদ্ভিদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, যেমন ঘাস সক্তকরণের ক্ষেত্রে (stiffening purposes) সিলিকন ব্যবহৃত হয়। এই উপাদানগুলো অতি নগন্য বা প্রায় পরিমাপ করা যায় না এমন পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এগুলো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস নামে পরিচিত।

উপরে বর্ণিত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুষ্টিকর পদার্থ প্রাণীর খাদ্য হতে সংগৃহীত হয় এবং উদ্ভিদের অনুরূপ এগুলো প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই কার্যক্রম সমাধা করে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রয়োজন বনানীর প্রয়োজন হতে ভিন্নতর। যেমন—কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে রক্ত ও দেহ কাঠামোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে লোহা এবং ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়।

যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ভিন্নধর্মী পদার্থ, পানি এবং পুষ্টিকর লবণ জীবমণ্ডলে পরিবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে জীব ভূ-রাসায়নিক (Biogeochemical) চক্র বলে। এই চক্র প্রক্রিয়াই জীবমণ্ডলকে চলনশীল অবস্থায় রেখেছে (চিত্র ১.১)।

১.৩.১. বাস্তব্যবিদ্যা বা বাস্তব্য প্রণালী অথবা পরিবেশ পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আলোচনার জ্ঞানের ভিত্তিতে এই পর্যায়ে জীবন্ত জগত (Animate) এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও সম্বন্ধের (Responses and relationships) উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। জীব বা জীবগোষ্ঠী এবং এগুলোর আবাসের মধ্যের আন্তঃসম্বন্ধের জ্ঞান বাস্তব্যবিদ্যা নামে পরিচিত (The study of the interrelationships between organisms or group of organisms and their habitat is known as ecology)[১১] একশ বছরের অধিক পূর্বে জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট হ্যাকেল শব্দটি উদ্ভাবন করেন। গ্রিক শব্দ *Oikos* অর্থ বসবাসের স্থান বা বাসস্থান হতে শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। বাস্তব্যবিদ্যা (Ecology) জীববিদ্যার একটা দিক বিশেষ (Aspect)। এই অংশকে পরিবেশ জীববিদ্যা (Environmental Biology) বলা যায়। জীবভূগোল ব্যাপক অর্থে বাস্তব্যবিদ্যার সাথে জড়িত। এই দৃষ্টিকোণ হতে ভূগোলবিদগণ পরিবেশকে প্রথমে কিন্তু জীববিজ্ঞানীগণ জীবকে প্রথমে উপস্থাপন করে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জীব দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং এই দল গণসংখ্যা (population) নামে পরিচিত। কোনো এক এলাকার একই বৈশিষ্ট্যের সকল গণসংখ্যা সম্প্রদায় (Community) সৃষ্টি করে। সাধারণত এটি "জীব সম্প্রদায়" (biotic community) নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান একত্রে বাস্তব্য প্রণালী হিসেবে কাজ করে। এই শব্দ অর্থাৎ বাস্তব্য প্রণালী সংক্ষিপ্তাকারে বাস্তুবিদ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমণ্ডলের যে অংশে বাস্তব্য প্রণালীর বিদ্যমান উপাদানসমূহ প্রণালীটির কার্যক্রম সমাধা করে সেই অংশকে জীববিজ্ঞানীগণ জীবমণ্ডল নামে গণ্য করে থাকেন। এই গঠনমূলক কাঠামোর মধ্যে কোনো বিরতি নেই, আবার এই কাঠামোর প্রতি উপাদান স্বনির্ভর ও আন্তঃসংযুক্ত। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যে, একক জীব দীর্ঘকাল এগুলোর গোষ্ঠী বা দলসমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। বাস্তব্য প্রণালীতে পুষ্টিকর পদার্থ ও পানি এবং শক্তি প্রবাহ ও শক্তি নিঃসরণ না ঘটলে গোষ্ঠী ব্যাপ্তিলাভ (flouirish) করতে, এমনকি টিকে থাকতে পারে না।

১.৩.১.১. সংজ্ঞা : বিজ্ঞানী এ.জি. ট্যানসলি ১৯৩৫ সালে কোনো এলাকায় বসবাসরত সকল জীব ও এদের বাসস্থানের সম্পর্কের সকল জটিল কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে এক সাধারণ শব্দ (term) বাস্তব্য প্রণালী দ্বারা উপস্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞানী এফ. এস. ফসবার্গের মতে,

১১. Robinson, H. 1972. Biogeogrophy, পৃ. ২৮

কার্যকর ভৌত এবং জীবমণ্ডলীয় পরিবেশে এক বা অধিক জীবের (Living organisms) আন্তঃ-কার্যকরী ক্রিয়া পদ্ধতি হচ্ছে বাস্তব্য প্রণালী। ফসবার্গ পরিবর্ধিত আকারে সংজ্ঞাটি সম্বন্ধে বলেছেন যে, বাস্তব্য প্রণালীর বর্ণনা পারিসরিক সম্বন্ধ ; ভৌত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনামূলক তালিকা ; এর বাসস্থান পদার্থ ও শক্তির প্রবাহ-ধরন ; এর পদার্থ ও শক্তির আয়ের প্রকৃতি, এর আচরণ বা ঝোঁকের চরম পর্যায় নির্দেশ করে (Developing this definition Fosberg goes on to say "The description of an ecosystem may include its spatial relations ; inventories of its physical features, its habitats and ecological niches, its organizms, and its basic reserve of matter and enegry, the nature of its income (or input) of matter and energy ; and the begaviour of trend of its entropy level") [১২] কোনো একক এলাকার জৈব ও অজৈব বস্তুর সচরাচর জটিল ভারসাম্য অবস্থা বলে বাস্তব্য প্রণালীকে গ্রহণ করা হলেও তা ব্যাপক ও বিস্তৃত অবস্থার জটিল আন্তঃসম্বন্ধ নির্দেশ করে (চিত্র ১.২)।

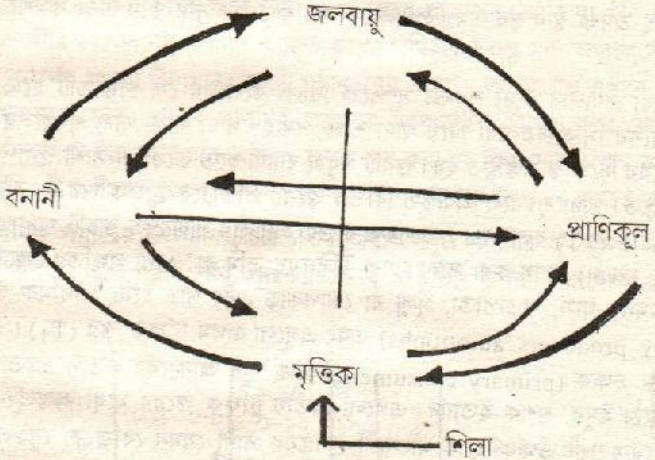

চিত্র ১.২ : বাস্তব্য প্রণালী বা জৈব জটিল স্তর (বিজ্ঞানী Eyre-এর মত অনুযায়ী)

বাস্তব্য প্রণালী বিভিন্ন স্তর বা বিভিন্ন ক্রমের ব্যাপ্তি এলাকা নির্দেশ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বেঙাচ্চি (todpoles) সহ পানি পূর্ণ এক বয়োম (jam jar) যেমন একটি ক্ষুদ্র একক বাস্তব্য প্রণালী হতে পারে তেমনি অন্যদিকে সমগ্র পৃথিবীকে এক অতি বৃহৎ বাস্তব্য প্রণালী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৩.১.২. বাস্তব্য প্রণালীর কার্যক্রম : বিজ্ঞানী ওডামের (E.P. Odum) মতে, বাস্তব্যবিদ্যায় বাস্তব্য প্রণালী হচ্ছে এক মৌলিক কার্যকরী একক জীবন্ত বা জীবীয় সম্প্রদায় এবং অজীবীয় পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে

১২. Robinson, H. 1972. Biogeography, পৃ. ২৯

এবং উভয়েরই উভয়ের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন, যে জীবন আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্তমান।

বাস্তব্য প্রণালীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ওডাম প্রদত্ত সকল বৈশিষ্ট্যই* বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমগ্র প্রণালীটির আন্তঃক্রিয়া কাঠামোর কার্যকরী পদ্ধতি। এই প্রণালীতে সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি রক্ষা করে এবং তা খাদ্যের উৎস হিসেবে প্রণালীটির সকল জীবকে লালন পালন করে থাকে। প্রণালীটির এই রক্ষাকবচ প্রক্রিয়া হচ্ছে এক পর্যায়ের জীব হতে অন্য পর্যায়ের জীবের মধ্যে শক্তির এই পরিবহন অর্থাৎ এই শক্তি উদ্ভিদ হতে উদ্ভিদভোজী প্রাণী এবং উদ্ভিদভোজী প্রাণী হতে মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে এবং শেষে জীবের পচনশীল কার্যক্রমে স্থানান্তরিত হয়।

শক্তির এই স্থানান্তরণ সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ১০০% এ সমাধা হয় না। সবসময় শক্তির কিছু অপচয় ঘটে। এই ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বা প্রাণী অথবা অণুজীব যাই হোক না কেন প্রত্যেকের বিপাকের জন্য খাদ্য শক্তির কিছু অংশ ব্যবহার করে। প্রতি পদক্ষেপে শক্তির এই অপচয়ের কারণে খাদ্য শৃঙ্খল কদাচিৎ ৪ বা ৫ স্তরের উপরে সংঘটিত হয়। প্রতি খাদ্য প্রক্রিয়ার স্তরে শক্তির এই অদক্ষ স্থানান্তর সমগ্র প্রণালীতে স্তর কাঠামো সৃষ্টি করে এবং কর্মশক্তি প্রদান করে।

বাস্তব্য প্রণালীর খাদ্য শৃঙ্খল সম্পর্কে বিলিং বলেছেন যে, পদ্ধতিটি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার জীবের সিরিজের মধ্য দিয়ে খাদ্য শক্তি প্রবাহ। খাদ্য শক্তি খাদ্য শৃঙ্খলের নিম্নস্তর হতে উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। স্তরটি সবুজ বনানী হতে উর্ধ্বে মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত। খাদ্য শৃঙ্খলে অবস্থিত বিভিন্ন স্তরের প্রতিটিকে ট্রফিক স্তর ইংরেজি বর্ণ T (Trophic level T) বলা হয়। প্রায় সকল বাস্তব্য প্রণালীর সাধারণত পাঁচটি খাদ্যাভ্যাস স্তর (feeding level) নির্ণয় করা সম্ভব। এক উদ্ভিদময় ভূমি বা অরণ্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে, সবুজ বনানী যেমন—ঘাস, লতাপাতা, গুল্ম বা ঝোপঝাড় এবং গাছ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদক (primary producers autotrophs) এবং এগুলো প্রথম ট্রফিক স্তর (T_1)। প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত ভক্ষক (primary consumers) হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের লতাপাতাভোজী প্রাণী যেমন মেঠো ইঁদুর, শশক ইত্যাদি। এগুলো দ্বিতীয় ট্রফিক স্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (T_2)। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ভক্ষক হচ্ছে মাংসাশী পর্যায়ের প্রাণী যেমন বেজি বা নেউল, শৃগাল ইত্যাদি। এগুলো তৃতীয় ট্রাফিক স্তর (T_3) সৃষ্টি করে। চতুর্থ ট্রাফিক স্তর (T_4) খেচর মাংসাশী প্রাণী (top carnivores) যেমন শিকারী পাখি, পেঁচা বা বাজ পাখি। এগুলো ক্ষুদ্র মাংসাশী প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পঞ্চম স্তর (T_5) হচ্ছে পচন ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জীব

---

* প্রথমত, এটা অদ্বৈতবাদি এটা পরিবেশ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতকে একই কাঠামোতে আনায়ন করে। এই প্রণালীর উপাদানসমূহের আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব ... ...।

দ্বিতীয়ত, বাস্তব্য প্রণালীসমূহ মোটামুটি সুবিন্যস্তভাবে যুক্তিসহ বোধগম্য পন্থায় স্তরে/কাঠামোতে বিন্যাসকৃত... ...।

তৃতীয়ত, বাস্তব্য প্রণালীসমূহ কার্যাবলী সমাধা করে। এগুলো অবিরত পদার্থ ও শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত... ...।

চতুর্থত, বাস্তব্য প্রণালীসমূহ হচ্ছে এক শ্রেণীর সাধারণ প্রণালী এবং বাস্তব্য প্রণালী সাধারণ প্রণালীর গুণাগুণ বহন করে।

(Organism) যেমন জীবাণু, ছত্রাক ইত্যাদি সহ মৃত্তিকার কিছু জীব। এগুলো যে কোনো শক্তি-প্রাপ্তি স্তর মতে পরিত্যক্ত হয় (The fifth level (T_5) is composed of decomposer organisims i.e. bacteria and fungi together with some soil creatures, which live off any of the other energy availing levels)।

এভাবে প্রতি বাস্তব্য প্রণালীর স্তর গঠিত হয়। এই প্রণালীর জীবন্ত বস্তু বননী ও প্রাণীর মোট ওজন, যা জৈবস্তূপ (biomass) নামে পরিচিত তা প্রারম্ভিক সৌরশক্তির যোগান (input) দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো বাস্তব্য প্রণালী বননী ও প্রাণীর সংখ্যা ধারণ করার (Support) ক্ষমতা সবুজ বননীর শক্তি গ্রহণ ও শক্তি ধরে রাখার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং আর্কটিক তুন্দ্রা অঞ্চল গ্রহণ করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে অতি অধিক পরিমাণে সৌরশক্তি নিম্নের স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক উৎপাদক স্তর পেয়ে থাকে। এজন্য এক্ষেত্রে জৈব স্তূপের পরিমাণ অধিক। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সৌরশক্তির পরিমাণ কম হওয়ায় কারণে জৈবস্তূপের পরিমাণও কম।

বাস্তব্য প্রণালীর ফলপ্রদ কাজ করার ক্ষেত্রে শক্তিই শুধু প্রধান নিয়ামক নয়। শক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহারের জন্য প্রতি স্তরে পানি ও খনিজের প্রয়োজন। পানি বা খনিজ পদার্থের অভাব প্রণালীর উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাহত করে। পৃথিবীর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি ও পুষ্টিকর পদার্থের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। বননী পরিবর্ধনের উপযুক্ত তাপমাত্রাও এখানে বিদ্যমান। কিন্তু এখানকার পানির অভাব প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদনকে সীমিত করে রেখেছে। যে সকল কৃষিভূমিতে দীর্ঘ সময় ধরে অবিরত ফসল চাষ করা হয় কিন্তু সার প্রয়োগ করা হয় না সেসব ভূমির ধীরে ধীরে পুষ্টিকর পদার্থের হ্রাসের ফলে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন কমতে থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদন (চিত্র ১.৩) অর্থাৎ সবুজ বননীর কতগুলো নিয়ামক— আলোর তীব্রতা, তাপ, পানি, বায়ু, পুষ্টিকর পদার্থ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যদি এসব

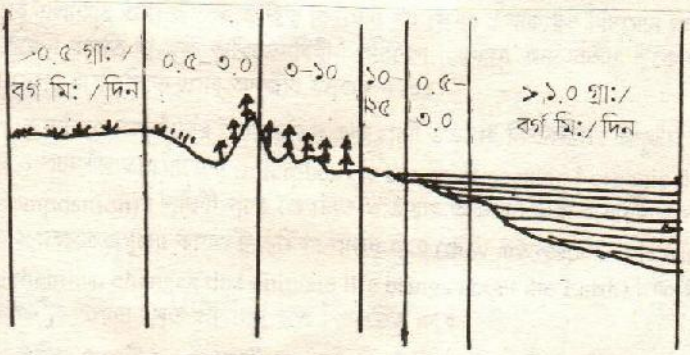

চিত্র ১.৩ : প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদনের বিস্তারণ (বিজ্ঞানী ওডামের মতে)

নিয়ামক প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাহলে উৎপাদন অতি উচ্চমাত্রায় পৌঁছে। আর এগুলোর মধ্যে যদি এক বা একাধিক নিয়ামকের ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় বা কোনো উৎপাদন হয় না। ওডাম পৃথিবীর তিন প্রধান ক্রম মানের উৎপাদন পরিমাপ এলাকা নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হচ্ছে—১. কিছু অগভীর জলাশয়, আর্দ্র অরণ্য, পলল সমভূমি এবং প্রগাঢ় কৃষি অঞ্চল, ২. তৃণভূমি, অগভীর হ্রদ, এবং প্রায় সকল খামার এলাকা (farm land) এবং ৩. সর্বনিম্ন উৎপাদন অঞ্চল যেমন—আর্কটিক পতিত ভূমি (arctic waste land), মরুভূমি এবং গভীর সমুদ্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীব ও উদ্ভিদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও শ্রেণিবিভাগ

২.১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব জীবকুলের প্রধান শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ এক পৃথক শ্রেণী বলে বিবেচিত হলেও মানুষ জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, উদ্ভিদ সৌরশক্তি ব্যবহার করে সহজলভ্য অজৈব মিশ্র পদার্থকে (simple inorganic compounds) জৈব পদার্থে পরিণত করে তাদের দেহ গঠন করে।

অন্যদিকে প্রাণীর সালোকসংশ্লেষণ সমাধা করার ক্ষমতা নেই। এজন্য প্রাণী তৈরি জৈব উপাদান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বর্ধন, গতি, পুনরুৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শক্তি, শ্বসন প্রক্রিয়ার (শ্বাস-প্রশ্বাস) সাহায্যে সমাধা হয়ে থাকে। এই শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেন গ্রহণ, জৈব মিশ্র পদার্থের ভাঙন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগের কার্যক্রম সমাধা করা বোঝায়।

অণুজীব বনানী (vegetation) ও প্রাণী হতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। অণুজীব যা সাধারণত অণুজীবাণু নামে পরিচিত, সেগুলো সালোকসংশ্লেষণ কার্যক্রম সমাধা করে না। এগুলো পরজীবী হিসেবে অন্য জৈব পদার্থ বা মৃত জীবদেহের জৈব পদার্থ মিশ্রিত স্থানে খাদ্য প্রাপ্তির জন্য বসবাস করে। খালি চোখে দৃশ্যমান নয় এই শ্রেণীর অণুজীবের এক আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এগুলো পৃথিবীর সকল অংশ এবং এমনকি যেসব এলাকায় অন্য জীবের অস্তিত্ব বিদ্যমান নয় সেসব এলাকায়ও বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ অক্সিজেন কমতি বা মুক্ত অক্সিজেনবিহীন পরিবেশ, যেখানে অন্য প্রাণীর টিকে থাকা সম্ভব নয় সেসব বাসভূমিতে এসব অণুজীব বসবাস করে।

অন্যদিকে অণুজীবের উপর উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়েই নির্ভরশীল। অণুজীব হচ্ছে জৈব ক্ষয় ও পচনশীলতার এজেন্ট (microbes are the chief agents of organic decay and decomposition)। পৃথিবী পৃষ্ঠে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় অবনয়ন দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রায় সবক্ষেত্রে এগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে (they are responsible for most of the chemical changes that animate life brings about the Earth)। অণুজীব প্রাণীর প্রয়োজনীয় উপাদান মৃত জীবদেহ হতে নিঃসারিত করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে পুষ্টিকর পদার্থের পার্থক্য এদের দেহ-কাঠামোতে প্রকাশ পায়। উদ্ভিদের মৌল প্রয়োজনীয় পদার্থ হচ্ছে সূর্যের আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি। এগুলোর দ্বারা উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ সমাধা করে। বনানীর শ্বসন কার্যক্রমের জন্য

অক্সিজেন এবং গ্রথিত কোষ তৈরির জন্য সহজলভ্য ও অপরিহার্য রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই মৌল উপাদানগুলো বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা যেহেতু উদ্ভিদের সন্নিকটে সুলভ সেহেতু উদ্ভিদের চলাচলের প্রয়োজন পড়ে না। তাই উদ্ভিদ স্থির অবস্থানে বেঁচে থাকে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ছাড়া অন্যান্য স্থলজ উদ্ভিদের শিকড় পদ্ধতি বিদ্যমান (Except for the lower forms, land plants possess a root system)। এগুলো দুই পদ্ধতি, যথা—ক. উদ্ভিদকে অনড় অবস্থানে ও ঠেস দিয়ে রাখে এবং খ. মৃত্তিকা বিগলন হতে বনানীর পুষ্টিকর পদার্থ শোষণে সহায়তা করে। শিকড় ছাড়াও উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা বিদ্যমান। এগুলোর সাহায্যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ কার্যক্রম সমাধা করে।

জলীয় পদার্থ এবং পুষ্টিকর পদার্থ বনানীর সংবহন নালিকা পদ্ধতির (ধমনী বা শিরার জালিকা) সাহায্যে বনানীর দেহে তরল পদার্থ আকারে পরিবাহিত হয়। যেহেতু বনানীর অবস্থান স্থির সেহেতু বিশেষ কার্যক্রমের সাহায্যে উদ্ভিদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও বংশবৃদ্ধি করে। উন্নত শ্রেণীর স্থলজ উদ্ভিদবর্গ বীজ এবং বৃক্ষোৎপাদী রেণুর দ্বারা বিস্তার লাভ করে। নিম্নশ্রেণি বা আদি উদ্ভিদ গোষ্ঠীর এই বিশেষ শ্রেণীর অঙ্গ খুব কমই বিদ্যমান থাকে।

প্রাণী, বিশেষ করে উচ্চতর প্রাণীর খাদ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাণী বনানী হতে অথবা অন্য প্রাণী শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং প্রাণীকে বনানী এবং জীব শিকার করার জন্য চলাচল করতে হয় অথবা প্রাণী স্থির বা নিশ্চল বৈশিষ্ট্য বহন করলে প্রাণীকে বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। চলাচলের ক্ষমতা আঙ্গিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ; যেমন চলাচলের অঙ্গ, পেশীয় সমন্বয় সাধন, অনুভূতির অঙ্গ ইত্যাদির উপর প্রাণী নির্ভরশীল। এজন্য প্রাণীর শরীর যুক্তিসঙ্গতভাবে নিবিড় বা দৃঢ়, কিন্তু চলাচলের জন্য সহজবশ্য (flexible) হওয়ার বৈশিষ্ট্য বহন করে।

খাদ্যের সন্ধান ও লভ্যতা, খাদ্যের জন্য জীব শিকার করার ক্ষমতাসহ প্রাণীর পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রসমূহের উন্নতির প্রয়োজন। অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য প্রাণীর শ্বসন অঙ্গের গতিশীলতারও প্রয়োজন পড়ে। শরীরের গঠনের জন্য খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতির দ্বারা উপাদান তৈরি এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে খাদ্য, রক্ত চলাচল এবং বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগের জন্য প্রাণীর ধমনী বা শিরার জালিকারও প্রয়োজন পড়ে।

উদ্ভিদজগত ও প্রাণীর জীবন সংক্রান্ত সীমিত জ্ঞান হতে এটা পরিষ্কার যে, উভয়ের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের জৈবিক কার্যক্রম, পুষ্টি, শ্বসন এবং বংশবৃদ্ধি সমাধা করে।

২.২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অতি প্রাচীনকাল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক বৈচিত্র্য (diversity) সম্বন্ধে মানুষ জ্ঞাত ছিল। জীবের এই বৈচিত্র্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের বিশ্বাস যে, মহান সৃষ্টিকর্তা সকল জীব সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মতবাদ হচ্ছে যে অতীতের জৈব পদার্থের ক্রমবিকাশ বর্তমানের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক বৈচিত্র্য প্রকাশ করছে।

বিজ্ঞানী ল্যামার্ক (১৭৪৪–১৮২৯) সর্ব প্রথমে প্রাণিকুলের বিশেষ অঙ্গ বা অবয়ব বা ইন্দ্রিয়ের তারতম্যের ভিত্তিতে জীবের ক্রমবিকাশের মতবাদ উপস্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদে পরিণত হয়। এই ক্রমবিকাশ মতবাদ সমসাময়িককালে চার্লস ডারউইন (১৮০৯–৮২) এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৮২৩–১৯১৩) উপস্থাপন করেন। ডারউইনের বিখ্যাত পুস্তক On the origin of species–এ ক্রমবিকাশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। ওয়ালেস ও ডারউইনের মতবাদটি জীবকুলের "প্রাকৃতিক নির্বাচন" বা "যোগ্যতমের উদ্ধর্তন" এর উপর প্রতিষ্ঠিত (Species originate as a result of "natural selection" or "survival of the fittest")।[১] ডারউইনের মতে, যে কোনো শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন একক জীবের মধ্যে নগণ্য হলেও স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। এক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, সেই ভিন্নধর্মী প্রাণিগুলোকে সক্ষম এবং টিকে থাকার জন্য জীবন যুদ্ধে সাহায্য করে। এই ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্ভবত নবীন বংশধরগণ পেয়ে টিকে থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সৃষ্টি করে।

অপর দিকে অন্য জীবসমূহের অসুবিধানজক বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ (traits) এর কারণে এই জীবগুলো টিকে থাকতে পারে না। ফলে এই জীবগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। ডারউইনের অনুসিদ্ধান্ত (corollary) হচ্ছে যে, পর্যায়ক্রমিক এই পরিবর্তন সময়ের বিবর্তনে বহুবিধ উদ্ভিদকুল এবং প্রাণীর সৃষ্টি পূর্ববর্তী কম সংখ্যক প্রজাতি এবং এর পূর্বে আরও কম সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হতে সৃষ্টি লাভ করেছে।

ডারউইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অবিরাম পরিবর্তন এবং জীবের বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং পরিবেশে অভিযোজন সমগ্র ভূতাত্ত্বিক যুগে অতি ধীরগতিতে সমাধা হয়েছে। ডারইউন কিন্তু উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি।

ডারউইনের এই বিবর্তন মতবাদের প্রাথমিক অতি নগণ্য পরিবর্তন পর পর প্রতি বংশ পর্যায়ের মোট ব্যাপক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক দ্য ভ্র প্রশ্ন উপস্থাপন করে বলেছেন যে, সম্ভবত কোনো বংশধর তার পূর্বের গোষ্ঠী হতে একক প্রজন্মে অতি ধীরগতির পরিবর্তন নয় বরং অতি ব্যাপক পরিবর্তনের সাহায্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকুলের সৃষ্টি করেছে। স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের এই মতবাদটি হচ্ছে বিপরিণতি বা পরিব্যক্তি অর্থাৎ পূর্বপুরুষের চেহারা হতে ভিন্নাবস্থা হয়ে থাকে এবং বর্তমানে একে পরিবর্তনের এক বিপরিণতি বা পরিব্যাপ্ত অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মিউটেশন বা বিপরিণতি জন্মসূত্রের পার্থক্য নির্দেশ করে এবং বর্ণসঙ্কর (interbreeding) প্রক্রিয়ায় এগুলো বিস্তার লাভ করে। এই মতবাদে জীবের নিকট জাতিসহ পূর্বপুরুষের একই সাধারণ গোষ্ঠী হতে সৃষ্টিলাভ করেছে। সুতরাং এটি প্রতীয়মান যে, জীবের ভিন্ন ভিন্ন একক গণ, গণ আবার গোত্র এই পর্যায়ক্রমিক চিত্র প্রকাশ করে। জীবাশ্মবিজ্ঞানের (Paleontology) বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের জীবাশ্মের প্রকার ও প্রকৃতি জীববিজ্ঞানীগণকে প্রত্যক্ষভাবে এই সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করেছে।

১. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 43

বর্তমানে এটা স্বীকৃত যে, জীবনের সৃষ্টি সমুদ্রে শুরু হয়। কিন্তু কখন প্রক্রিয়াটি শুরু হয় তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগ অর্থাৎ ৬০ কোটি বছর পূর্বের জীব সম্বন্ধে খুব কম জানা যায়। কারণ নরম দেহবিশিষ্ট জীবসমূহের কোনো নমুনা কোথাও সংরক্ষিত হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় ২০০ বা ৩০০ কোটি বছর পূর্বে কোনো না কোনো প্রকার জীবনের উদ্ভব হয়েছিল। ক্যানাডার অনটারিও হতে প্রায় ১৯০ কোটি বছর পূর্বের বহুকোষী শেওলা এবং সম্ভবত চুনো ফ্ল্যাজিলেট পাওয়া গেছে।

ক্যামব্রিয়ান যুগ আগমনের সময় থেকে বনানী ও প্রাণী অর্থাৎ জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্যালিওজয়িক মহাযুগের প্রথমার্ধ অর্থাৎ ক্যামব্রিয়ান, ওরডোভিসিয়ান ও সিলুরিয়ান প্রধানত শেওলার যুগ নামে পরিচিত। সিলুরিয়ান এবং পরবর্তী ডেভোনিয়ানকে জীবাশ্ম বিজ্ঞানীগণ মৎস যুগ নামে অভিহিত করেছেন। কারণ এই সময়কালে প্রাণীরূপে মাছের প্রাচুর্য বিদ্যমান ছিল। ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী মাছ হতে উভচর বৈশিষ্ট্যের জীবের (amphibians) আবির্ভাব ঘটে। সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান যুগদ্বয়ে সর্বপ্রথম স্থল বনানী আবির্ভূত হয়।

ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিক— ৩৫ কোটি বছর পূর্বে প্রথম বীজধারী উদ্ভিদ জন্মে। পরবর্তীতে কারবনিফেরাস যুগে স্থলজ উদ্ভিদবর্গের প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। এগুলো হচ্ছে বহুবিধ ফার্ন, দৈত্যানুরূপ ক্লাব মস, টেরিডোস্পার্ম (বীজবহনকারী ফার্নরূপ উদ্ভিদ) এবং প্রাচীন মোচাকৃতি জাতীয় বৃক্ষ (These are ferns, giant club mosses, pteridosperms (seed bearing fern like plants) and primitive conifer type of trees}। সেই সময় অর্থাৎ কার্বনিফেরাস যুগের উষ্ণ, আর্দ্র, স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমির পরিবেশে এই শ্রেণীর প্রচুর উদ্ভিদ-কয়লা স্তর সৃষ্টি করেছে। সম সাময়িককালে উভচর প্রাণীর উদ্ভব/বিস্তৃতি ঘটে, সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরও আগমন ঘটে। জীবাণু দ্রুত প্রসার লাভ করে।

পরবর্তী পারমিয়ান যুগ শুষ্কতর ও উষ্ণতর হয়ে পড়ে। তাই অনেক কয়লা উৎপাদী প্রাচীন উদ্ভিদবর্গ মারা যায় এবং অনেক নতুন উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। এককোষী ফানজাতীয় উদ্ভিদ পরিবর্তিত হয়ে জিমনোস্পার্ম বা সরলবর্গীয় উদ্ভিদ যুগ সৃষ্টি করে। পারমিয়ান যুগের পর সাইকাড ও কনিফার এর ব্যাপক বিস্তার প্রকাশ পায়। এসময় অর্থাৎ ট্রায়াসিক যুগে বৃহৎ সামুদ্রিক সরীসৃপের আগমন ঘটে এবং পরবর্তী জুরাসিক যুগে প্রধান ও ব্যাপক সংখ্যায় সরীসৃপ স্থলভাগে প্রসার লাভ করে। এই জুরাসিক এবং পরবর্তী ক্রেটাসিয়াস যুগ একত্রে সরীসৃপ যুগ নামে পরিচিত। ক্ষুদ্রাকারের প্রাচীন প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমোন্নতি সম্ভবত ২২ কোটি বছর পূর্বে ট্রায়াসিক যুগে প্রকাশ পায়। এই জীবগুলোর বর্ধন ও পরিবর্তন অত্যন্ত শ্লথ গতিতে টারসিয়ারি মহাযুগ পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। ক্রেটাসাস যুগের এক প্রধান পরিবর্তন হচ্ছে পুষ্পধারী (angiosperm) উদ্ভিদের জন্মলাভ এবং বড় মানের অনেক উদ্ভিদ ওক, প্লেইন, সিকামোর এবং ওয়ালনাট (oak, plane, sycamore, walnut) সেই সময়ে পরিবর্ধিত হয় এবং ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে।

সারণি ২.ক : ভূতাত্ত্বিক সময়– সারণির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ[২]

ভূতাত্ত্বিক যুগ	সময়কাল (কোটি বছর)		উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ	প্রাণীর ক্রমবিকাশ
প্লিসটোসিন ও রিসেন্ট	০.২	পুষ্প	সম্ভবত তুষার দিয়ে অনেক বনানী প্রজাতির মৃত্যু ঘটে (Probably many plant species extinguished byice)।	আধুনিক মানুষের উদ্ভব (Rise of modern man)।
প্লায়োসিন	০.৫		আধুনিক নাতিশীতোষ্ণ শ্রেণীর উদ্ভিদ বর্তমানে ব্রিটেনে বিদ্যমান (Modern temperate type plants in existence in Britain)।	আফ্রিকায় মানব এইপ বৃহত্তর স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা হ্রাস (Man apes in Africa. Decline of larger mammals)
মায়োসিন	১.৯	ধারী	বনভূমির ক্রমাগত হ্রাস, তৃণভূমি বৃদ্ধির সময় (Grassland begining to increse at the expense of forests)।	স্তন্যপায়ী জীবের প্রাচুর্য; ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় এপ বিদ্যমান (Mammals supreme, Apes abundant in tropical regions)।
অলিগোসিন	১.২		লতাজাতীয় বনানীর ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধি (Gradual increase of herbacious plants)।	আধুনিক স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব (Rise of modrn mammals)।
ইয়োসিন	২.৭	গাছের যুগ	লতাজাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষা গাছের প্রাধান্য, কিন্তু সাধারণভাবে বনানীর আধুনিক বৈশিষ্ট্য আরম্ভ কাল (Trees dominant over herbacious plants, but vegetation generally begin to take on modern aspect)।	প্রাচীন স্তন্যপায়ী জীব বিদ্যমান। সাপের ক্রমবিকাশ (Archaeic mammal forms. Development of snakes)।

২. Robinson, H. (1972) : Biogeofmphy, p. 44

ক্রেটাসাস	৭.০	পুষ্পধারী গাছের যুগ	পুষ্পধারী গাছের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার (Development and spread of angiospems or flowering plants)।	সরীসৃপ-প্রকৃতি জীবের অতি অগ্রগতি। ফলে যুগটির শেষে বৃহদাকৃতি সরীসৃপের অবলুপ্তি। সত্যিকার অর্থে পাখির আবির্ভাব। ক্ষুদ্রাকার স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপস্থিতি (Extreame specialisation of reptilian forms, leading to extinction of larger reptiles towards the close of the period. First true birds appears. Small mammals in existence)।
জুরাসিক	৫.৭	জিম্নো-স্পার্ম এর যুগ	সাইকাড, ফার্ন, মোচাকৃতি বৃক্ষের পূর্ণতা প্রাপ্তি। সম্ভবত অ্যানজিওস্পার্ম এর উদ্ভব (Cycads, ferns and conifers well developed. Angiospermes probably emerge)।	বহু সংখ্যক সরীসৃপ। সমুদ্র হতে স্থলভাগ ও বায়ুমণ্ডলে এগুলোর আগমন। প্রাচীন ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব (Reptiles numerous and move from sea on to land and into the air. Small primitive mammals make their appearance.)।
ট্রায়াসিক	৩.২		হর্সটেল, ফার্ন, সাইকাড এবং মোচাকৃতি উদ্ভিদ (Horsetail, ferns, cycads and conifers)।	প্রথম ডাইনোসরসহ বৃহৎ সামুদ্রিক সরীসৃপের আবির্ভাব (Large marine reptiles including first dinosors)।

সিলুরিয়ান	৪.০	প্রাথমিক ভূমি বনানী যুগ	প্রচুর পরিমাণে শেওলা। এই যুগের শেষে সম্ভবত এককোষী উদ্ভিদের উদ্ভবের প্রারম্ভকাল (Algae abundant. Vasicular land plants may have begun to appear towards the end of the period)।	চোয়ালবিহীন, মাছ। ইউরিপটারিডের সর্বাধিক সংখ্যা কিন্তু গ্রাপটোলাইটের সংখ্যা হ্রাস (Armoured jawless fishes. Eurypterid at their peak but graptolyte on the wane)।
অরডো-ভিসিয়ান	৬.৫	শ্যাও-	প্রধানত শৈবাল একমাত্র বনানী। সঠিক স্থল উদ্ভিদ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে (Plant life consists mainly of algae. First true land plant established)	বর্মের চোয়ালবিহীন মাছের আগমন। প্রচুর সংখ্যক এবং সর্বাধিক গ্র্যাপটোলাইট বিদ্যমান। ব্র্যাকিওপোডা প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান (Armoured jawless fishes make their appearance, graptolytes at their peak. Brachiopoda abundant)।
ক্যাম্ব্রিয়ান	৭.০	লার যুগ	শৈবালের প্রাধান্য। প্রাচীনতম স্থল উদ্ভিদের উপস্থিতির অস্পষ্ট ধারণা (Algae dominant. Faint suggestion that the earliest land plant existed)।	অমেরুদণ্ডী প্রাণিবর্গসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক জীবের আবির্ভাব। ট্রিলোবাইটের প্রাধান্য। প্রবাল/কোরাল এবং গ্রাপটোলাইটের আগমন (Appearance of representative of almost all invertebrate phyla: Dominance of tribolites. First corals and graptolites.)।

প্রাক–ক্যামব্রিয়ান		শ্যাওলার যুগ	প্রাক–ক্যামব্রিয়ান সময়ের বনানী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয় যে, এই সময়ে অতি সাধারণ বনানী যেমন শৈবাল, ছত্রাক এবং এককোষী বনানী বিদ্যমান ছিল (Very litte is known about plants in precambrian times but it seems fairly certian that such simple, primitive forms as algae, fungi and unicelluar forma existed)।	অনুমান সাপেক্ষের এবং প্রাণীরূপ জীবন বিরল ছিল। তবে ধারণা করা হয় যে অতি কোমল দেহবিশিষ্ট জীবন, যেমন অ্যানেলিড, জেলি মাছ এমনকি স্পঞ্জজাতীয় জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল (Traces of animal life rare but there are suggestions that some soft bodied creatures such as annelids, jellyfish and may be sponges might have existed)।

উৎস : Robinson, H: Biogeography ; Mac Donald & Evans Ltd., 1972

টারসিয়ারি মহাযুগ, ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছরের সময়কে কেন্দ্র করে আবৃতবীজী (যেসব উদ্ভিদের বীজসহ ফলত্বক বিদ্যমান) অনাবৃতজীবীজাতীয় উদ্ভিদকে স্থানচ্যুত করে। এই সময় লতাজাতীয় বনানী অপেক্ষা গাছের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। মধ্য টারসিয়ারি মহাযুগ অর্থাৎ মায়োসিন যুগে স্ব–বৈশিষ্ট্যসহ ঘাসের আগমন ঘটে এবং বহু এলাকায় বনের পরিবর্তে ঘাস পরিবর্ধন লাভ করে। টারসিয়ারি মহাযুগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর যুগ নামে পরিচিত। ক্রেটাসাস যুগের শেষের বৃহৎ সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর বিলুপ্তি হঠাৎ করে স্তন্যপায়ী জীবের ধীরগতির বর্ধন ও বিস্তার ট্রায়াসিক সময়ে বৃদ্ধি পায়। ইয়োসিন ও প্যালিওসিন যুগদ্বয়ে প্রাচীন স্তন্যপায়ী জীব ও সাপের আবির্ভাব লক্ষণীয় ছিল। পরবর্তী অলিগোসিন যুগে আধুনিক স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি হয় এবং অন্ততঃ আকারের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এগুলো মায়োসিন যুগে পৌঁছে। এই মায়োসিন যুগে আফ্রিকায় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যবিহীন আঙুলহীন বানর বিশেষ, এইপ (ape) যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। এর পরের প্লায়োসিন যুগে বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা কমে যায় এবং মানব এইপ এর আগমন ঘটে। পরবর্তী যুগ অর্থাৎ শেষের প্লিসটোসিন যুগে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটে (সারণি ২.ক)।

প্রাক ক্যামব্রিয়ান যুগ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে জীবন গঠনের যে পরিবর্ধন তা হচ্ছে, অতি সহজ, সরল জীব হতে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন দ্বারা সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী–মানুষের রূপান্তরণ হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ক্ষেত্রে এই পরিবর্ধন ও পরিবর্তনে লক্ষ্য করা গেছে যে, কিছু প্রাথমিক প্রাচীন উদ্ভিদ এবং প্রাণী বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে। আর এক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কিছু কিছু জীব একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাসস্থানে (habitat) বিদ্যমান রয়েছে।

জীবের ক্রমবিকাশ এবং গ্রুপভিত্তিক বিস্তারণের ব্যাখ্যা জীবভূগোলবিদগণের নিকট এক জটিল অধ্যায়। এই বিষয় জীববিজ্ঞানের এক অসমাধানযোগ্য সমস্যা (unsolved problem)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পি.জি. ডারলিংটন অনেক নিয়ামক, যেমন জীববিজ্ঞান ভিত্তিক ক্রমবিকাশ (biological evolution), ছড়িয়ে পড়ার ধরন (Modes of dispersal), জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ভূতাত্ত্বিক ঘটনাসমূহের সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্তের এলাকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক বিস্তারণের (natural distribution) ক্ষেত্রে চার প্রধান ক্রমবিকাশীয় আন্তর্নিহীত, পরিবেশীয় এবং ভূতাত্ত্বিক নিয়ামক (Evolutionary, innate, environmental and geological factors) গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিয়ামকগুলোর সাথে পঞ্চম নিয়ামক, মানুষকে গ্রহণ করা যায়। কারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ামকের সাথে যুক্ত হয়ে জীবের বিস্তারণ প্যাটার্ন প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানী নেইল এর মন্তব্য "প্রকৃতি মনোনীত বা নির্বাচিত করে, মানুষ তখন প্রতিকূল হয়" ("As Neill has remarked Nature proposes, man then disposes")[৩] বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উদ্ভিদ প্রজাতি বা জীবের গ্রুপ (species or groups of organisms) সময় এবং স্থান ভিত্তিক উৎপত্তির দ্বারা বিস্তার লাভ করলেও ভিন্ন ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুর পরিবর্তন, অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদবর্গের সাথে প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং অন্যান্য কারণে এগুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে। সম্ভবত ভূতাত্ত্বিক দুর্ঘটনা যেমন সংযোগকারী স্থলভাগের নিমজ্জন দ্বারা প্রাচীনতর জীবের প্রবেশপথ একদিকে যেমন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে (destroyed the avenuds by which the older forms migrated) তেমনি অন্যদিকে এই নিয়ামকের অনুপস্থিতিতে নতুনতর প্রজাতির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এ কারণে মেরুদণ্ডী প্রাণিগোষ্ঠী অপেক্ষা অমেরুদণ্ডী প্রাণিগোত্রের বিস্তারণ অতি ব্যাপক। এ বিষয়টি অ্যানি ও স্পিটডত এর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে...

> মিঠা পানির অতি প্রাচীন গোত্রের শামুক ব্যাপক এলাকায় যেমন প্ল্যানোরবিড, ফাইসাইড, লিমনাসাইড, অ্যানসিলিড, ইউনিওনিড এবং স্ফেরাইড, জুরাসিক যুগে এবং এগুলোর অতি সীমিত সংখ্যা আরো প্রাচীন যুগ—কারবনিফেরাসে বিদ্যমান ও বিস্তৃত ছিল (Among fresh water molluscs the earliest genera are likewise most widely distributed, as illustraed by the 'planorbids,' physides, lymnacides, ancylids, unionids and sphaeriids, all of which are present in the juranic and some as early as the carboniferous)।[৪]

সময়ভিত্তিক বৃহৎ স্কেলের ভূতাত্ত্বিক যুগ জীবের কিছু কিছু গোষ্ঠী ও গোত্রের ব্যাপক বিস্তারণের এক মুখ্য নিয়ামক হলেও জে.সি. উইলিস প্রজাতির যুগ এবং এদের পরিসরের মধ্যে যে অপরিহার্য এক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেক্ষেত্রে তিনি এই মন্তব্যে

৩. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 44
৪. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 50

পৌঁছেন যে, এই প্রকারের সম্বন্ধ প্রাকৃতিক ও বাস্তুসংস্থানিক প্রতিবন্ধক, মানুষের কার্যকলাপ এবং অন্যান্য নিয়ামক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। এই আচ্ছাদন উদ্ভিদ বিস্তারের ধীর গতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (while it appears that greater geological age is a significant factor in wide distribution of certian genera and families, it should be noted that G.C. Willes, who tried to establish an invariable connection between the age of a species and the extent of their range, was forced to the conclusion that any such relationship could be veiled by the presence of physical and ecological barriers, by the action of man, and by other factors, even among the slow spreading plants)।

অস্ট্রেলিয়াকে মনোট্রিম (ডিম দেয়া স্তন্যপায়ী জীব) এবং মারসুপিয়ালের সীমাবদ্ধ আবাসস্থল হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে জীবের ক্রমবিকাশ এক প্রধান নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মারসুপিয়াল সেসব স্তন্যপায়ী প্রাণী যেগুলোর বাচ্চা ধরে রাখার থলি রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায়তেও কিছু মারসুপিলায় বিদ্যমান। এশিয়া হতে অস্ট্রেলিয়ার পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পরই অন্যান্য মহাদেশে উচ্চ শ্রেণীর অমরাবাহী স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিকাশ ঘটে। সুতরাং সেই সকল অমরাবাহী স্তন্যপায়ী জীব (placental mammals) অস্ট্রেলিয়ায় লক্ষণীয় যেগুলো সাঁতার কাটা বা উড়ন্ত অবস্থা বা স্থল সংযোগের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ঘটনাচক্রে ভাসন্ত কাঠের (rafted there on down drift) ভেলার সাহায্যে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। আমেরিকার মহাবিষধর ঘর্ঘর শব্দবাহী সাপ (rattle snakes) মেক্সিকোতে ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং পরে এগুলো এই মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত বেরিং প্রণালীতে কোনো স্থল ব্রিজ (land bridge) না থাকার কারণে এই শ্রেণীর সাপ এশিয়া মহাদেশে বিস্তার লাভ করতে পারেনি অথবা সেস্থানে স্থল ব্রিজ থাকলেও কেবল আমেরিকার উপযুক্ত পরিবেশে সেই শ্রেণীর সাপের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং ধারণা করা হয় যে, আংশিকভাবে হলেও বর্তমানের জীবসমূহের বিস্তারণ ক্রমবিকাশের নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

জীবের শরীরের গঠনতন্ত্র, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণ সংক্রান্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর ফলাফল জীবদের এক নির্দিষ্ট পন্থায় পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। কোনো এক নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব অভিযোজিত হয়ে পড়লে এই জীবগুলো যদি এই পরিবেশ হতে বহির্গমন করে তাহলে জীবগুলো টিকে থাকতে পারে না, পারলেও এগুলোকে নতুন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে জীবের অন্তর্নিহিত নিয়ামক এগুলোর বিস্তারণ সীমিত করে রাখে।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক জীবের এক প্রজাতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলেও অন্য প্রজাতির জন্য সেই প্রতিবন্ধক চলাচলের পথ হিসেবে গণ্য হতে পারে। পানামা যোজক (isthmus of panama) পানামা সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ক্রান্তীয় সামুদ্রিক প্রাণীর চলাচলের বাধা সৃষ্টি করলেও তা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে স্থলজ প্রাণীর চলাচলের পথ হিসেবে কাজ করেছে। একইভাবে সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী (cordillera) উভয় প্রান্তের

নিম্নভূমির প্রাণীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলেও বিড়াল গোত্রের প্রাণী যেমন—পুমা বা আমেরিকার বনবিড়াল ব্রিটিশ কলম্বিয়া হতে প্যাটাগনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে।

শারীরবৃত্তীয় দিক দিয়ে জীবের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখি, সাপ ও উভচর প্রাণী হতে পৃথক। এই পৃথক বৈশিষ্ট্যের প্রাণীগুলোর শরীরের অভ্যন্তরীণ গঠন সেগুলোর শরীরের স্থিতিশীল তাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখি, সাপ ও উভচর প্রাণী অপেক্ষা উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলের কম তাপ সহ্য করতে সক্ষম। তাই এই সকল অঞ্চলে সাপ ও উভচর প্রাণী নয় স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। উভচর প্রাণী ও সাপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে তাপ গ্রহণ করে। উভচর প্রাণীর শুষ্ককরণ (desication) বৈশিষ্ট্য সহ্য ক্ষমতা না থাকার কারণে এই সকল প্রাণী কদাচিৎ আর্দ্র পরিবেশের বাইরে লক্ষ্য করা যায়। নগণ্য সংখ্যক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত উভচর প্রাণী শুষ্ক অঞ্চল বা শুষ্ক বনভূমিতে বিদ্যমান রয়েছে।

স্তন্যপায়ী জীবের প্রজনন ও প্রজনন ক্ষমতার (reproduction and fecundity) গুরুত্বও এই জীবগুলোর বিস্তারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। উত্তর আমেরিকার কয়োট (ক্ষুদ্র নেকড়ে--coyote) বছরে মাত্র একবার বাচ্চা জন্ম দেয়। কিন্তু এই প্রাণীর শিকারের জীবগুলো (শশক, ইঁদুর এবং অনুরূপ প্রাণী) বছরে অনেকবার বাচ্চা দেয়।

অন্তর্নিহিত নিয়ামক বনানীর ক্ষেত্রেও প্রাণীর অনুরূপ কাজ করে। প্রশস্ত পত্রবাহী গাছ অপেক্ষা সরল বর্গীয় গাছের অন্তর্নিহীত বৈশিষ্ট্যের কারণে শেষের গাছগুলো উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চল, উচু ভূমি, আর্দ্র অবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মৃত্তিকায় (poorer soils) জন্মলাভ করে। অনেক উদ্ভিদ আবার বিশেষ অভিযোজনের মাধ্যমে বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য বহন করে। উদ্ভিদের বিস্তার লাভের প্রক্রিয়া ব্যাপকতর এবং বহুবিধ। এগুলো হচ্ছে পালক ও পক্ষসদৃশ বীজ (winged and plumed seed), যেন এগুলো বায়ুর সাহায্যে বাহিত হতে পারে, বীজের পড, যেগুলো হঠাৎ ফেটে বীজকে ছড়িয়ে দেয়, বীজবাহী ফলের গোলাকৃতি আকার যেন এগুলো গড়িয়ে অন্যত্র পরিবাহিত হতে পারে এবং পানির সাহায্যে নষ্ট না হওয়া অবস্থায় ফলসমূহের ভাসন্ত থাকার বৈশিষ্ট্যসমূহ।

২.৩. পরিবেশীয় নিয়ামক

প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ামকগুলো হচ্ছে স্থল ও জলভাগের বাহ্যিক গঠন। এর মধ্যে সুগম্যতা (accessibility), আয়তন জলবায়ু এবং মৃত্তিকা অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান ভূতাত্ত্বিক প্রপঞ্চসমূহের পরিবর্তনের সাথে জড়িত বিধায় তা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিষয়ক নিয়ামকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩.১. আয়তন : জীবের-প্রজাতি সংখ্যা ও অঞ্চলের আয়তনের সম্বন্ধ বর্তমানে এক গ্রহণযোগ্য বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়। একই ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বৃহৎ দ্বীপ ও ক্ষুদ্র দ্বীপের উদ্ভিদবর্গ ও প্রাণিকুলের প্রজাতির সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে, বৃহৎ দ্বীপের প্রজাতির সংখ্যা ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রজাতির সংখ্যা অপেক্ষা বেশি। বৃহৎ দ্বীপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত (varied assortment) বৃহৎ তৃণভোজী ও মাংশাসী প্রাণীসহ বহু সংখ্যায় স্তন্যপায়ী জীব

বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কাছাকাছি অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে কম সংখ্যায় এবং ক্ষুদ্র অথবা কোনো স্থলজ স্তন্যপায়ী জীবের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকে না। এই ক্ষেত্রে ডারলিংটন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দ্বীপের এমন কোনো নির্দিষ্ট আয়তন সীমা (critical size) নির্ধারণ করা যায়নি যার বাইরে মহাদেশের সকল জীবজন্তু দ্বীপটি প্রতিপালন করবে এবং এই আয়তন সীমার নিচে জীবজন্তু দ্রুত হ্রাস পাবে। তবুও লক্ষণীয় যে, কোনো অজ্ঞাত সম্বন্ধের কারণে আয়তনের হ্রাস জীবের প্রজাতির সংখ্যাও হ্রাস করে। ডারলিংটন নিম্নের পৃথক দুই সারণির উপাত্তের মাধ্যমে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম সারণিতে (সারণি ২. খ) পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি দ্বীপের আয়তন এবং উভচর প্রাণী ও সাপের সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে (সারণি ২.গ) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর আয়তন ও পোনেরাইন পিপীলিকা (ponerine ant) প্রজাতির সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সারণি ২.খ : উভচর ও সাপ প্রজাতির প্রাণীর আবাস এলাকা ও সংখ্যা

আনুমানিক আয়তন (বর্গমাইল)	উভচর ও সাপ প্রজাতির সংখ্যা	
	সহজ সংখ্যা (Round number)	সঠিক সংখ্যা (Actual number)
৪০,০০০	৮০	৭৬–৮৪
৪,০০০	৪০	৩৯–৪০
(৪০০)	(২০)	—
৪০	১০	৯
৪	৫	৬

উৎস ৫ : H. Robinson (1972) : Biogeography : McDonald & Evans Ltd. pp. 52.

সারণি ২.গ : বিভিন্ন দ্বীপে পিপিলিকা প্রজাতির আবাস এলাকা ও সংখ্যা

দ্বীপ	আনুমানিক আয়তন (বর্গমাইল)	পোনেরাইন পিপিলিকা প্রজাতির সংখ্যা
নিউগিনি	৩০,৭,০০০	১১২
সলোমনস	১৬,০০০	৩৭
ফিজি	৭,০০০	১৭
নিউহেব্রাইডিজ	৫,৭০০	১১
সামোয়া	১,২০০	৬
টোংগা	২৫০	৩
রোটুমা (Rotuma)	১৪	১

উৎস ৬ : H. Robinson (1972) : Biogeography : McDonald & Evans Ltd. pp. 52.

উপরের আলোচনা ও উদাহরণ হতে এটি স্পষ্ট যে, আয়তন ও জীবের প্রজাতির সংখ্যার মধ্যে এক সাধারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান যদিও কেমনে এবং কেন তা পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ আয়তন প্রজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ডারলিংটন মনে করেন যে, স্থলভাগ যে স্কেলের হোক না কেন (no matter what their scale) বর্ণিত সম্বন্ধ সকল স্থলভাগের জন্য প্রযোজ্য যদিও আয়তনের প্রভাব অন্যান্য নিয়ামক দিয়ে আচ্ছাদিত হতে পারে।

অ্যালি এবং স্মিডড (Allee and Schmidt) এর ভাষায় এই হার প্রকাশ পেয়েছে। গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, ভিন্ন সংখ্যায় কোনো এক জীবের প্রজাতিকে এক নির্দিষ্ট আয়তনের স্থান দেয়া হলে প্রজাতিটির একক জীবের আকারের পার্থক্য প্রকাশ পায়। সেম্পারের মূল গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনো পাত্রে লিমনিয়া স্ট্যাগনালিস (Limnea stagnalis) রক্ষিত হলে সম সময়ের ব্যবধানে ১০০, ২০০, ৬০০ ও ২০০০ সি.সি. (শরীরের পানিসহ) জীবগুলো যথাক্রমে ৫, ৯, ১২ ও ১৮ মি.মি. দৈর্ঘ্যের খোলকে বর্ধিত হয়। আবার একই পাত্রে বেশি সংখ্যায় রাখা হলে জীবগুলো ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়।[৫]

আয়তনের বিস্তৃতির হ্রাস বৃদ্ধি এবং প্রজাতির ব্যাপকতা ও সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সন্দেহাতীত সম্বন্ধ ছাড়াও আয়তনের পরিমাণ ও জীবের ছড়িয়ে পড়ার সম্বন্ধ বিদ্যমান। ডারউইন নিরূপণ করেছেন যে, জীবের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা হচ্ছে মহাদেশে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে এবং মহাদেশ হতে দ্বীপে লক্ষণীয় এবং তিনি এই প্রবণতার ক্ষেত্রে আয়তনের সাথে ক্রমবিকাশের সংযোগ উপস্থাপন করেছেন। ভৌগোলিক বিস্তারণ বা ছড়িয়ে পড়ার প্রধান প্যাটার্ন (Geographical dispersal pattern) সম্ভবত জীবের পর পর প্রধান গ্রুপের ক্রমবিকাশ বৃহত্তম এলাকায় উপযুক্ত পরিবেশে আরম্ভ হয় এবং পরে ক্ষুদ্রতর এলাকা, বৃহৎ মহাদেশ হতে ক্ষুদ্র মহাদেশে এবং সকল মহাদেশ হতে দ্বীপসমূহে বিস্তার লাভ করে। উল্লেখ্য, যেসব জীববিজ্ঞানী এই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী নন।

২.৩.২. জলবায়ু : এটা প্রতীয়মান যে জলবায়ু ও জীবের প্রজাতির সংখ্যার মধ্যে সহ-সম্বন্ধ (correlation) বিদ্যমান। উপযুক্ত আদর্শ জলবায়ু বিশিষ্ট এলাকা অধিক সংখ্যার জীবের প্রজাতি ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে অনুকূল জলবায়ুর সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। কারণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য অতি ব্যাপক তারতম্যের জলবায়ুর পরিবেশের প্রয়োজন। বরং জলবায়ুর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ জলবায়ুর প্রতিকূল অবস্থা বর্ণনা করা সহজ। যেমন নিম্ন তাপমাত্রা ও জলীয় পদার্থের অপ্রতুলতা জলবায়ুর এই দুই অবস্থা জৈব প্রাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর (most inimical to organic life)। জলবায়ুর অন্যান্য শর্তসমূহ যেমন অত্যধিক সূর্যরশ্মি, জলীয় পদার্থ এবং বায়ু প্রবাহ জীবের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে জলবায়ুর দুই প্রধান উপাদান নিম্ন তাপমাত্রা এবং পানির অভাব উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে উচ্চমাত্রার উষ্ণতা ও জলীয় পদার্থ সম্ভবত প্রচুর সংখ্যায় জীবের সমাবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।[৬]

অতি সাধারণভাবে বা সাধারণ পন্থায় জলবায়ুর পরিবেশ ও জীবের প্রজাতি সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে ক্রান্তীয় বনের হাজার হাজার জীবের

৫. Robinson, H. (1972) : Biogeofmphy, p. 53
৬. Robinson, H. (1972) : Biogeofmphy, p. 55

প্রজাতির সাথে উত্তরের বনাঞ্চলের মাত্র কয়েক ডজন বিদ্যমান প্রজাতির সাথে তুলনীয়। অনুরূপভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশি। ভিন্নধর্মী জীবজন্তু বা প্রাণিকুল বিদ্যমান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট উদ্ভিদ সংগঠন যেমন—পর্ণমোচী বনের ক্ষেত্রে উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা কমতে থাকে। এর উদাহরণ ডারলিংটনের বক্তব্য হতে প্রকাশ পায়।

> "দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রান্তীয় এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন বর্গের অনেক সম্প্রদায়ের হাজার হাজার প্রজাতির পোকামাকড়সহ বহু ভিন্নধর্মী প্রাণী বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ আমাজানীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যে সম্ভবত ২,৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু টেরাডেলফুয়েগোতে মাত্র ছয় প্রজাতি এবং এ্যান্টার্কটিকায় কোনো উদ্ভিদ বিদ্যমান নয়। স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিকে কমতে থাকে এবং বর্তমানে অ্যান্টারটিক মহাদেশে সত্যিকার অর্থে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী নেই।"[৭]

জলবায়ুর অনুকূল বৈশিষ্ট্য এবং জীবের প্রজাতির সংখ্যার মুখ্য সম্বন্ধ সাধারণভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আন্তঃক্রান্তীয় অঞ্চলে স্থলজ জীবের ব্যাপকতা ও বহু সংখ্যা নির্দেশ করলেও এটা পরিষ্কার যে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলই হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকার প্রধান এলাকা। ডারলিংটনের যুক্তি হচ্ছে প্রধান প্রধান প্রাণী উপযোগী (সাধারণত ক্রান্তীয়) জলবায়ুতে ক্রমবিকাশ লাভ করার পর কম উপযোগী জলবায়ু অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ডব্লিউ.ডি. ম্যাথিউ মত দ্বৈততা প্রকাশ করে বলেছেন যে, সার্থক উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈরী বা প্রতিকূল (inhospitable) জলবায়ুতে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। এই যুক্তি বিজ্ঞানী এলসওয়ার্থ হান্টিংটনের মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ, জলবায়ু-প্রতিরোধ এলাকায় গড়ে উঠার মতবাদের সাথে তুলনীয়।

২.৩.৩. মৃত্তিকা : উদ্ভিদ বিস্তারণের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার প্রভাবের জ্ঞান উদ্ঘাটিত হলেও প্রাণীর উপর মৃত্তিকার প্রভাবের জ্ঞান পরিষ্কার নয়। মৃত্তিকা খননকারী বা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বসবাসকারী জীব (creaturs) ছাড়া মৃত্তিকার প্রভাব অন্যান্য প্রাণীর উপর বনানীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

মৃত্তিকার রন্ধ্রীয় ও গভীরতার বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ পরিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও উদ্ভিদের বিস্তারণের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার রাসায়নিক গঠনও প্রধান ভূমিকা পালন করে। অনেক উদ্ভিদ, যেমন বনাঞ্চলের উদ্ভিদ চুনমিশ্রিত মৃত্তিকায় পরিবর্ধিত হয়, তেমনি বর্গ ও জলাভূমির উদ্ভিদ (bog and marsh plant) অতি অম্লজাতীয় মৃত্তিকায় জন্মলাভ করে। তদুপরি মৃত্তিকার অপরিহার্য অতি নগণ্য পরিমাণ খনিজ উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক পরিবর্ধন বজায় রাখে। এগুলোর অভাবে উদ্ভিদের অনেক প্রজাতি জন্মলাভ করতে পারে না বা জন্মিলেও অতি শীর্ণকায় অবস্থা প্রকাশ করে।

মৃত্তিকার অনুজীব অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ মৃত্তিকার সম্বন্ধ গড়ে তোলে। নিম্নজাতীয় বনানীর শিকড়ের গুটিতে কিছু কিছু জীবাণু নাইট্রোজেন সংরক্ষিত করে রাখে। ফলে এসব বনানীর প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সহজলভ্য হয়। এসব জীবাণু মৃত্তিকার অতি অম্ল বৈশিষ্ট্য

৭. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 56

সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে মাইকোরাইজাল ছত্রাক (mycorhyzal fungi) অম্ল মৃত্তিকায় জন্মলাভ করে। অন্যান্য বনানীর জন্যও মৃত্তিকার উপাদানগুলো অনুরূপ কার্যক্রম সমাধা করে।

উদ্ভিদের অনুরূপ প্রাণীরও বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু প্রাণী তাদের খাদ্যের উপাদানগুলো বনানী হতে সংগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রাণীর নগণ্য সংখ্যা বা অনুপস্থিতি ঐ মৃত্তিকা অঞ্চলের বনানীর আবরণের প্রকৃতির প্রতিফলন। কিন্তু অনেক এলাকায় প্রাণী ও মৃত্তিকার মধ্যে যোগসূত্র (association) বিদ্যমান। খোলকের জন্য শামুকের চুনের প্রয়োজন। তাই শামুক চুনাবিশিষ্ট মৃত্তিকা এলাকায় লক্ষ্য করা যায়, অম্লজাতীয় বনভূমি ও জলাভূমি মৃত্তিকায় নয়।

২.৪. ভূতাত্ত্বিক নিয়ামক

পৃথিবীর অনেক বিচ্ছিন্ন এলাকার একই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বিস্তারণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। জার্মান বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড ওয়েগনার মহাদেশের মহিসঞ্চরণ (continental drift) মতবাদ দিয়ে অতীতের উদ্ভিদ বিস্তারণের সমস্যা ও প্রধান প্রধান জলবায়ু বিস্তারণের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকার পারমিয়ান যুগের ফার্নজাতীয় গ্লোসোপটারিস উদ্ভিদকুল (glossopteris flora) বিস্তারণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ বর্তমানের ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বর্ণিত স্থলভাগগুলো (দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্টিকা) সংযুক্ত অবস্থায় গন্ডোয়োনা ল্যান্ড-এর সেই যুগে অবস্থান, এই বিস্তারণের ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা যায়। কারণ পরবর্তীতে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে সঞ্চরণের সাহায্যে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

একই প্রজাতির স্থলজ জীবের দূরবর্তী পৃথক অঞ্চলের বিস্তারণের ব্যাখ্যা মহীসঞ্চারণের দ্বারা করা গেলেও এই শ্রেণীর ব্যাখ্যা অনেক সময় সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। মহীসঞ্চারণের মতবাদের পুনঃমূল্যায়নের স্বপক্ষে প্রত্ন-চুম্বকীয় সাক্ষ্য প্রমাণ (Palcomagnetic evidence) এবং সমুদ্রতলের গ্রন্থ উপত্যকার নতুন জ্ঞানের আলোকে বলা যায় যে, অতীতে কোনো না কোনো প্রকারের সঞ্চারণ সংঘটিত হয়েছে।

দূরবর্তী পৃথক অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অসমাধানযোগ্য বিস্তারণ (puzzling distributions) সুদূর অতীতের ভিন্ন এক মতবাদ, সংকীর্ণ স্থলজ সংযোগ বা দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা মহাদেশীয় এলাকার সংযোগ পথের মাধ্যমে জীবের প্রজাতির অভিপ্রয়ান বা দেশান্তর ঘটেছিল বলে ব্যাখ্যা করা হয়। প্লায়োস্টোসিন বরফযুগে মহাদেশের অতি ব্যাপক এলাকা গভীর বরফ আবরণের সাহায্যে আবৃত ছিল। বরফ সিটের ওজনের ফলে নিচের ভূমির নিমজ্জন ঘটলেও সমুদ্রের পানি মহাদেশের বরফ সিটে যুক্ত হবার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ পানিতল যথেষ্ট পরিমাণে নেমে যায়। ফলে স্থল ব্রিজের সৃষ্টি হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। আর স্থল ব্রিজগুলোর মাধ্যমে চলাচলের দ্বারা জীবের বিস্তারণ সম্ভব হয়েছিল। প্রধান স্থল ব্রিজগুলো হচ্ছে—(১) বেরিং প্রণালী, (২) মধ্য আমেরিকা, (৩) ভূমধ্যসাগরীয় এবং (৪) ইন্দোনেশীয় স্থল ব্রিজ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমুদ্রতলের গঠন এবং স্তর কাঠামোর উপরে পরিচালিত বর্তমানের গবেষণার ফলাফল মতবাদটি পূর্ববর্তী অসংখ্য স্থল ব্রিজের অস্তিত্ব নির্দেশ করে না।

২.৪.১. বিস্তারণ : জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তারণ (ক) অবিচ্ছিন্ন এবং (খ) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। এই দুই ধরনের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ এলাকা হতে ক্ষুদ্র এলাকার মিশ্রক্রমের বিস্তারণও লক্ষণীয়। জীবের নির্দিষ্ট গোত্রের পৃথিবী পৃষ্ঠে বিস্তারণের ব্যাপক পার্থক্য প্রকাশ পায়। Primulaceae গোষ্ঠী এবং এর Palmae গোত্রের উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর বিস্তারণ পৃথিবী ভিত্তিক। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোত্রটির (প্রথম গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) বিস্তারণ সম্পূর্ণভাবে জলবায়ুর প্রভাবের কারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান (মানচিত্র ২.অ)।

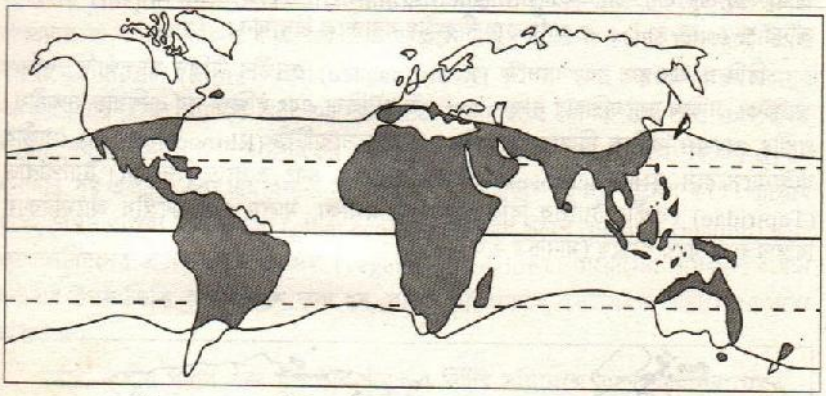

মানচিত্র ২. অ. অবিচ্ছিন্ন বিস্তারণ (বিজ্ঞানী গুড-এর মত অনুযায়ী)
■ তালজাতীয় উদ্ভিদ গোত্র।

ট্রোপেওলেসি (Tropaeolaceae) গোষ্ঠীর বিস্তারণ অবিচ্ছিন্ন হলেও এই গোষ্ঠী শুধু ল্যাটিন আমেরিকায় স্থানীয়ভাবে (endemic) বিদ্যমান (মানচিত্র ২.আ)। প্রাণীর ক্ষেত্রেও

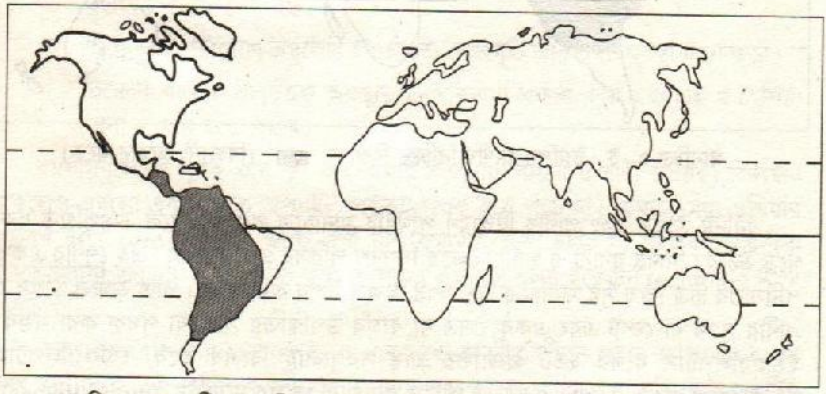

মানচিত্র ২.আ. সীমাবদ্ধ বিস্তারণ ■ ট্রোপেওলেসি (বিজ্ঞানী গুড-এর মত অনুযায়ী)।

অনুরূপ বিস্তারণ লক্ষণীয়। স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে ইঁদুর ও বাদুড়ের বিস্তারণ সমগ্র পৃথিবী ভিত্তিক। অন্যদিকে অনেক প্রাণী গোষ্ঠীর বিস্তারণ সীমিত অঞ্চলে বিদ্যমান। কার্প (carp) অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও এই গোষ্ঠী অস্ট্রেলিয়া, মালাগাছি, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আলাস্কায় বিদ্যমান নয়। জিরাফিডি (Giraffidae—the giraffe and the okapi), আন্টিলোকাপ্রিডি (Antilocapridae—Pronghorns) এবং পোটামোগ্যালিডি (Potamogalidae—otter shrews) গোষ্ঠীগুলো কেবল কোনো এক মহাদেশ বা মহাদেশের অংশে বিদ্যমান। জিরাফ এবং ওকাপি (Giraffe and ocapi) কেবল সাহারার দক্ষিণে ও আফ্রিকায় বিদ্যমান। প্রোঙ্গহর্ন (Pronghorns) উত্তর আমেরিকার উপর পশ্চিম প্রেইরি এবং অটার শ্রু (otter shrews) আফ্রিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে বিদ্যমান।

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেচসানেকে (Restionacaca) গোষ্ঠীর উদ্ভিদ মালাগাছি, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লক্ষণীয়। প্রাণীর ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন বিস্তারণ লক্ষণীয়। রাইনোসেরোটিডি (Rhinoccrotidae) গোষ্ঠীর রাইনোসেরোস (Rhinoceroses) কেবল আফ্রিকা এবং ভারতে বিদ্যমান। ট্যাপিরিডি (Tapiridae) গোষ্ঠীর ট্যাপির বিচ্ছিন্ন ব্যাপক এলাকা, মালয় এবং ক্রান্তীয় আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে রয়েছে (মানচিত্র ২.ই)।

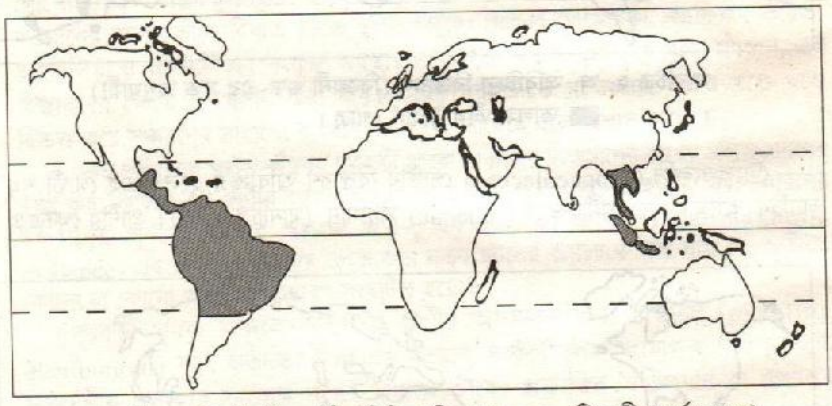

মানচিত্র ২. ই. ট্যাপির প্রাণীর বিচ্ছিন্ন বিস্তারণ ▬ (বিজ্ঞানী জর্জের মতে)

নির্দিষ্ট উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিস্তারণ পৃথিবীর মানচিত্রে প্রকাশ করলে ক্রমপুঞ্জিত ধরন গড়ে উঠবে। নির্দিষ্ট বনানী ও প্রাণীর ক্ষেত্রে বিসদৃশ পরিসর প্রকাশ পাবে। এই শ্রেণীর একক পরিসরের চিত্র দিয়ে সৃষ্ট মানচিত্রে মিশ্র স্পষ্ট অঞ্চল নির্ণয় করা সম্ভব। প্রতি অঞ্চল উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্ঘ বা জোট এবং একক গোত্র বা বর্গের উপস্থিতির সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। ইউক্যালিপটাস বর্গের ২৩০ প্রজাতির প্রায় সবগুলোই বিশেষ করে, ইউক্যালিপটাস অস্ট্রেলিয়ার দেশজ উদ্ভিদ। এ ছাড়াও প্রাচীন স্তন্যপায়ী গ্রুপের মনোট্রিম (monostremes)

ও প্রায় সকল মারসুপিয়াল (marsupials) এই মহাদেশে একচ্ছত্রভাবে বিদ্যমান। অনেক প্রকার পাখি কেবল এখানে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াতেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়াকে এক স্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। জীবভূগোলবিদগণ বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীকে প্রধান প্রধান উদ্ভিদ এবং প্রাণী অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন।

২.৪.২. বায়োম (Biome) : বায়োম বা প্রাণমণ্ডল (biotic region) হচ্ছে প্রধান ভূমিজ জীব সম্প্রদায় (major terrestrial community) ভুক্ত এলাকা। এটা এক বৃহত্তম স্থলজ সম্প্রদায় যা সহজে চিহ্নিত করা যায়। এই অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই বিদ্যমান। প্রতি বায়োমের বায়োটা (biota) অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন হচ্ছে আঞ্চলিক জলবায়ুর আন্তঃক্রিয়ার ফসল। ব্যাপক এবং মৌলিক অর্থে বায়োম হচ্ছে দৈনিক ও ঋতুভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাপের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের সমন্বয়ে নির্ধারিত জলবায়ুর সাহায্যে বিশেষ শ্রেণীর বনানীর সৃষ্ট এলাকা এবং এই বনানী সাহায্যে প্রাণীর সমাবেশ অঞ্চল নির্দেশ করে। বায়োম হচ্ছে উদ্ভিদ বাস্তব্য বিজ্ঞানীদের (plant ecologist) উদ্ভিদ গঠনে (plant formation) এবং ভূগোলবিদদের প্রধান বনানী অঞ্চল (vegetation region)। বায়োমের নামকরণ প্রধান বনানীর উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়, যদিও এই অঞ্চলে বসবাসরত প্রাণীও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

তাপ, জলীয় পদার্থ এবং মৃত্তিকার অবস্থার নির্দিষ্ট সন্নিবেশে বিশেষ ধরনের যেমন— অরণ্য, তৃণভূমি অথবা মরু বনানী সৃষ্টির মনে হয়, কৌশল বিদ্যমান। যে কোনো শ্রেণীর বনানীর উদ্ভব হোক না কেন সেই শ্রেণীর বনানী স্ব-বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর সমাবেশ ঘটায়। বর্তমানে বায়োম চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে ; যেমন—

ক. বায়োমে স্ব বৈশিষ্ট্যসূচক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিদ্যমান থাকে।

খ. সকল বায়োম ক্রমবর্ধন পর্যায়ের সিরিজ (successional series) অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গ. আঞ্চলিক পরিবেশে এগুলোর প্রত্যেকটি মোটামুটি ভারসাম্য অবস্থা বহন করে।

ঘ. প্রত্যেক বায়োম প্রাকৃতিক অবস্থায় স্ব-ভারসাম্য প্রকাশ করে এবং এই স্ব বৈশিষ্ট্য অন্য বায়োম হতে পৃথক।

বায়োমগুলোতে পৃথক প্রায় পূর্ণ ভারসাম্যের সম্প্রদায় (বনানী ও প্রাণী উভয়ই) বিদ্যমান থাকলেও এগুলো একটি হতে অপরটি স্পষ্টতই পৃথক হয়ে পড়ে না। যেমন—মধ্য এশিয়ার কুঞ্জবন বলয় (grove belt) হচ্ছে এক মিশ্র বৃক্ষময় স্টেপ বলয় যা সরলবর্গীয় বনকে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি হতে পৃথক করে রেখেছে। এই মিশ্র বলয় ইকোটন (ecotone) নামে পরিচিত।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন, যা একদিকে বনানীর জীবন গঠনে প্রতিফলিত হয় এবং অন্যদিকে এই সকল বনানী প্রাণীর জন্য বাসস্থানের কাঠামোও সৃষ্টি করে। এটিই ওডামের মতে, প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানীয় শ্রেণিবিভাগের এক শক্ত ভিত্তি (A sound basis for a natural ecological clssification)। পৃথিবীর বায়োম হচ্ছে :

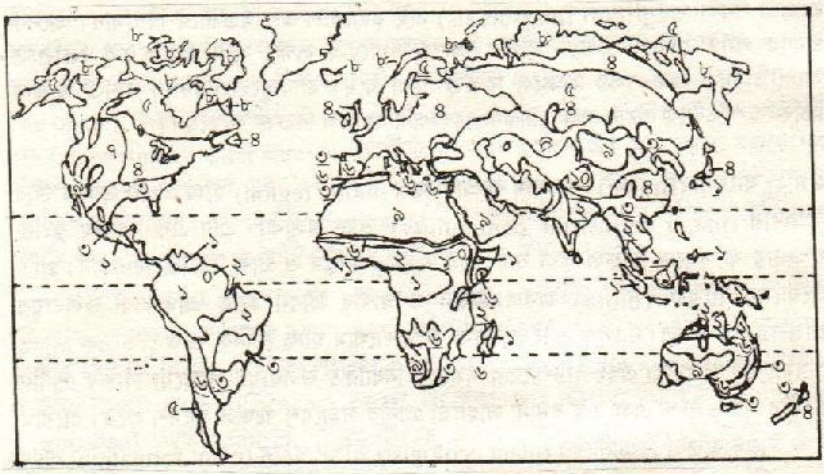

চিত্র ২.৯ : সিমুলেটেড বায়োমের বিস্তারণ (A.M. Mannion, vegetation form Applied Climatology ; Principles and Praclice, Routledge, 1997, pp. 132)।

১. ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য ও ক্রান্তীয় ঋতুভিত্তিক অরণ্য ; ২. ক্রান্তীয় শুষ্ক বন ; ৩. চিরসবুজ বা উষ্ণ মিশ্র বন ; ৪. নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ, মৃদু শীতল মিশ্র, মৃদু শীতল পর্ণমোচী, শীতল মিশ্র, শীতল চিরহরিৎ অরণ্য ;

৫. টায়গা ও উত্তরাংশের টায়গা ; ৬. মরু উদ্ভিদ বা গুল্ম ; ৭. উষ্ণ ও মৃদু শীতল তৃণ বা গুল্ম ; ৮. উদ্ভিদবহুল তুন্দ্রা ও তুন্দ্রা; ৯. উত্তপ্ত মরুভূমি, ১০. মেরু মরুভূমি

বর্ণিত বায়োমগুলো ভূগোলবিদদের অতি পরিচিত প্রাকৃতিক বনানী অঞ্চল। অঞ্চল বিন্যাসের ক্ষেত্রে উত্তর গোলার্ধের তুন্দ্রা এবং নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি, মরু বা ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের বায়োম অসম্বন্ধ বা ধারাবাহিকতাহীন (discrete) বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কারণ এই ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য স্থলভাগের অবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান নয়। এই শ্রেণীর বায়োমগুলো পৃথক মহাদেশে বিদ্যমান থাকার কারণে এগুলোর উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক পার্থক্য প্রকাশ পায় যদিও বাস্তুসংস্থানীয় দিক থেকে এগুলোর মধ্যে তুলনা করা যায়।

অতি সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান প্রধান বায়োম ও মৃত্তিকার মধ্যে সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকলেও সূক্ষ্মভাবে মৃত্তিকা ও বায়োমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মৃত্তিকা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে প্রত্যেকটি স্ববৈশিষ্ট্য বহন করে। বনানী প্রাণীর জীবন রক্ষা করে ও আশ্রয় দেয় এবং উভয়েই আবার মৃত্তিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান রাখে। প্রাণীর বাছাইকৃত বনানীর খাদ্যাভ্যাস বনানীর উপর একদিকে যেমন

প্রভাব রাখে, তেমনি অন্যদিকে এই কার্যক্রম অনেক উদ্ভিদের পরাগায়নে সাহায্য করে। মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বনানীকে প্রভাবিত করে। প্রাণী আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বনানীর উপর নির্ভরশীল।

জীবমণ্ডলে প্রাণের জীবনচক্রের ক্ষেত্রে বনানীর অপরিহার্য অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বনানী মৃত্তিকা গঠন ও প্রাণী প্রতিপালন করে থাকে। এই ক্ষেত্রে মানুষ ছাড়া জীবজন্তুর (fauna) ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম। জীবজন্তুর অবস্থান ও বিস্তারণ প্রধানত খাবারের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল প্রত্যক্ষভাবে তৃণভোজী প্রাণী এবং পরোক্ষভাবে মাংসাশী প্রাণী সংঘ উদ্ভিদ সংঘের সাথে জড়িত। এই আন্তঃসংযোগের ফলে প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বনানী এলাকার নির্দিষ্ট প্রাণী সংঘের সমাবেশ গড়ে ওঠে। তাই উদ্ভিদ রাজ্য বা অঞ্চল (realm) প্রধান প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি এবং কখনও কখনও উদ্ভিদ বর্গ এলাকা এবং প্রাণী রাজ্য বা অঞ্চল বিশেষ শ্রেণীর প্রাণী এলাকা (area possessing their own special fauna) এর মধ্যে স্পষ্ট সহসম্বন্ধ বিদ্যমান। বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে স্পষ্ট জীব-ভৌগোলিক রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—

(১) প্যালিআর্কটিক (Paleartic), (২) নিআর্কটিক (Nearctic), (৩) নিউট্রপিক্যাল (Neotropical), ৪. ইথিওপিয়ান (Ethiopian), (৫) অরিয়েন্টাল (Oriental) এবং (৬) অস্ট্রেলিয়ান (Australian) (মানচিত্র ২,আ) অঞ্চল।

বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষ তার সৃজন প্রতিভার (creative imagination) সাহায্যে তারই খেয়াল খুশি ও প্রয়োজনে পৃথিবীর উদ্ভিদজগত ও প্রাণিজগতকে ধ্বংস, পরিবর্তন এবং উৎকর্ষ সাধন করেছে। অনেক বৃহৎ অঞ্চলের জীবের উপর মানুষের প্রভাব ধীর, কষ্টকর এবং বিরামহীন গতিতে চালিত হয়েছে। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অনেক সময় এই নিশ্চিহ্ন কার্যক্রম কঠোরভাবে সমাধা করা হয়েছে। অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এক বাসভূমি হতে অন্য বাসভূমিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই স্থানান্তরণ অনেক সময় যেমন ভাল ফলাফল বয়ে এনেছে, তেমনি আবার তা অপ্রীতিকর অবস্থারও সৃষ্টি করেছে। এগুলো ছাড়াও বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কিছু কিছু উদ্ভিদবর্গ এবং প্রাণী প্রজাতির এমন রূপান্তর সাধন করেছে যে এগুলো আর কোনো পূর্ব পরিচিত বহন করে না।

২.৫. উদ্ভিদ জীবন

উদ্ভিদ বলতে সাধারণত এককোষবিশিষ্ট অণু আকৃতির উদ্ভিদজাতীয় জীব হতে বনের জটিল বৃহৎ আকারের বৃক্ষকে বোঝায়। অতি পরিচিত লতা, গুল্ম ও গাছ ছাড়াও পানা বা শেওলা, ছাতা (mould), ঈস্ট এবং পানিতে সৃষ্ট চটচটে সবুজ পদার্থসমূহকে উদ্ভিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর ফুল-উৎপাদী উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড, পাতা এবং মুকুল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের দেহে খুব কমই এরূপ অঙ্গ বিদ্যমান।

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণী যেগুলো অতি প্রাচীন দেহ কাঠামো বহন করে সেগুলো উদ্ভিদজগত বা প্রাণিজগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি-না তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। উদাহরণ হিসেবে এককোষী জীবের মধ্যে ইউগ্লেনা (*Euglena*) গণের নির্দিষ্ট একশ্রেণীর জীবকে বর্তমানে প্রাণী বিজ্ঞানীগণ প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আলোতে ইউগ্লেনা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে এবং সবুজ বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু যদি এগুলোকে অন্ধকারে অনেক সময় ধরে রাখা যায় এবং জৈব পদার্থ সরবরাহ করা হয় তাহলে এগুলো প্রাণীর মতো জীবন যাপন করে এবং সবুজ বর্ণ হারিয়ে ফেলে।

উদ্ভিদকে গ্রুপে বিভক্ত করার সহজ পন্থা হচ্ছে বনানীর উৎপাদন ক্ষমতা। ফুল-উৎপাদী উদ্ভিদ (Phanerogamia) এবং ফুল-অনুৎপাদী উদ্ভিদ (Cryptogamia) নামে পরিচিত। প্রথমটি ফুলের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। দ্বিতীয় গ্রুপের উদ্ভিদ ফুল উৎপাদন করে না। এজন্য এই শ্রেণীর উদ্ভিদ বীজ সাহায্যে নয় রেণুর (spore) সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। সবুজ শৈবাল ফার্ন, ছত্রাক এবং শেওলা এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রেণু হচ্ছে সূক্ষ্ম (delicate) কণা, কখনও কখনও এটি এককোষী সূক্ষ্ম কণার কাঠামো নির্দেশ করে। আদর্শ পরিবেশে (conditions suitable) অঙ্কুরোদ্গম না হলে এইগুলো মারা যায়।

অন্যদিকে বীজের কোষী গঠন কাঠামো বিদ্যমান। ফলে এগুলো বহু সময়ব্যাপী উৎপাদনশীল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর বনানী অর্থাৎ বীজ উৎপাদী গাছ বহু সময় টিকে থাকার জন্য সমগ্রাম করতে পারে।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বনানী সহজ সরল অজৈব পদার্থ গ্রহণ করে টিকে থাকে এবং এগুলো হচ্ছে প্রধানত নিষ্ক্রিয় ও অ্যানাবোলিক জীব। উচ্চ শ্রেণীর ফুল-উৎপাদী উদ্ভিদের স্পষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান। যেমন শিকড় গাছকে স্থিতিশীল অবস্থায় খাড়া করে রাখে ও মৃত্তিকার পুষ্টিকর পদার্থের মিশ্রিত পানি শোষণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং কাণ্ড, পাতা, ও বর্ধনশীল অংশ ফুলের ভারবন্ধনের (scaffolding) কাজ করে। অঙ্গ হিসেবে পাতা পত্রহরিতের মাধ্যমে সূর্যের আলোর সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনকে উদ্ভিদের খাদ্য ও শক্তিতে পরিণত করে এবং ফুল খোসার সাহায্যে আবৃত বীজ যা ভ্রূণ উৎপাদন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের শেষে সম্ভবত ২০০/৩০০ কোটি বছর পূর্বে সমুদ্রে জীবনের আবির্ভাব ঘটে। প্রায় ৫৭ কোটি বছর হতে ৫০ কোটি বছর সময়কাল, ক্যামব্রিয়ান যুগে সামুদ্রিক প্রাচীন প্রাণের (marine life) অস্তিত্ব জীবাশ্ম হতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীর প্রাচীন জীব অণু আকৃতির এককোষী জীব হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এই প্রাচীন জীব দুই শাখা, বনানী ও অপরটি প্রাণী হিসেবে ক্রমবিকাশ লাভ করে। এই দুই শ্রেণীর একই পূর্ব পুরুষ বা বংশধর, পৃথকভাবে উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসেবে পরিচিত নয়। পরবর্তীকালে বনানী ও প্রাণী দুই ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করলেও উভয়েই অনেক দিকে সাধারণ সংযোগ রক্ষা করে চলছিল (চিত্র ২.১)।

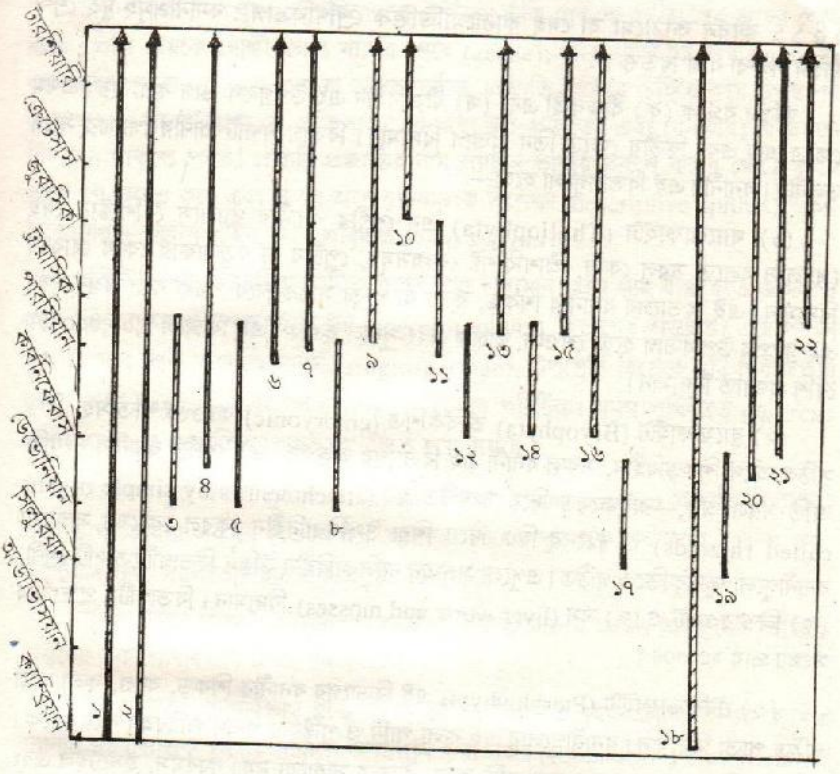

চিত্র ২.১ : বনানীর ক্রমবিকাশ[৮]।

১. ছত্রাক, ২. শৈবাল, ৩. স্ফেনোপুসিড, ৪. পর্ণাঙ্গ, ৫. লেপিডোডেনড্রোন, ৬. হর্সটেল, ৭. সেলাগিনোলড্, ৮. ডরিকোরডেট, ৯. সাইকাড্, ১০. অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, ১১. বেন্নেটাইট, ১২. টেরিডোস্পার্ম, ১৩. মোচাকার/সরলবর্গীয় বৃক্ষ, ১৪. গ্লোসোপটেরিড, ১৫. জিংকো, ১৬. শেওলা, ১৭. সিলোপসিড, ১৮. থ্যালোফাইটা, ১৯. সিলফাইটা, ২০. ব্রায়োফাইটা, ২১. টেরিডোফাইটা, ২২. স্পার্মাটোফাইটা,

২.৫.১. উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ : জীববিজ্ঞানীগণ বনানীর গ্রুপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে (দেহ-কাঠামোর) বাস্তব সম্বন্ধ (real relationships) গ্রহণ করে থাকেন, বনানীর বাহ্যিকরূপ দ্বারা নয়। কারণ বাহ্যিকরূপ অনেকক্ষেত্রে ভুল (deceptive) চিত্র প্রকাশ করে। বাস্তব সম্বন্ধের মধ্যে বনানীর দেহের জটিল কাঠামো এবং পুনরুৎপাদন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত।

৮. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 151

২.৫.১.১ জীবন কাঠামো বা দেহ কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : বনানীসমূহ দুই শ্রেণী উদ্ভিদ সর্গ বা বর্গে বিভক্ত।

উদ্ভিদ বর্গকে (ক) বীজবাহী এবং (খ) বীজবিহীন এই উপগ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন বিভাগ বিদ্যমান। বিভাগ শব্দটি প্রাণীর গোত্রের সাথে তুলনীয়। বনানীর এই বিভাগগুলো হচ্ছে—

(১) থ্যালোফাইটা (Thallophyta) এর শ্রেণীর বনানীর থ্যালাস বৈশিষ্ট্যের দেহ (থ্যালাস বলতে সরল কোষ, আঁশবিশিষ্ট কোষসমূহ, প্লেটীয় বা বর্তুলাকার কোষ বোঝায় বিদ্যমান। এই বিভাগের বনানীর শিকড়, কাণ্ড বা পাতা সঠিকভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। এই গ্রুপের উপবিভাগ হচ্ছে শেওলা, ছত্রাক এবং পুষ্পল ছত্রাক। এই বিভাগে ১,০০,০০০ এর বেশি প্রজাতি বিদ্যমান।

(২) ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) অবিকশিত (embryonic) কাণ্ড ও পাতাসহ, কিন্তু সঠিক অর্থে শিকড়বিহীন, সকল বনানী এই বিভাগের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর বনানীর সংযুক্তি অতি সরল অঙ্গ,—রাইজয়েড দিয়ে সংঘটিত হয় (attachment is by simple organs called rhizoids) ও গঠনের দিক দিয়ে শিরা উপশিরাবিহীন কেবল কোষের সাহায্যে বনানীগুলো ক্ষুদ্রাকৃতিতে গঠিত। এগুলো সংবহন নালিকাবিহীন উদ্ভিদ বিভাগটিতে দুটি শ্রেণী, (ক) লিভারওয়ার্ট ও (খ) মস (liver worts and mosses) বিদ্যমান। বিভাগটির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০।

(৩) টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) এই বিভাগের বনানীর শিকড়, কাণ্ড, কলা দ্বারা গঠিত পাতা বিদ্যমন। বনানীগুলোর এই কলা পানি ও পুষ্টিকর পদার্থ পরিবহন করে থাকে। কিন্তু বনানীগুলো রেণুর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে, বীজের সাহায্যে নয়। ক্লাবমস, হর্সটেইল এবং পূর্ণাঙ্গ (Club mosses, horsetails & ferns) এই বিভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে প্রায় ১০,০০০ আধুনিক ফার্ন, ৬০০ ক্লাবমস এবং প্রায় ২৫টি আধুনিক হর্সটেল উদ্ভিদ বিদ্যমান।

(৪) স্পার্মাটোফাইটা (Spermatophyta) বীজ উৎপাদক সকল উদ্ভিদ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের দুটি যথা—(ক) অনাবৃতবীজী বা জিমনোসপারম (উন্মুক্ত খোসাবিহীন বীজ অর্থাৎ ভ্রূণকোষ ডিম্বাশয় দিয়ে আচ্ছাদিত নয় যথা কনিফার) এবং (খ) আবৃতবীজী (আবরণ বা খোসাসহ বীজ অর্থাৎ পুষ্পবৃক্ষ ডিম্বক আবরণের ভ্রূণ কোষ (Gymnospermae or gymnosperms—Plants with naked seeds i.e. with ovules not enclosed in an ovpery e.g. Conifers and Angiospermae or Angiosperms. Plants with enclosed seeds i.e. flowering plants with enclosed ovules)[৯] শ্রেণীতে বিভক্ত। অ্যানজিস্পার্মের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০ এবং অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬০০ বিদ্যমান।

৯. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 153

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ বৃহৎ শ্রেণিবিভাগকে শ্রেণীতে, প্রতি শ্রেণীকে বর্গ বা ক্রম নামের শেষে ales ; প্রতি ক্রমকে গোষ্ঠী/গোত্র নামের শেষে (aceae), প্রতি গোষ্ঠীকে গণে (genera) এবং প্রতি গণকে (genus) এক বা অধিক সদস্য, প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে উপস্থাপন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতি প্রজাতির মধ্যে উপ-প্রজাতির এবং (বনানীর) বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকতে পারে। প্রতিটি প্রজাতির নাম ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রথম অংশ গণ নির্দেশ করে এবং অপর অংশ বর্ণনামূলক বিশেষণ (descriptive epithet) উদ্ধৃত করে। যথা—স্কটস পাইন, নামে পরিচিত *Pinus sylvestris*।

প্রতি উদ্ভিদের উদ্ভিদবিদ্যাভিত্তিক বংশবৃত্তান্ত বিদ্যমান। ওক গাছ বীজ হতে জন্মলাভ করে। এজন্য গাছটি স্পার্মাটোফাইটা (spermotophyta) বিভাগের অন্তর্গত। এটা পুষ্পল গাছ হিসেবে শ্রেণী অ্যানজিস্পার্মে (Angiospermae), উপশ্রেণি হিসেবে এটি দ্বিবীজপত্রী বর্গের গোত্র Fagacae এবং গণ *Quercus* হিসেবে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবীতে *Quercus* গণের প্রায় ২০৫ প্রজাতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

ইউরোপে দুটি প্রধান, *Quercus robur* এবং *Quercus petraca* প্রজাতি বিদ্যমান। প্রজাতিকে আবার প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষের দুই প্রকারের মধ্যে ইংলিশ ওক, অস্ট্রিয়ান ওক, স্যালভোনিয়ান ওক প্রভৃতি বিদ্যমান।

ড্যানিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রউনকিয়ার বনানীর পুনরুৎপাদনের অঙ্গের অবস্থানের ভিত্তিতে উদ্ভিদের এক শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করেছেন।

রউনকিয়ারের শ্রেণিবিভাগ হতে জীবন চক্রের ভিত্তিতে বৃহৎ এলাকাভিত্তিক ভূমিজ বনানীর গঠনভিত্তিক গ্রুপের সারাংশ উপস্থাপন করা সম্ভব (Raunkiaer's classification allows us to sum up the composition of vegetation according to broad groups of life forms of terrestrial plants)।[১০] বিভিন্ন প্রজাতির অবস্থা বা পরিবেশে ভূ-উদ্ভিদ অভিযোজিত হয়ে থাকে।

শ্রেণিবিভাগটিতে বিরূপ অবস্থায় জলীয় পদার্থ এবং তাপে কিভাবে বহুল সংখ্যায় উদ্ভিদের অভিযোজন সংঘটিত হয় রউনকিয়ার তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

রউনকিয়ারের বনানীর এই শ্রেণী ক্রিয়ামূলক শ্রেণিবিন্যাসের সূত্রভিত্তিক ক্রম নয়। তাই ভূগোলবিদগণ এই শ্রেণিবিন্যাস হতে বনানীর গঠন এবং বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বনানীর পরিবর্তন বা গঠনভিত্তিক তুলনার চিত্র প্রকাশ করতে পারেন।

রউনকিয়ার বনানীর পুনরারম্ভ কোরক (renewal bud) অবস্থান বা পুনরুজ্জীবিত অঙ্গ (regenerating organs) এবং শীত বা শুষ্ক সময়কালে এগুলোর সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বনানীর প্রাথমিক ছয় শ্রেণী উপস্থাপন করেছেন (চিত্র ২.২)।

১০. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 154

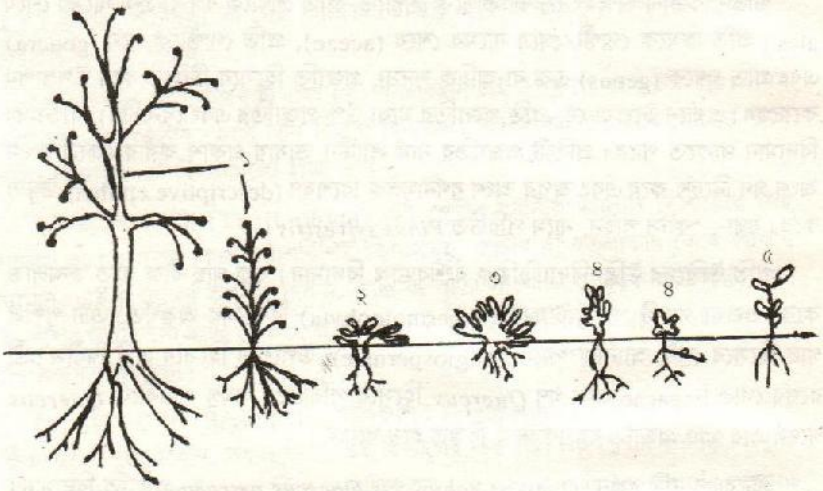

চিত্র ২.২ : রউনকিয়ারের (বনানী) জীবনচক্র। ১. ফ্যানেরোফাইটা, ২. চ্যামেফাইটা, ৩. হেমিক্রিপটোফাইটা, ৪. জিওফাইটা, ৫. থেরোফাইটা

(১) ফ্যানেরোফাইট (Phanerophytes)—হচ্ছে জঙ্গলময় ও বায়বীয় আচরণ বিশিষ্ট বহু বর্ষজীবী গাছ এবং গুল্ম যেগুলোর পুনরারম্ভ কোরক (regerating bud) ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানের কিশলয় (upright shoots) উন্মুক্ত অবস্থায় শৈত্য, শুষ্কতা ও বায়ু প্রবাহের আওতায় পড়ে এই গ্রুপের উদ্ভিদ গাছ, গুল্ম, রসালো কাণ্ডবিশিষ্ট বনানী, লতাপাতাজাতীয় কাণ্ডের বনানী এবং দ্রাক্ষালতা ও আঙ্গুর গাছবিশিষ্ট (এই পাঁচটি) উদ্ভিদ গ্রুপে বিভক্ত। নাতিশীতোষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের বনানী সাধারণত এই গ্রুপের অন্তর্গত।

(২) চ্যামেফাইট (Chamaephytes)—বহুবর্ষজীবী লতাজাতীয় উদ্ভিদ এবং কাঠজাতীয় স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর পুনরারম্ভ মুকুল ভূমি পৃষ্ঠ এবং মৃত্তিকার ঊর্ধ্বে ১০"-এর মধ্যে প্রকাশ পায়। থাইম ও লিং (thyme and ling) এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চ্যামেফাইট তুন্দ্রা ও উপশুষ্ক অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। শীতকালীন অতি নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাবের বিরূপ ফলাফল হতে চ্যামেফাইট বরফ আস্তরণের মাধ্যমে রক্ষা পায়।

৩) হেমিক্রিপটোফাইট (Hemicryptophytes) শক্ত ডাটাহীন লতা এবং ঘাস যেমন—বিছুটি, পলিয়ানথাস পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ) এবং টাসক নল খাগড়ায় গুচ্ছ বিশেষ পুষ্পসঙ্কর এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বর্ধনশীল বা বাড়ন্ত ঋতুর শেষে এগুলো মৃত্তিকার উপরে মৃত্যুবরণ করে। এই বনানীগুলোর (পুনরারম্ভ) কোরক মৃত্তিকা পৃষ্ঠের উপরে বা ঠিক নিচে অবস্থান করে। শীতল আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে এই বনানীগুলো জন্মে থাকে।

৪) জিওফাইট (Geophytes)—এই উদ্ভিদগুলো ক্রিপটোফাইট নামেও পরিচিত। শৈত বা শুষ্কতার কারণে উদ্ভিদগুলো মৃত্তিকা স্তরের নিচে মৃত্যুবরণ করে।

উদ্ভিদগুলোর কন্দ, গোলাকার স্ফীতি বা স্থূল আনুভূমিক কাণ্ড বিদ্যমান এবং উদ্ভিদগুলোর অঙ্কুর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করে। ফলে এগুলো তুষার, উচ্চ তাপমাত্রা, বা শুষ্কবায়ু প্রবাহের ক্ষতিকারক ফলাফল হতে রক্ষা পায়। হায়াসিনথ (লিলিজাতীয় পুষ্পলতা বিশেষ) এবং ইরিছ (পুষ্প বৃক্ষবিশেষ) (Hyacinths and iris) এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৫) থেরোফাইট (Therophytes)। এই শ্রেণীর বর্ষজীবী উদ্ভিদ একক বাড়ন্ত ঋতুর মধ্যে জীবন চক্র পূর্ণ করে। উপযুক্ত ঋতু আগমনের পূর্বের প্রতিকূল অবস্থা যেমন শৈত্য বা শুষ্কতায় উদ্ভিদগুলোর উৎপাদিত স্পোর বা রেণু অসক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ক্ষণজীবী এই শ্রেণীর উদ্ভিদ মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

৬) এপিফাইট (Epiphytes)। এই শ্রেণীর বনানী ভূমির সংস্পর্শ থেকে উর্ধ্বে অবস্থান করে। এগুলো বায়বীয় উদ্ভিদ নামেও পরিচিত। এই শ্রেণীর বনানীর শিকড় মৃত্তিকার সাথে সংযুক্ত থাকে না বরং অন্য বনানীর উপর এগুলো বর্ধিত হয়।

বনানীগুলোর কাণ্ড ও শাখা সালোকসংশ্লেষণের জন্য সূর্যের আলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উর্ধ্বে উত্থিত হয়।

বর্ণিত ছয় শ্রেণী ছাড়াও বনানীর আরও গ্রুপ বা উপগ্রুপ যেমন—জলজ উদ্ভিদ এ বিভক্ত করা যায়। কিন্তু অনেক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এগুলোকে জিওফাইট গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ স্থলভাগে যেমন—মৃত্তিকা বনানীগুলোকে রক্ষা করে তেমনি এই ক্ষেত্রে পানি অনুরূপভাবে বনানীকে রক্ষা করে। রউনকিয়ারের উদ্ভিদ কাণ্ডের রসালো (stem succulents) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলো ফ্যানেরোফাইট অথবা চ্যামেফাইট শ্রেণীর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২.৬. উদ্ভিদ-জীবন-স্পেকট্রাম

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এই বনানী শ্রেণীগুলোর জীবন গঠনের শতকরা হার রউনকিয়ার নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে ফ্যানেরোফাইট আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে হেমিক্রিপটোফাইট, এবং শুষ্ক অঞ্চলে থেরোফাইট এর প্রাধান্য বিদ্যমান।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উদ্ভিদ জীবন গঠনের নির্ণীত শতকরা হারকে তিনি জীব বৈজ্ঞানিক বর্ণালী (biolsgical spectrum) নামে অভিহিত করেছেন (চিত্র ২.৩)। বিজ্ঞানী ওডাম এর মন্তব্য এই ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা যায়।

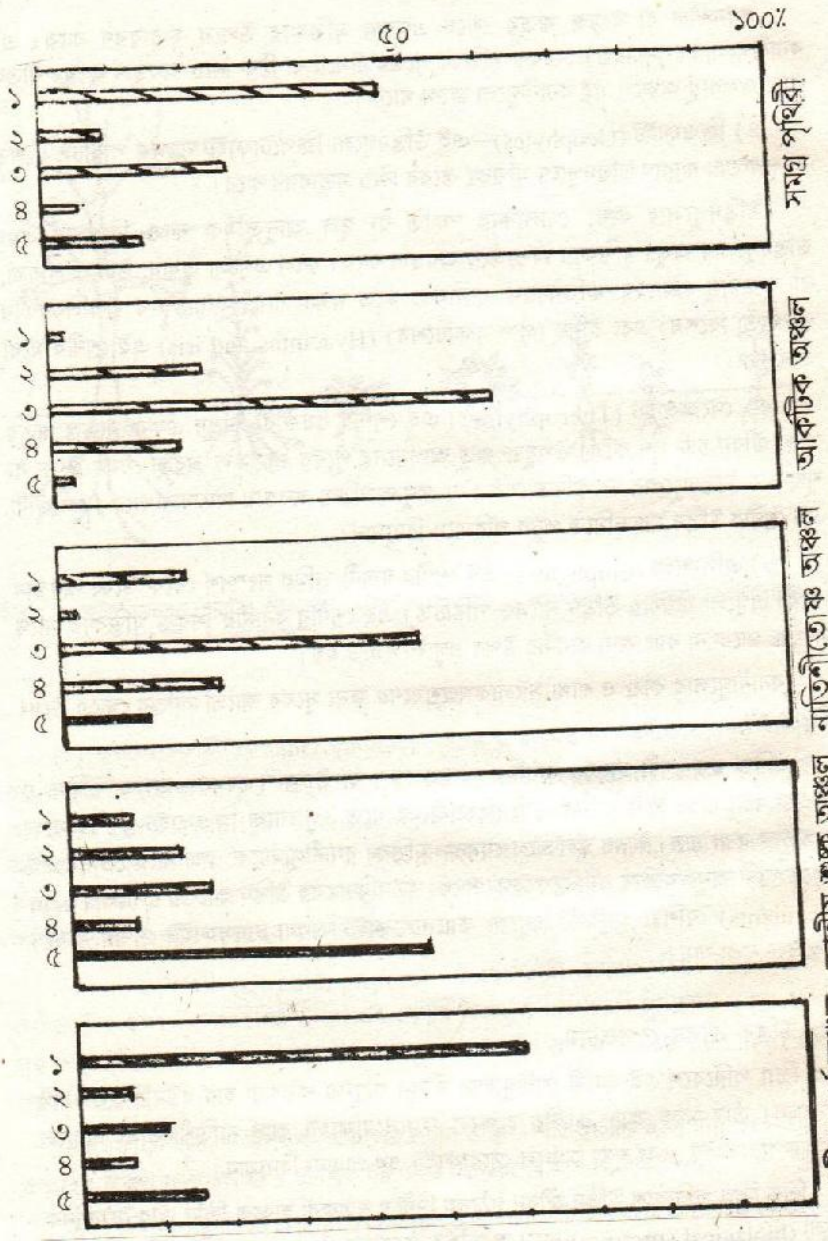

চিত্র ২.৩ : আঞ্চলিক 'স্পেকট্রাম'। ১. ফ্যানেরোফাইট, ২. চ্যামেফাইট, ৩. হোমক্রিপটোফাইট, ৪. জিওফাইট, ৫. থেরোফাইট।

রউনকিয়ারের জীবন গঠন স্পেকট্রাম বাস্তুসংস্থানীয় বর্ণনার এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এই ক্ষেত্রে বনানীর সকল শ্রেণী বা প্রজাতির ওজন পরিমাপ ও সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ হিসেবে মরু অঞ্চলে বনানীর সকল প্রজাতি বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় বনানীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত গুল্মজাতীয় বনানীর (standing crop) মধ্যে মাত্র কয়েকটি শুষ্ক পদার্থের ওজন ও সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বনানী (বনানীর) জীবন গঠন স্পেকট্রাম এবং উদ্ভিদের জীবন গঠন স্পেকট্রাম সকল ক্ষেত্রে এক নয় (In other words, the life form spectrum of the vegetation (communities) and the life form spectrum of the flora are not necessarily the same.)[১১]

২.৭. উদ্ভিদ-সঙ্ঘ এবং অনুক্রম

এমন কিছু উদ্ভিদ যেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়, সেগুলো একই পরিবেশে ক্রমবিকাশ লাভ করে থাকে। যেমন ইংলিশ উডল্যান্ডে বহুল সংখ্যক ওক গাছের সাথে কিছু অ্যাশ বা বীচ গাছ, হোলি ঝাড়, বৈচি ঝোপ, আইভি লতাবিশেষ প্রভৃতি (ash or beech trees, holly bushes, brambles, ivy etc.) লক্ষ্য করা যায়। বনানীর এরূপ গ্রুপ কোনো এলাকার বাসস্থানের প্রাকৃতিক অবস্থায় অভিযোজিত হলে সেই শ্রেণীর বনানীর গ্রুপকে উদ্ভিদ সঙ্ঘ বলা হয়। এই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন বনানীর কেবল প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান নয় বরং জীবন গঠন বা জীবনচক্রের মধ্যেও পার্থক্য (যেমন—গাছ, গুল্ম, শক্ত ডাটাহীন লতা এবং শেওলার ক্রমবিকাশ) বিদ্যমান থাকে। এই পার্থক্য উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের সময় যেমন —গাছ, গুল্ম, লতা এবং শেওলার দেহ বৃদ্ধির সাথে জড়িত।

একই শ্রেণীর গাছের গ্রুপের সমাবেশ না দেখা গেলেও এক বা দুই প্রজাতির বনানীর সমাবেশ বাসস্থানের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমন মৃত্তিকা বা পূর্ব পাক্ষিক আক্রমণাত্মক উদ্ভিদ প্রজাতি (aggressive invaders) স্থানীয়ভাবে উপনিবেশের মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এইরূপ ক্ষুদ্র আকারের উদ্ভিদসমূহকে উদ্ভিদ দল নামে পরিচিত। এই ধরনের দলে সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর বনানীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।

উদ্ভিদ প্রাণীর অনুরূপ সচল নয়। তাই অচল উদ্ভিদ সন্নিকটস্থ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় পরিবেশ বা সন্নিকটস্থ এলাকার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আগত সব উদ্ভিদ টিকে থাকতে পারে না। তাই স্থানীয় পরিবেশের তাপ, জলীয় পদার্থ, সূর্যালোক, মৃত্তিকা, পানি নিষ্কাশন প্রভৃতির কারণে স্বল্প সংখ্যক ভিন্নধর্মী উদ্ভিদ কোনো এক সঙ্ঘে বিদ্যমান থাকে। যে সঙ্ঘে মাত্র এক প্রকার গাছ বিদ্যমান থাকে সেই উদ্ভিদ সঙ্ঘকে প্রকট প্রকৃতির উদ্ভিদ বলা হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ আবরণে সময়ভিত্তিক ক্রমশ পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্রে এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন, যেমন জলবায়ু বা পানি নিষ্কাশন অবস্থা বা আদি বনানীর অপসারণ (আগুন বা মানুষের কার্যক্রম) জড়িত। ফলে এলাকাটিতে অনুক্রমিত উদ্ভিদ সম্প্রদায় গড়ে উঠে। উদ্ভিদ আবরণের এই ক্রমবিকাশকে আমেরিকান জীব বিজ্ঞানী এফ.ই. ক্লিমেন্টস উদ্ভিদ অনুক্রমন (plant succession) নামে অভিহিত করেছেন। কোনো উদ্ভিদ সঙ্ঘের এই ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়কে বনানীর চূড়ান্ত বা পরিপূর্ণ পর্যায় বা প্ল্যান্ট ক্লাইম্যাক্স

১১. Robinson, H. (1972) : Biogeofrnphy, p. 157

(plant climax) বলে। এই পর্যায়ের অর্থ হচ্ছে বনানী দীর্ঘ সময়ে এক স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেছে এবং উদ্ভিদের পরিবেশে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করছে অর্থাৎ উদ্ভিদ নিজ স্থায়িত্বে পৌঁছেছে (self perpetuating)। এই স্থিতিশীল অবস্থা আপেক্ষিক। কারণ স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন সজ্ঘটির গঠনের পরিবর্তন সূচিত করে থাকে।

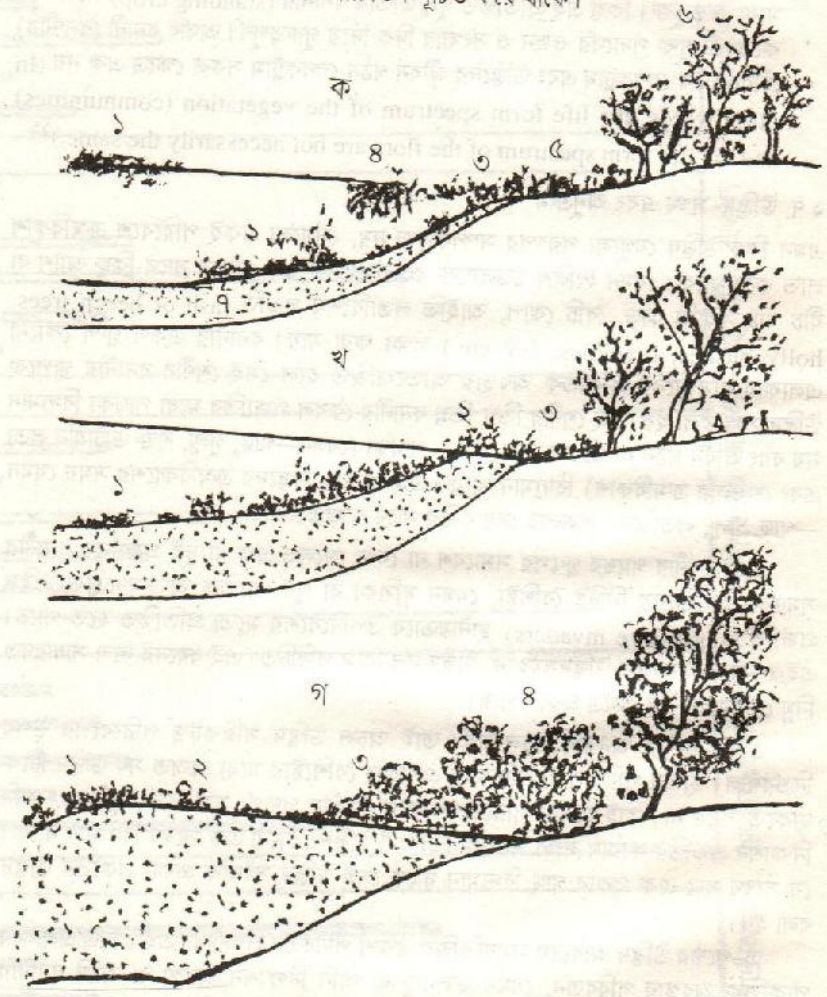

চিত্র ২.৪ হাইড্রোসেরির পর্যায়।

ক–১. ভাসন্ত বনানী, ২. ডুবন্ত জলজ বনানী, ৩. জলা বনানী, ৪. পানি আগাছা, পানি পদ্ম, ৫. নল–খাগড়া, পানি–তৃণ, শর, জৈত্রি, ৬. গাছ, গুল্ম, ৭. তলানি ও বনানী অবশেষ।

খ–১. ডুবন্ত পানি উদ্ভিদ, ২. পানি উদ্ভিদ, ৩. পানি–তৃণ, মিডো।

গ–১. পানি–উদ্ভিদ, ২. পানি–তৃণ–মিডো, ৩. গুল্ম, ৪. উইলো অ্যালডার।

আদি বনানী আবরণ আগুন বা অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে ধ্বংস হওয়ার পর যে উদ্ভিদ অনুক্রম শুরু হয় তা সেকেন্ডারি অনুক্রমণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে যখন আবরণবিহীন যেমন সমুদ্র হতে উত্থিত স্থলভাগ বা বরফ আবরণ মুক্ত নতুন স্থলভাগে বনানীর যে অনুক্রম সংঘটিত হয় সেই অনুক্রমণ হচ্ছে প্রাথমিক অনুক্রমণ।

ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ সঙ্ঘের সিরিজসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবেশের (এই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, জলবায়ু বিষয়ক এবং জীবজ অর্থ বহন করে) সাথে বনানী ভারসাম্যে পৌঁছে। এই পরিবর্তন ধারার প্রতি অস্থায়ী বনানী সম্প্রদায় (transient communities) অনুক্রমের অংশ হিসেবে উদ্ভিদ ক্লাইমেক্স পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই পর্যায়কে সেরি বা সেরাল সম্প্রদায় (Sere or seral community) বলা হয় (চিত্র ২.৪)। ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম পর্যায় হতে ক্রমশ সমগ্র সম্প্রদায়ের চরম পর্যায়ের উন্নীত অবস্থাকে প্রিসেরি (preseri) বলা হয়। বনানীর পরিপূর্ণ বা চরম পর্যায়ে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাঁধাপ্রাপ্তির ফলে পরিবর্তনশীল নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ বহু সময়ব্যাপী বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে সাব-ক্লাইমেক্স পর্যায়ের উদ্ভিদ নাম ব্যবহৃত হয়। বাঁধাপ্রাপ্তির নিয়ামকগুলো হচ্ছে স্থানীয় মৃত্তিকার অবস্থা, চারণশীল প্রাণীর উপস্থিতি এবং নিয়মিত উদ্ভিদ পোড়ানো (habit of firing vegetation)। উত্তর ইউরোপের লুনেবার্গ হিথ (Luneburg heath) উপ-চরম-পর্যায়ের উদ্ভিদ বা সাব-ক্লাইমাক্স ভেজিটেশনের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই এলাকায় হিমবাহিক ও নদী হিমবাহিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বালিময়, সচ্ছিদ্র এবং অম্ল মৃত্তিকা বিদ্যমান। ফলে সরল বর্গীয় গাছসহ-এর বিলুপ্ত গুল্মের প্রাধান্য এলাকাটিতে বিদ্যমান ছিল। হিমবাহিক পরবর্তী সময়ে (post glacial times) এই উপ-চরম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বনানী পরিষ্কার করে মেষ চারণ এবং সাময়িকভাবে পোড়ানোর (perodic burning) মাধ্যমে পরবর্তী উদ্ভিদকে মানুষ রক্ষা করে চলেছে। এই শ্রেণীর স্থিতিশীল উদ্ভিদ সম্প্রদায়, যেগুলো মানুষের হস্তক্ষেপ বা গৃহপালিত পশুর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত, সেগুলো প্ল্যাজিও ক্লাইমাক্স (plagio climax) বা আমেরিকান শব্দ ডিসক্লাইমাক্স (Disclimax disturbance climax) নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে সেই এলাকাটির জন্য জলবায়ু চরম পর্যায়ের নয়।

ক্লিমেন্টস-এর এই চরম পর্যায়ের উদ্ভিদ-মতবাদে বনানীর স্বস্থায়িত্ব (self perpetuating) অবস্থা এলাকাটির জলবায়ুর প্রাধান্য নির্দেশ করে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী ট্যানসলি (Tansley) তাঁর মত উপস্থাপন করেন যে, জলবায়ুর অত্যধিক গুরুত্বের পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন এলাকার মৃত্তিকা, ঢাল, আলো প্রাপ্তি ও আবরণমুক্ত অবস্থা (exposure) এবং মানুষ ও প্রাণীর প্রভাব বা কার্যক্রম জলবায়ুর সাহায্যে প্রভাবিত চরম পর্যায়ের উন্নীত অবস্থাকে ব্যাহত করে। তাই তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, এটা ধারণা করা অবাস্তব এবং অনিশ্চিত যে একই জলবায়ু অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় উদ্ভিদ সম্প্রদায় সমরূপ চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হবে। এই মতবাদ হচ্ছে বনানীর একক চূড়ান্ত পর্যায় তত্ত্বের (mono-climax theory) পরিবর্তে বহু চূড়ান্ত পর্যায় তত্ত্ব (poly climax theory)। মহাদেশীয় এলাকায় উদ্ভিদসঙ্ঘ উদ্ভিদ এলাকার (plant formations) গ্রুপ গড়ে তোলে। পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় ইউরোপে ওক অরণ্য, বিচ অরণ্য এবং সম প্রকৃতির অরণ্য বিদ্যমান। প্রতি অরণ্য বনানীর প্রধান প্রজাতির মাধ্যমে সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে। সকল সঙ্ঘের বনানী এক সাধারণ পাতাঝরা বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই এগুলো একত্রে উদ্ভিদ ফরমেশন নামে পরিচিত।

পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় ইউরোপের উদ্ভিদ ফরমেশনের অনুরূপ ফরমেশন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান। তাই সমগ্র পৃথিবীর পাতাঝরা উদ্ভিদ ফরমেশন একত্রে প্ল্যান্ট ফরমেশন টাইপ সৃষ্টি করে। ভূগোলবিদগণ একে বনানী টাইপ (vegetation type) নামে অভিহিত করেন। বনানীর সংঘ, ফরমেশন এবং ফরমেশন টাইপের ক্রমোচ্চমানের চিত্র সারণি ২. ঘ এ উপস্থাপিত হলো :

সারণি ২.ঘ : ফরমেশনের ক্রমোচ্চমান (Formation heirarchy, After Eyre)

ফরমেশন টাইপ (formation type)	পাতাঝরা গ্রীষ্মকালীন অরণ্য (Deciduous summer forest)		
ফরমেশন (formation)	উত্তর আমেরিকান পাতাঝরা গ্রীষ্মকালীন অরণ্য (N. American D.S.F)	পশ্চিম ইউরোপীয় পাতাঝরা গ্রীষ্মকালীন অরণ্য (W. European D.S.F)	পূর্ব এশীয় পাতাঝরা গ্রীষ্মকালীন অরণ্য (E. Asiam D.S.F.)
অ্যাসোসিয়েশন (association)	বীচ অরণ্য ফেগান সিলভ্যাটিকার প্রাধান্য (Beech forest dominanted by *Fagus sylvatica*)	নিম্নভূমির ওক অরণ্য কুয়ার্কাস রবুর এর প্রাধান্য (Lowland Oak forest dominanted by *Quercus robur*)	অ্যাশ অরণ্য ফ্র্যাকসিনাস এক্সেলসিওরের প্রাধান্য (Ash forest dominated by *Fraxinus excelaior*)

উৎস : H. Robinson (1972) : Biogeography ; Mcdonald & Evans Ltd. pp.162.

পৃথিবীর জলবায়ু বিষয়ক চরম পর্যায়ের সকল শ্রেণীর বনানীকে (climatic climax vegetaion) অরণ্য, তৃণভূমি বা গুল্মভূমি ইত্যাদি বর্ণিত ভাগ এবং উপভাগে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির উদ্ধৃতি দেয়া যায়। এই অঞ্চলগুলোর জলবায়ু বিষয়ক সমরূপ বনানী চরম পর্যায় হচ্ছে তৃণ। কিন্তু এই ফরমেশনে রয়েছে ইউরেশিয়ার স্তেপ, উত্তর আমেরিকার প্রেইরি এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পা। ভিন্ন ভিন্ন ফরমেশন এলাকার অংশ বিশেষে নির্দিষ্ট প্রকার বনানীর অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠে।

বনানীর চূড়ান্ত পর্যায় তত্ত্বটির প্রকৃতি হচ্ছে সম্ভাবনাময়, বাস্তব নয়। বিজ্ঞানী নেইল বলেন যে, এটা কখনও কখনও অনুকল্পিত সারাংশ (hypothetical) ছাড়া আর কিছুই নয়। বাধা বিপত্তি বা দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুন এবং মানুষের কার্যক্রম উদ্ভিদ অনুক্রমকে বাধা প্রদান, থামাতে বা প্রতিহত করতে পারে।

২.৮. পরিবেশগত মাত্রা (Environmental dimension)

ভূগোলের নতুন শাখা হিসেবে জীব-ভৌগোলিক শব্দ তালিকা বা বর্ণনানুক্রমিক শব্দসূচি গড়ে উঠেনি। হেটনারের পর ড্যানসেরু আংশিকভাবে সহজ, স্পষ্ট এবং প্রয়োজনীয় জীবভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করেছেন। তিনি (ক) হলোসিনোটিক (Holocenotic অর্থাৎ শেষ ভূতাত্ত্বিক যুগ) প্রকৃতির পরিবেশ এবং (খ) গ্রহণযোগ্য বাসভূমির সংজ্ঞার ক্রমের বিস্তৃতির পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক স্কিম

উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞানী ড্যানসেরুর মতে, জীবজগতের শ্রেণিবিভাগ হচ্ছে এক ক্রম নিম্নমানের পরিবেশগত ইউনিট স্কেলের স্কিম। জীবজগতকে তিনি লবণাক্ত পানি, মিঠা পানি এবং স্থল–এই তিন জীবচক্রে (biocycles) বিভক্ত করেছেন। এই তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান এবং পরিবেশগুলোতে জীবন গঠনের ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য লক্ষণীয়। স্থল পরিবেশ বা স্থল জীবনচক্র (land biocycle) চার জীব কোরে বিভক্ত–মরুভূমি, তৃণভূমি, স্যাভানা এবং অরণ্য। এই বৃহৎ চার জীবকোরের জলবায়ু বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যভাবে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, মুখ্য জীবন গঠন জলবায়ুর কিছু অবস্থা আলো, তাপ এবং সর্বোপরি জলীয় পদার্থের দ্বারা অভিযোজিত হয়। সুতরাং বনানীর প্রকারভেদে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে মরু জীবকোর, তৃণভূমি জীবকোর, স্যাভানা জীবকোর এবং অরণ্য জীবকোর বিদ্যমান। প্রতি জীবকোরে এক বা অধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বনানীর ইউনিট বিদ্যমান থাকে। এগুলো উদ্ভিদের সামষ্টিক ফরমেশন নামে পরিচিত। যেমন উত্তর আমেরিকার অরণ্য জীবকোরে চার—(ক) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য (খ) নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টিবহুল অরণ্য (গ) নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা বা পর্ণমোচী অরণ্য এবং (ঘ) সরল বর্গীয় অরণ্যে বিভক্ত। এই চার শ্রেণীর উদ্ভিদ ফরমেশন প্রত্যেকটিতে চরম পর্যায় এলাকা (climax areas) ভিত্তিক পৃথক বনানী সংঘ (vegetational associations) প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় সমরূপ জলবায়ু এলাকার বন্ধুরতা এবং মৃত্তিকার পার্থক্যের জন্য এই সকল পৃথক উদ্ভিদ সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বনের প্রধান গঠন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যে সাধারণভাবে সাদৃশ্য (homogeniety) থাকলেও উদ্ভিদ–চরমপর্যায় এলাকার পুষ্প উৎপাদী গঠনের বৈশিষ্ট্যের (fluristic composition) মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। ই আই ব্রাউন (E.I. Brown) উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা বনের বনানী–ফরমেশনের পৃথক (discrete) নয়টি বনানী সঙ্ঘ বনানী যথা— (ক) মিশ্র মেসোফাইট (খ) পশ্চিম অঞ্চলীয় মেসোফাইট (Western mesophyte) (গ) ওক হিকরি (oak hickory) (ঘ) ওক চেস্টনাট (oak chestnut) (ঙ) ওক পাইন (oak pine) (চ) দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চলীয় চিরসবুজ উদ্ভিদ (south eastern evergreen) (ছ) বিচ মেপল (beech maple), (জ) মেপল বাসউড (maple bass wood) এবং (ঝ) হেমলক–হোয়াইট পাইন উত্তরাঞ্চলীয় হার্ডউড (hemlock white pine-northern hardwoods) এ বিভক্ত করেছেন।

চূড়ান্ত পর্যায় এলাকার সকল অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ের বনানী দখল করে থাকে না। কারণ অঞ্চলটির বন্ধুরতা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যতিক্রম বনানী বাসস্থান ব্যতিক্রমের বৈশিষ্ট্য এই ক্ষেত্রে জড়িত। সরল বর্গীয় অরণ্যের উদাহরণ এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়—উত্তম পানি নিষ্কাশন বিশিষ্ট উচ্চভূমিতে সূঁচাকার পত্রবিশিষ্ট চিরহরিৎ গাছ, কিন্তু আর্দ্র নিম্নভূমিতে অন্যান্য গাছ বিদ্যমান। একই বনানী ফরমেশন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকে। তাই এই ক্ষেত্রে উপভাগ, সাইমুসিন বা স্তর ও বায়োটপে (symusin or layer and the biotope) ভাগ করা হয়েছে। প্রায় সকল উদ্ভিদ সঙ্ঘে কয়েকটি স্তর নির্ধারণ করা সম্ভব এবং প্রতি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বনানী প্রজাতি বিদ্যমান। বিজ্ঞানী ড্যানসেরু স্প্রুস অরণ্যের চারটি পৃথক বৈশিষ্ট্য যথা— (ক) ভূমি মস (ground moss) এর উর্ধ্বে (খ) বাঞ্চবেরি (bunchberry) পরে (গ) পাহাড়ি অ্যাশ (mountain ash) এবং শেষে (ঘ) স্প্রুস ফার গাছের (spruce fir trees) স্তর বিদ্যমান (চিত্র ২.৪)। বায়োটপই হচ্ছে বনানীর শেষ উপভাগ। প্রতি একক স্তর–সঙ্ঘে বর্ণিত স্প্রুস ফার–এর ভূমি স্তর–সঙ্ঘের অপ্রতুল আয়তনের কারণে তিনটি স্পষ্ট বায়োটপ–পাইরোলা বায়োটপ, সিরকে বায়োটপ এবং

হাইলোকোমিয়াম বায়োটিপ (pyrola biotope, circaea biotope and the hylocomium biotope) বিদ্যমান। এসব নামকরণ বনানীর প্রাধান্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে (চিত্র ২.৫)।

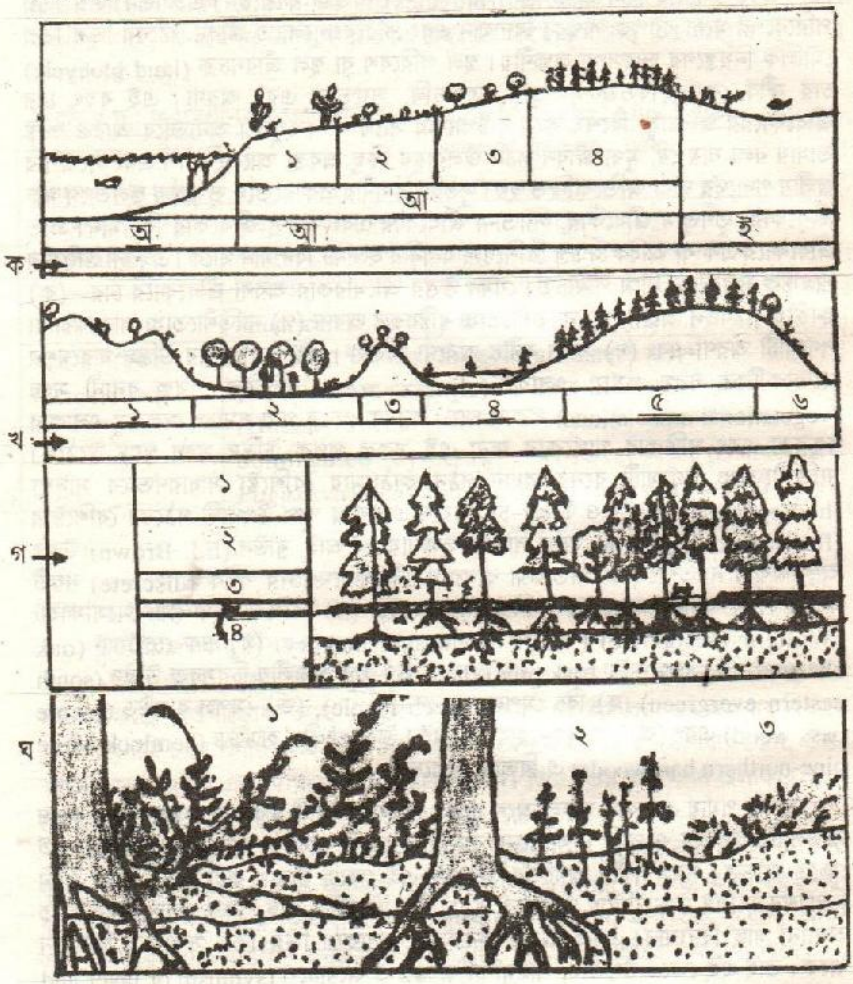

চিত্র ২.৫ : ড্যানসেরুর পরিবেশের বিস্তার (ক) উদ্ভিদ-জীবচক্র, অ. লবণাক্ত পানি, আ. স্থলভাগ, ই. মিঠা পানি, আ. (স্থলভাগ) ভূমি বায়োকোর-১. মরুভূমি ২. তৃণভূমি, ৩. স্যাভানা, ৪. অরণ্য। (খ) ক্যানাডীয় অরণ্য-বায়োকোর মধ্যবর্তী ফরমেশন-১. সঞ্চরণ বালিয়াড়ী ; ২. নিম্নতল ভূমি ; ৩. শৈলশিরা ; ৪. বগভূমি ; ৫. উঁচু ভূমি ; ৬. খাড়া পাহাড়। (গ) উঁচু ভূমির উদ্ভিদ-সঙ্ঘ-স্তর (স্প্রুস ফার সঙ্ঘ)-১. স্প্রুস-ফার-ইউনিয়ন ; ২. পাহাড়ীয় অ্যাশ ইউনিয়ন ; ৩. বাঞ্চবেরী ইউনিয়ন ; ৪. মস্ ইউনিয়ন। (ঘ) স্প্রুস-ফার তলের উপভাগ-১.পাইরোলা বায়োটিপ ; ২. সিরকে বায়োটিপ ; ৩. হাইলোকোমিয়াম বায়োটিপ।

সারণি ২.৬ : ড্যানসেরু পরিবেশের পরিসর

পরিবেশ ইউনিট (Environmenal iunit)	প্রধান নিয়ন্ত্রক (major control)	অন্তর্ভুক্ত এলাকা (Area covered)	প্রতিক্রিয়ার প্রকার (types of response)	বনানী ইউনিট (vegetation unit)
জীব চক্র (Biocycle)	মধ্যম ভৌত (medium physical)	পৃথিবী (world)	বাস্তব্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় (ecological)	বিভিন্ন প্রকৃতি (verious types)
জীবকোর (Biocore)	জলবায়ু (আবহাওয়াগত) (Climate or meteorological)	মহাদেশ বা প্রদেশ (Continent or province)	গাঠনিক (structural)	ফরমেশন শ্রেণী (formation class)
চরম পর্যায় ক্লাইমেক্স এলাকা (Climax area)	জলবায়ু (আবহাওয়াগত)	অঞ্চল (Region)	গাঠনিক এবং ফুল উৎপাদক (structural & fluristic)	ক্লাইমেক্স বা চরম পর্যায় সঙ্ঘ এবং অধীনস্থ সেরি (Climax association and subordinate seres)
বাসস্থান (Habitat)	ভূসংস্থান এবং মৃত্তিকা (ভৌম) (Topography and soil edaphic)	ভূমিরূপ (Land form)	সমাজবিজ্ঞানীয় (sociological)	সঙ্ঘ (Association)
সিনুসিয়া (Synocia)	অণু জলবায়ু (অণু আবহাওয়াত) (Micro cliamte or meteorological)	স্তর (Layer)	সমাজবিজ্ঞানীয় (Sociological)	ইউনিয়ন (Union)
বায়োটিপ (Synocia)	অণু জলবায়ু (অণু আবহাওয়াগত বা জৈবিক) (Micrometeor ogical or biological)	নিচ্যা (Neche)	অণুভূমিজ (Micro edaphic)	অণু সমাজ বা মোট সমিষ্টি (Micro society or aggregation)

উৎস : H. Robinson (1972) : Biogeography ; McDoland and Evans Ltd. pp. 166

তৃতীয় অধ্যায়

বনানী ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকা ও মানবকুলীয় নিয়ামক

২.১ বনানী ও জলবায়ু

বনানীর প্রকৃতি ও প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর নিয়ামক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবান্বিত হয়। নিয়ামকগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো।

ক. জলবায়ু বিষয়ক–জলীয় পদার্থ, তাপ, আলো, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি ;

খ. বাসস্থানীয় বা ভূমিজ (edaphic) মৃত্তিকার অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য ;

গ. ভূ–প্রাকৃতিক স্তরকাঠামো, বন্ধুরতা, উচ্চতা, ঢাল ও আলো প্রাপ্তির অবয়ব ;

ঘ. অণুজীব জীবের প্রভাব (Influence of organisms) ;

ঙ. মানবকুল সম্বন্ধীয় (Anthropogenic) মানুষ দ্বারা পরিষ্কারকরণ, পোড়ানো এবং

চ. আগুন, পানি নিষ্কাশন প্রভৃতি।

প্রথম তিন শ্রেণী প্রাকৃতিক নিয়ামক, চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়ামকদ্বয় জৈবিক নিয়ামক এবং ষষ্ঠ নিয়ামকের প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো জৈবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভূপৃষ্ঠের কোনো এলাকায় বনানী বর্ণিত নিয়ামকগুলোর সামগ্রিক প্রভাবের ফলাফলের বৈশিষ্ট্য বহন করে অর্থাৎ বনানী প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষ, প্রাণী ও অন্যান্য প্রতিযোগী বনানীর পরিবেশ দিয়ে প্রভাবান্বিত হয়। অতি প্রভাব সম্পন্ন নিয়ামক জলবায়ু, পৃথিবীর স্কেলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বা স্থানীয় এলাকার ভূখণ্ড (Terrain), মৃত্তিকা বা অন্যান্য নিয়ামক বনানীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে বনানীর প্রকার বিভিন্ন অবস্থা, যেমন বন্ধুরতা বা জলাশয়ের প্রতিবন্ধকতা ; মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য ; জলবায়ুর অস্থিরতা (climatic fluctuations) প্রাণী বা মানুষের প্রতিবন্ধকতা এবং আগুন ও বন্যারূপ দুর্ঘটনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।

অন্যান্য ভৌত নিয়ামক অপেক্ষা জলবায়ুর প্রভাব, বনানী–প্রজাতি ও বনানী পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে বেশি হলেও, জলবায়ু এককভাবে নয় বরং অন্যান্য নিয়ামকের সাথে একত্রে কাজ করে। এজন্য ভূমিজ ও জীবজ নিয়ামকের উপর জলবায়ুর উপাদান, জলীয় পদার্থ, তাপ, সূর্যালোক ও বায়ুপ্রবাহ এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফলের প্রভাব এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র ৩.১)। জলবায়ুর যে কোনো একটি উপাদান অন্যান্য নিয়ামকের পার্থক্যকে প্রভাবান্বিত করে। জলীয় পদার্থ ও তাপের পরিমাণ বা ঋতুভেদে এই দুটির তারতম্য সাধারণত বনানীর পরিবর্ধন ও প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের প্রধান নির্ধারক হিসেবে পরিগণিত।

কোনো উদ্ভিদই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। কারণ উদ্ভিদের টিকে থাকা, পরিবর্ধন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য জলীয় পদার্থ অপরিহার্য। তাই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সকল অংশে বনানীর জন্য জলীয় পদার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ামক। জলীয় পদার্থ হচ্ছে বৃষ্টিপাত এবং সংশ্লিষ্ট জলীয় পদার্থ যেমন বরফ, ঘনীভবনরূপ জলীয় কণা, শিশির, মৃত্তিকার জলীয় পদার্থ এবং বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

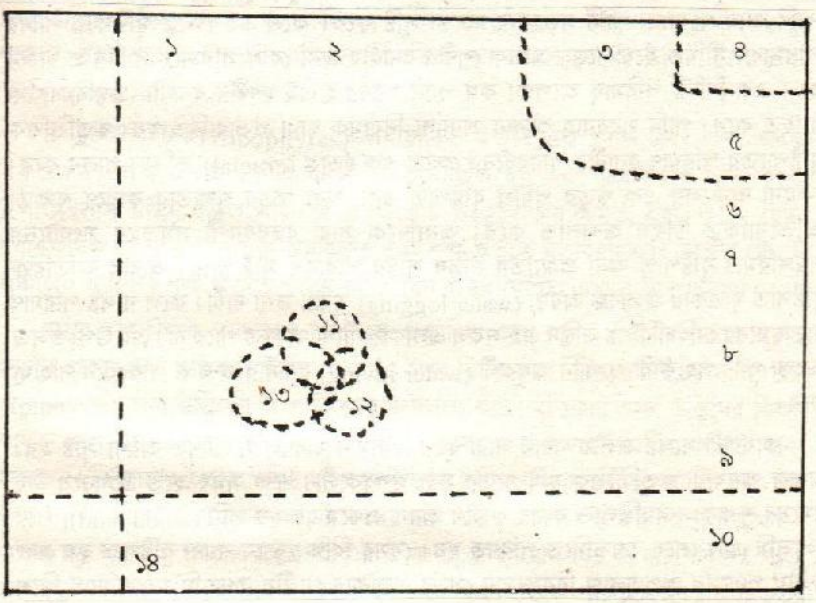

চিত্র ৩.১ : বনানী এবং জলবায়ুর সম্বন্ধ। ১. সরলবর্গীয় বন ; ২. পর্ণমোচী বন ; ৩. মৌসুমী বন ; ৪. ক্রান্তীয় বৃষ্টি-বহুল অরণ্য ; ৫. শুষ্ক অরণ্য ; ৬. তৃণ ; ৭. বৃক্ষময় ভূমি ; ৮. স্যাভানা ; ৯. উপমরু, ১০. উষ্ণমরু ; ১১. ভূমধ্যসাগরীয় বনানী ; ১২. প্রেইরি ; ১৩. স্টেপ ; ১৪. শীতল মরুভূমি।

কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ বা আংশিক জলীয় পদার্থ বাতাস থেকে সংগ্রহ করলেও প্রায় সকল স্থলজ উদ্ভিদের (land based plants) ক্ষেত্রে মৃত্তিকা জলীয় পদার্থ সরবরাহ করে। মৃত্তিকার জলীয় পদার্থের পরিমাণ ও লভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল নয়। এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় অন্যান্য নিয়ামক যেমন স্তর বা হোরাইজনের মাধ্যমে মৃত্তিকার জলীয় পদার্থের ধারণ ক্ষমতা, পৃষ্টদেশীয় পানি নিষ্কাশন এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয় পদার্থের হ্রাস-হার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাজানিয়ার আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মোটা কণার পদার্থ ও নুড়ি দিয়ে সৃষ্ট মৃত্তিকার অতি পানি প্রবেশ্যতার কারণে অরণ্যের পরিবর্তে তৃণভূমি এবং উপমেরু অঞ্চলের পানি ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্দম মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট বনানীসহ জলাভূমি সৃষ্টি করে থাকে। এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকার পানি শোষণ-ক্ষমতা এবং পানি রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

কিছু সংখ্যক দীর্ঘ শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদ যেমন—শুষ্ক অঞ্চলের তুলাগাছ, মেসকুইট, উইলো (Cottonwood, Mesquite, Willow), যেগুলো গভীর ভূতল পানি সংগ্রহ করে সেগুলো ছাড়া সকল উদ্ভিদ মৃত্তিকার কৈশিক পানির উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদ ফ্রিটোফাইট (Phreatophytes) নামে পরিচিত।

বৃষ্টি বরফপাতের বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ ও ঋতুভিত্তিক সংঘটন উদ্ভিদ বর্ধন ও উদ্ভিদ প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সাধারণত প্রবল ধারার বৃষ্টি মধ্যম ভারী বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অপেক্ষা অতিরিক্ত পানি জমে থাকা বা পানি গড়ানোর অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকায় পানির পরিস্রাবণ সীমিত হয়ে পড়ে। অনেক শ্রেণীর বনানীর জন্য বেশি পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি সরবরাহ এই শ্রেণীর বনানীর ক্রমবিকাশকে ব্যাহত করে। পানি সরবরাহ আবার অন্যান্য নিয়ামক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বনানীর পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত (crucial) ভূমিকা পালন করে। কোনো অঞ্চলের এক ঋতুর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অন্য ঋতুর শুষ্কতার কারণে শুষ্কতা অভিযোজিত উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। অন্যদিকে সারা বছরব্যাপী সমভাবে সংঘটনের সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত অন্য প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মৃত্তিকার জলাবদ্ধ অবস্থা (water logging) সৃষ্টির জন্য দায়ী। ফলে যথেষ্ট পরিমাণ বাতান্বয়নের চাহিদাবিশিষ্ট উদ্ভিদ এই সকল এলাকায় টিকে থাকতে পারে না। এই উপ-জলজ অবস্থা পানি সহ্যকারী ও পানি অনুরাগী (water loving) বনানীর জন্ম ও পরিবর্ধনে সাহায্য করে।

কার্যকরী যথেষ্ট জলীয় পদার্থ সারা বছর বিদ্যমান থাকলে সাধারণত অরণ্য সৃষ্টি হয়। অঞ্চল অনুযায়ী ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের ফল স্বল্পকালীন শুষ্ক সময় হতে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ সময়ের শুষ্ককাল ব্যাপ্তিলাভ করার কারণে অরণ্য প্রথমে বৃক্ষময় ভূমি (wood land), পরে গুল্মভূমি এবং শেষে তৃণভূমিতে পরিণত হয়। যেসব বিক্ষিপ্তভাবে নগণ্য বৃষ্টিপাত হয় এবং জলীয় পদার্থের অপ্রতুলতা বিরাজমান সেসব এলাকার প্রান্তীয় তৃণভূমি মরুভূমিতে মিশে যায়। বিভিন্ন পন্থায় শুষ্কতা অভিযোজনবিশিষ্ট বনানী মরু এলাকায় লক্ষ্যণীয়। চার শ্রেণীর যথা—(ক) শুষ্কতা পরিহারবিশিষ্ট কৌশলী (Drought evading) বনানী, যেমন একক বর্ষজীবী বনানী ; (খ) শুষ্কতা সহ্যকারী (Drought enduriing), যেমন ক্রিওজোট ঝাড় (Creosote bush) ; (গ) শুষ্কতা প্রতিবন্ধককারী (Drought resistant), যেমন বাবলাজাতীয় এবং (ঘ) পানি সংরক্ষণ (Capable of storing water) বা রসালো (succluents) বৈশিষ্ট্যের বনানী যেমন ক্যাকটাস (Cacti) মরুভূমিতে লক্ষণীয় আমেরিকার এটি একটি উদ্ভিদ বিশেষ।

পানির পরিমাণের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বনানীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

১. জলজ উদ্ভিদ (Hygrophytes)–জলীয় পদার্থ অনুরাগী উদ্ভিদ পানি অথবা অতি সিক্ত এবং আর্দ্র অঞ্চলে জন্মে থাকে। জলজ বনানী (Hygrophilous plants) হচ্ছে কচুরিপানা, বিদারণ (গরান গাছ), জলাভূমির ধান এবং কলা (Water hyacinth, mangrove, swamp rice and banana)।

২. মরু উদ্ভিদ বা শুষ্ক অঞ্চলের বৃক্ষ (Xerophytes)–শুষ্কতা সহ্যকারী বনানী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ক্যাকটাস (*Cacti euphorbia*) এবং অন্যান্য মরু উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের দীর্ঘসময়ভিত্তিক উত্তপ্ত ও শুষ্ক ঋতুবিশিষ্ট এলাকার উদ্ভিদসমূহ মরু বনানীর বৈশিষ্ট্য বহন করে।

৩. মেসোফাইট (Mesophyte)—স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব উদ্ভিদ আর্দ্র কিন্তু সিক্ত নয় এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকায় ক্রমবিকাশ লাভ করে, সেসব উদ্ভিদ মেসোফাইট নামে পরিচিত। এসব উদ্ভিদের কিছু সংখ্যক কয়েকদিনের শুষ্কতা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ আরও দীর্ঘসময়ের শুষ্কতা সহ্য করতে পারে। বেশি সময়ভিত্তিক শুষ্কতা সহ্যকারী উদ্ভিদ ট্রপোফাইট (Tropophyte) শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪. ট্রপোফাইট (Tropophytes)–পর্যায়ান্বিত ঋতুভিত্তিক সিক্ত এবং শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান এলাকায় এই শ্রেণীর বনানী অভিযোজিত হয় এবং ক্রমবিকাশ লাভ করে। ট্রপোফাইলাস উদ্ভিদ বর্ণিত পরিবর্তনের অবস্থায় টিকে থাকার ক্ষমতা বহন করে। যেমন পর্যায়ক্রমিক তৃণের ঋতুভিত্তিক ক্রমবিকাশ এবং শুষ্ক ঋতুতে মৃত্যুবরণ এবং ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্যের শুষ্ক ঋতুতে পাতাঝরা ও বর্ধন বন্ধের বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য।

বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতাও বনানীকে প্রভাবিত করে যদিও এই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বনানীর প্রকার এবং মৃত্তিকার জলীয় পদার্থের উপর নির্ভর করে। কিছু বনানী যেমন পরগাছা (Epiphytes) অন্য উদ্ভিদের অংশ বিশেষে জন্মলাভ করে। মৃত্তিকায় এসব উদ্ভিদের শিকড় সংযুক্ত নয়। এই উদ্ভিদগুলোর খাদ্য ও জলীয় পদার্থের জন্য বাতাসে অধিক আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। নিম্নমানের আর্দ্রতাবিশিষ্ট বায়ুর বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার দ্বারা জলীয় পদার্থের দ্রুত হ্রাস এবং বনানীর প্রস্বেদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করে। মরু উদ্ভিদ প্রস্বেদন হ্রাসের কৌশল যেমন—পাতার ক্ষুদ্র আকার, পাতার রন্ধ্রের আকার ও সংখ্যা হ্রাস, মোমসদৃশ বা বার্নিশবিশিষ্ট পাতা এবং মোটা ও দৃঢ় ছাল বা বাকল অবলম্বন করে শুষ্ক বাতাস পরিবৃত অবস্থায় দ্রুততর প্রস্বেদনকে কমিয়ে ফেলে।

২.১.১. বনানী ও জলবায়ুর উপাদান তাপমাত্রা : উদ্ভিদ ক্রমবিকাশের মাধ্যম হচ্ছে জলীয় পদার্থ। আর তাপ উদ্ভিদকে শক্তি যোগায়। বনানী নিজে তাপ সৃষ্টি করে না। তাই উদ্ভিদের টিকে থাকা এবং ক্রমবিকাশের জন্য তাপের প্রভাবে বনানী ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় উষ্ণতম সময়ে উদ্ভিদের সর্বাধিক ক্রমবিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট জলীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য ভিন্ন মাত্রার তাপের প্রয়োজন হলেও প্রতি ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তাপমাত্রার সীমা বিদ্যমান। প্রতি উদ্ভিদ প্রজাতির তিনটি চূড়ান্ত পর্যায়ের তাপমাত্রা (critical temperature) লক্ষ্য করা যায় (ক) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা—এই তাপমাত্রার নিচে উদ্ভিদের অস্তিত্ব লোপ পায় (খ) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা—এই তাপ সীমার উর্ধ্বে উদ্ভিদ বেঁচে থাকে না এবং (গ) সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimum) তাপমাত্রা—এই তাপমাত্রা উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল এবং উদ্ভিদ অতি সক্রিয়ভাবে পরিবর্ধিত হয়।

নিম্ন তাপ সীমা উদ্ভিদের পরম শূন্য (specific zero) নামে পরিচিত। এই পরম তাপ সীমা সবসময় হিমাঙ্ক সীমা নির্দেশ করে না। এটা স্বীকৃত যে, মাসিক গড় তাপ ৬° সে. (৪৩° ফা.) এর নিচে অবস্থান করলে প্রায় সকল উদ্ভিদের পরিবর্ধন বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে এই সকল উদ্ভিদের পরম শূন্য তাপমাত্রা ৫.৫° সে. (৪২° ফা.) ধরা হয়। এই পরিমাপের নিচে তাপ কমে গেলে উদ্ভিদ মারা না গিয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না। আর্কটিক শেওলা ও পুষ্পল ছত্রাকের (Arctic moss and lichens) অনুরূপ বনানী হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায় অর্থাৎ—১.১° সে. হতে ৪.৪° সে. (৩০° ফা. হতে ৪০° ফা.) তাপমাত্রায় দীর্ঘসময় ধরে বেঁচে টিকে থাকতে পারে। প্রায় সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তুষার দু'ভাবে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। প্রথমত, নিম্ন তাপমাত্রার সাহায্যে মৃত্তিকার জলীয় পদার্থ জমে যাওয়ার (frozen) ফলে উদ্ভিদের পাতার প্রস্বেদনের সাহায্যে জলীয় পদার্থের ঘাটতি পূরণের জন্য উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে মৃত্তিকা হতে জলীয় পদার্থ গ্রহণ করতে পারে না (চিত্র ৩.২)। এই অবস্থা শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা (physiological drought) নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, নিম্ন তাপমাত্রা উদ্ভিদের রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করতে পারে। ফলে উদ্ভিদের কলা (tissue) ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে ; কারণ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি মন্থর হয়ে পড়ে। সাময়িক তুষার অনেক সময় উদ্ভিদকে ভেঙে ফেলতে বা বিস্ফোরিত করে টুকরা টুকরায় পরিণত করতে পারে।

ক) তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে জলবায়ু শ্রেণীর বিস্তারণ : ১. চিরতুষার এবং বরফ ; ২. তুন্দ্রা ; ৩. তৈগা (উপ-আর্কটিক) ; ৪. শুষ্ক ; ৫. উপ-শুষ্ক ; ৬. উপ-আর্দ্র ; ৭. আর্দ্র ; ৮. সিক্ত।

খ) তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বনানীর সৃজন : ১. চিরতুষার এবং বরফ ; ২. তুন্দ্রা ; ৩. তৈগা ; ৪. মরু গুল্ম ও তৃণ ; ৫. স্টেপ ক্ষুদ্র-তৃণ ; ৬. তৃণ ; ৭. অরণ্য ; ৮. বৃষ্টিবহুল অরণ্য

গ) তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রধান মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ : ১. চিরতুষার এবং বরফ ; ২. তুন্দ্রা মৃত্তিকা ; ৩. পডজল ; ৪. মরু মৃত্তিকা ; ৫. বাদামি মৃত্তিকা ; ৬. সার্নোজেম ; ৭. প্রেইরি মৃত্তিকা ; ৮. ধূসর বাদামি পডজল মৃত্তিকা ; ৯. ল্যাটারাইট (লোহিত ও হরিতাভ) মৃত্তিকা ; ১০. লেটেরাইট লোহিত মৃত্তিকা।

হিমাঙ্কের উর্ধ্বে কমপক্ষে ৬° সে. (১০° ফা.) হতে তাপের বৃদ্ধি পর্যাপ্ত জলীয় পদার্থের পরিবেশে উদ্ভিদের বর্ধন দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়। প্রায় সকল উদ্ভিদ যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারলেও এই শ্রেণীর উদ্ভিদগুলো দীর্ঘ সময়ের ৫৫° সে.-এর উর্ধ্বের তাপ মাত্রায় উন্মুক্ত অবস্থায় হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, না হয় মারা যায়। কেবল তাপমাত্রা এক্ষেত্রে উদ্ভিদের সক্রিয়তা বা মৃত্যুর কারণ নয়। উচ্চ তাপের প্ররোচণায় অতিমাত্রার বাষ্প প্রস্বেদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উদ্ভিদের কলার শুষ্কতা ও জল শূন্যতা সৃষ্টির ফলে বর্ণিত অবস্থা অর্থাৎ উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে। যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় পদার্থের উপস্থিতি উদ্ভিদের গ্রথিত কোষের এই ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে (prevented)। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্বেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণে পানি উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্ভিদ উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। কারণ প্রস্বেদন কার্যক্রম হচ্ছে এক শীতলীকরণ প্রক্রিয়া। যদি উদ্ভিদের প্রস্বেদন

কার্যক্রম পূরণ না হয় তা হলে নেতিয়ে পড়ে অর্থাৎ তাজাভাব হারায় (wilt), শুষ্কতার সৃষ্টি হয় এবং শেষে উদ্ভিদ ধ্বংস হয়। সুতরাং তাপ-জলীয় পদার্থের সম্বন্ধ কেবল তাপের কার্যক্রমের অনুরূপ উদ্ভিদ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বায়ুর আর্দ্রতা এবং আলোর প্রগাঢ়তা (light intensity) তাপের কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বাস্তবে নিম্ন তাপমাত্রা বা উচ্চ তাপমাত্রার সাথে অন্যান্য নিয়ামকের সমন্বয়ের ফলাফল উদ্ভিদ জীবনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায় বলে বিবেচিত।

অনেক ক্ষেত্রে রাত্রিকালীন তাপমাত্রার ফলাফল উদ্ভিদের কিছু কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হয়। অনেক বনানীর ক্ষেত্রে রাতে নিম্ন সীমার যেমন তাপমাত্রা প্রয়োজন। অর্থাৎ যে তাপমাত্রার নিচে উদ্ভিদের কিছু কার্যক্রম পরিপূর্ণতা লাভ করে না, তেমনি অনেক বনানীর আবার নির্দিষ্ট তাপের নিচে না এলে বনানীগুলোর পুষ্প বিকশিত হয় না। সুতরাং কিছু নির্দিষ্ট বনানীর ভৌগোলিক বিস্তারণ রাত্রিকালীন নগণ্য তাপমাত্রার পরিবর্তন দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্ভিদ বর্ধনের ক্ষেত্রে তাপের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার (extremes of temperatures) গুরুত্ব ছাড়াও তাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বনানী বাড়ন্ত ঋতুর (growing season) দৈর্ঘ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল উদ্ভিদের জীবনচক্র পূর্ণ করার জন্য এক আপেক্ষিক নিম্নমান তাপমাত্রার উর্ধ্বের তাপমাত্রার স্থায়িত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ। তুলা গাছের বর্ধন ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য কমপক্ষে ২০০ তুষারমুক্ত দিনের প্রয়োজন। গমের জন্য বর্ণিত দিনের সংখ্যা হচ্ছে ৯০। গম পাকার সময়ের প্রয়োজনীয় গড় তাপ ১৫.৫° সে. (৬০° ফা.)। বাড়ন্ত ঋতু অর্থাৎ এই ৯০ দিনের বর্ণিত তাপের চেয়ে বেশি তাপ গমের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক পন্থায় উদ্ভাবিত সত্বর পূর্ণতা প্রাপ্তি-বনানী (breeding quick maturity varieties of plants) যেমন গম আরও কম দিনের (৯০ দিনের কম) বাড়ন্ত ঋতুতে জন্মানো সম্ভব হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রকৃতির কার্যক্রমকে বাঁধাপ্রদান করে আরও শীতল জলবায়ু অঞ্চল, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত উত্তর সীমার উত্তরে গমের চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

তাপের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বনানীকে চার প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

ক) মেগাথার্ম্স (Megatherms) : যেসব অঞ্চলের তাপ ১৮° সে. (৬৪° ফা.) অপেক্ষা যেসব বনানী মেগাথার্মস নামে পরিচিত।

খ) মেসোথার্ম্স (Mesotherms) : যেসব অঞ্চলের তাপমাত্রা ৬° সে. হতে ১৮° সে. (৪৩° হতে ৬৪° ফা.) এবং উষ্ণতম মাসগুলোর তাপ ২৩° সে. (৭২° ফা.) এর বেশি সেই এলাকার বনানী হচ্ছে মেসোথার্মস।

গ) মাইক্রোথার্ম্স (Microtherms) : যে অঞ্চলের শীতলতম মাসগুলোর তাপ ৬° সে. (৪৩° ফা.) এবং উষ্ণতম মাসগুলোর তাপমাত্রা ১০° সে. হতে ২৩° সে. (৫০° ফা. হতে ৭২° ফা.) এর মধ্যে সেসব অঞ্চলে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে থাকে।

ঘ) হেকিস্টোথরমস (Hekistotherms) : যেখানে উষ্ণতম মাসগুলোর তাপমাত্রা ৮০° সে. (৫০° ফা.) এর কম সেসব অঞ্চলের বনানী হচ্ছে হেকিস্টোথারম।

২.১.২. বনানী ও জলবায়ুর উপাদান সূর্যালোক : বনানীর ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সূর্যের আলো আরও এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপাদানটির তীব্রতা ও স্থায়িত্ব (Intensity and

duration) উদ্ভিদের বর্ধনকে প্রভাবিত করে। অক্ষাংশ, বছরের ঋতু, মেঘের পরিমাণ, অন্য উদ্ভিদের সান্নিধ্য এবং আলোক প্রাপ্তি দৃষ্টিকোণের ঢাল (Aspect) এর কারণে স্থানভেদে সূর্যের আলোর মাত্রা ও পরিমাণ (Strength and amount) এর তারতম্য প্রকাশ পায়। জটিল প্রকৃতির জৈব যৌগিক তৈরির ক্ষেত্রে সূর্যের আলো বনানীর সালোক সংশ্লেষ কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। এই পুষ্টিকর (Natritional) কার্যক্রম পত্রহরিৎ–এর সহায়তায় সূর্যের আলো হতে উদ্ভিদ শক্তি শোষণ করে সমাধা করে। যেসব এলাকায় সূর্যের আলো ক্ষীণ (Weak) সেসব স্থানের উদ্ভিদে অপ্রতুল পত্রহরিৎ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের বর্ধন লম্বা ও রোগাটে (lank) বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং পুষ্টিহীনতা ও পাণ্ডুর বর্ণ প্রকাশ করে। সাধারণত আলোর অভাবে বনানীর বর্ধন সঠিকভাবে না হলেও কিছু কিছু উদ্ভিদ ছায়া, এমনকি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন পুষ্প ও বীজ উৎপাদন আলোর উপর নির্ভরশীল। আলোর অভাব ফুলকে বিকশিত হতে বাধা দেয় (bursting)। উজ্জ্বল আলো বড় আকারের উজ্জ্বল বর্ণের ফুল এবং ক্ষুদ্র আকারের পাতা তৈরি করতে বনানীকে সাহায্য করে। অন্যদিকে ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশের উদ্ভিদের ফুলের পরিবর্ধন হ্রাস এবং পাতাজাতীয় অংশ বর্ধিত আকারে প্রকাশ পায়।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সূর্যালোক ও তাপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ সূর্যালোক তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে এবং কখনও কখনো জলীয় পদার্থের অপ্রতুলতা তাপমাত্রাকে উদ্ভিদের সহ্যসীমার (cirtical) উর্ধ্বে পৌছাতে সাহায্য করে। সূর্যালোক যেমন পত্রহরিৎ উৎপাদনে সাহায্য করে তেমনি অত্যধিক তাপমাত্রা পত্রহরিৎকে ধ্বংস করতে পারে। সূর্যের আলোর বিপরীতে পাতার সম্মুখভাগ এবং পাতার প্রান্ত সূর্যের প্রত্যক্ষ আলোর দিকে উদ্ভিদের সাহায্যে প্রতিস্থাপন সূর্যের আলোর প্রতি পাতার অনুভূতি প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে।

সূর্যের আলোর ব্যাপ্তিকাল উদ্ভিদ জীবনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে অতি স্বল্প সময়ের বাড়ন্ত ঋতু বিদ্যমান। দীর্ঘ সময়ের বাড়ন্ত ঋতুর ক্ষতি এই স্বল্প সময়ের বাড়ন্ত ঋতুর দীর্ঘ সময়ের (দীর্ঘ দিনের) সূর্যের আলোর সাহায্যে পূরণ হয়। এরূপ বিশেষ অবস্থার উদ্ভিদ আশ্চর্যজনক এক অভিযোজন ক্ষমতা বহন করে।

২.১.৩. বনানী ও জলবায়ুর উপাদান বায়ুপ্রবাহ : সকল জীবনের জন্য বায়ুর প্রয়োজন। জীবাণুর শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য বায়ু অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বনানীর সালোকসংশ্লেষণের জন্যও বায়ু কার্বন ডাই–অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সরবরাহ করে। বাস্তুসংস্থানের প্রাণ বহনকারী অংশে বায়ু জীবাণুর নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। বায়ুর চাপের ফলাফল মানুষ ও প্রাণীর উপর নির্ণয় করা গেলেও উদ্ভিদের উপর এই চাপের ফলাফল নির্ণীত হয়নি। যদিও ধারণা করা হয় যে, বনানীর অক্সিজেন ও কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাপের হ্রাসের প্রভাব বিদ্যমান।

বায়ুপ্রবাহ বায়ুর আনুভূমিক চলাচল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনানীকে প্রভাবান্বিত করে। উচ্চগতি মাত্রার বায়ুপ্রবাহ অর্থাৎ ঝড়ো গতিসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহ gale force winds অর্থাৎ ঘন্টায় ৩৫ মাইলের উর্ধ্বগতিসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও উৎপাটিত করে।

প্রায় স্থির গতিসম্পন্ন একই দিকের বায়ুপ্রবাহ গাছের আকৃতি, যেমন গাছের প্রতিবাত দিকে হেলানো অবস্থা (bending), ফ্ল্যাগ আকারের আকৃতি গঠন এবং মোচড়ানো ও হ্রস্বাকৃতির বাড়নের (twisted and stunted growth) সৃষ্টি করে। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে তুষার কণা ও শিলা কণা মিশ্রিত বায়ুপ্রবাহ সহজেই উহার প্রবাহ দিকের বনানীর উন্মুক্ত কোষসমূহের ধ্বংস সাধন করে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণযুক্ত বায়ু প্রবাহের ফলে উদ্ভিদের পাতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা পাতার পরিবর্ধন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহ সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদের জন্ম ও বর্ধন বন্ধ করে ফেলে। মেরুর দিকে গুল্মের অবস্থান সীমা যেমন তাপ দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনি এই নির্ধারণ সীমার ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহের গুরুত্ব অনুরূপ বলে অনুমান করা হয়।

পরোক্ষভাবে বায়ুপ্রবাহ জলীয় পদার্থের হ্রাসের হার বৃদ্ধি করে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। উষ্ণ ও শুষ্ক প্রবল বায়ুপ্রবাহ প্রস্বেদন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। অনেক সময় এই শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে দ্রুততম করার ফলে উদ্ভিদের ক্ষতি সাধিত হয়। এই শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ আবার মৃত্তিকাকে শুকিয়ে ফেলে। ফলে মৃত্তিকায় উদ্ভিদের সরবরাহের জন্য জলীয় পদার্থ হ্রাস পায়। বনানীর উপর বায়ুপ্রবাহের ফলাফল স্থানীয়ভাবে গুরুত্ব বহন করলেও পৃথিবীভিত্তিক বায়ুপ্রবাহ বলয় এবং বনানীর মধ্যে সহসম্বন্ধ লক্ষণীয় নয়।

২.২. বনানী ও মৃত্তিকা বিষয়ক নিয়ামক

বনানীর বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ক্ষেত্রে জলবায়ুর উপাদান, জলীয় পদার্থ ও তাপমাত্রা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও মৃত্তিকা বিষয়ক নিয়ামক (edaphic factors) বা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মৃত্তিকাও বনানীর বৈশিষ্ট্যর তারতম্য ঘটায়। একই সাধারণ শ্রেণীর উদ্ভিদ এলাকায় পর্ণমোচী শক্ত কাষ্ঠবিশিষ্ট অরণ্যের মধ্যে কর্দম ও বালি মৃত্তিকায় ওক, শুষ্ক খড়িমাটি মৃত্তিকায় (drier chalky soils) বীচ এবং আর্দ্র মৃত্তিকায় অ্যালডার বৃক্ষের প্রাধান্য লক্ষণীয়। শুষ্ক অঞ্চলের মৃত্তিকার খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ের তারতম্য বনানী সমাবেশের তারতম্য ঘটায়।

বনানীর জন্য মৃত্তিকার পুষ্টিকর খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মৌল জৈব পদার্থ তৈরির ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হচ্ছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস এবং সালফারের গুরুত্বপূর্ণ উৎস স্থল। এগুলো ছাড়াও নির্ণয় করা সম্ভব নয় এমন খনিজ (trace minerals) উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সম্বন্ধে জে. লাভোলের (J. Lavollay) বক্তব্য হচ্ছে :

> "অপরিহার্য ট্রেস (trace) উপাদান হিসেবে মলিবডেনাম এনজাইম প্রক্রিয়ার (Enzymic process) মাধ্যমে নাইট্রেট কমিয়ে ফেলে। এই উপাদানের অনুপস্থিতিতে বনানীর প্রথম প্রক্রিয়া–মৃত্তিকার নাইট্রেটের ব্যবহারের ভিত্তিতে এর নাইট্রোজেন যৌগের সংশ্লেষণ (synthesis of their nitrogenous compound) থেমে যায়। জিঙ্ক বনানীর জৈব সংশ্লেষণের এনজাইম সৃষ্টির সাথে জড়িত। বনানীর সালোকসংশ্লেষণের গঠনস্তরে ক্লোরিন অপরিহার্য এবং ক্লোরিন বনানীর শর্করাজাতীয় পদার্থ (carbohydrates) পরিবাহিত করে। যাহোক বনানীর কোষীয় স্তরে (molecular level) এই উপাদানগুলোর সঠিক কাজের ধরন (exact mode of action) এখনও অজ্ঞাত।"[১]

১. Robinson, H.(1972) : Biogeography, p. 182.

ক) প্রায় সকল উদ্ভিদের বীজতলা ও উদ্ভিদকে খাড়া রাখার (anchorage) ক্ষেত্র হিসেবে, (খ) বনানীর পুষ্টিকর পদার্থের উৎস হিসেবে, (গ) পানি রক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে, (ঘ) মৃত্তিকার তাপরক্ষা ও সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে, (ঙ) মৃত্তিকার গভীরতা মাধ্যম এবং (চ) মৃত্তিকার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এর মাধ্যম হিসেবে।

২.৩. বনানী ও ভূ-প্রাকৃতিক নিয়ামক

উচ্চতা, সমতলতা, ঢাল এবং আলো প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণের বন্ধুরতার অবয়ব (aspect of relief) প্রভৃতি ভূ-প্রাকৃতিক নিয়ামক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনানীর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উচ্চতা জলবায়ুর তারতম্য সৃষ্টি করে এবং এই জলবায়ুর পার্থক্য পার্বত্য এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন বনানীর বিস্তারণে প্রকাশ পায়।

জলীয় পদার্থ, তাপ এবং আলো প্রাপ্তির পরিমাণ বন্ধুর এলাকায় বিশেষ করে বায়ুপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চ ভূমিতে ঢাল ও আলো প্রাপ্তির অবয়ব জলবায়ুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এগুলোর প্রভাব বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়। পর্বতের উভয় প্রান্তের বনানীর পার্থক্যের উদাহরণ এখানে উল্লেখ্য। তুন্দ্রা অঞ্চলের স্তরে উচ্চতার তরঙ্গায়িত ভূমির সাহায্যে বায়ুপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিবাত ঢালের বরফের আস্তরণ উদ্ভিদ জীবনকে প্রভাবিত করে।

ঢাল-মৃত্তিকা এবং পানি নিষ্কাশনকে প্রভাবিত করে এবং এগুলোর প্রভাব বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়। খাড়া ঢালবিশিষ্ট এলাকায় পাথর মিশ্রিত অপরিণত অগভীর মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকে। মৃত্তিকার এই শ্রেণীর বুননের প্রভাব বনানীর জন্ম ও ক্রমবিকাশে প্রকাশ পায়। পর্বতের ঢাল এলাকায় ভরবেগের মাধ্যমে রেগোলিথের (regolith) নিচের দিকের গতির প্রভাব ভিন্নধর্মী মৃত্তিকা ক্রমের সৃষ্টি করে থাকে—যার প্রতিফলন বনানীর উপর লক্ষ্য করা যায়।

ভূপ্রকৃতির পৃষ্ঠদেশীয় রূপ (surface topography) এর সমতলতা (levelness) বা অন্য প্রকৃতি পানি নিষ্কাশনের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে এবং এর ফলাফল বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জলাভূমি, নদী ও হ্রদ প্রান্ত এলাকার বনানী এবং এসব ভূমি অপেক্ষা উচ্চ ও শুষ্ক এলাকার বনানীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পাবে।

২.৪. বনানী ও জীবজ নিয়ামক

জীব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যাই হোক না কেন, এগুলোর ফলাফলের ভাল বা খারাপ প্রভাব বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়। নিম্নশ্রেণির অণুজীব (lowly microorganisms) মৃত্তিকায় বসবাস করে। উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ ও মৃত প্রাণী দেহের পচনক্রিয়া সমাধার মাধ্যমে পচনক্রিয়াশীল জীবাণু (decomposers) মৃত্তিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর পুষ্টিকর পদার্থ তৈরি করে। এই পদার্থগুলো পুনরাবর্তিত বা বনানীর সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। বাস্তুসংস্থানে এ এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এটি জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বা আবর্ত (Biogeochemical cycle) নামে পরিচিত।

সাধারণভাবে অসংখ্য প্রাণী বনানীর সাথে জড়িত এবং পরস্পরের মধ্যে এগুলোর আন্তঃক্রিয়া বিদ্যমান। অনেক উদ্ভিদ জীব দিয়ে পরাগায়িত হয় এবং উদ্ভিদগুলো সমৃদ্ধিলাভ ও

টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রাণিজগতের সাহায্য লাভ করে। অনেক পাখি ও পশু অন্য জীবকে শিকার করে। ফলে বনানীর উপর জীবগুলোর ক্ষতিকারক কার্যকলাপ সীমিত হয়ে পড়ে। এভাবে উদ্ভিদজগত ও প্রাণিকুলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। অন্যদিকে আবার পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীর কার্যক্রমের সাহায্যে কখনও কখনও উদ্ভিদ ধ্বংস হয় এবং পরিবর্তিত শ্রেণীর বনানী জন্মলাভ করে। প্রাকৃতিক অবস্থায় খাদ্য সরবরাহ ও প্রাণী–প্রজাতির সংখ্যার মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য বজায় থাকে। এক্ষেত্রে প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা নতুন প্রাণীর প্রবর্তন প্রতিষ্ঠিত বনানীর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন আনে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অঞ্চলটির বৃক্ষময় ভূমি (woodland) ধ্বংস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কারণ ছাগল চারাগাছ ও বনানীর কোমল অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে বনানীর স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৯ সালে খরগোশ বা শশক প্রবর্তনের ফলে মহাদেশটির প্রাকৃতিক বনানীর ভারসাম্য নষ্ট হয়। কারণ শিকারী প্রাণীর অনুপস্থিতিতে শশকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রাকৃতিক চারণভূমি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, না হয় ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মিক্সামাটোসিস (Myxamatosis) প্রবর্তন করে শশককুলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস (wholesale clearance) করা হয়। ফলে চারণভূমি পুনরায় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বনানী বিশেষ করে তৃণভূমিতে তৃণভোজী প্রাণীর নির্বাচিত তৃণ ভক্ষণ তৃণভূমি অঞ্চলের বনানীর পরিবর্তন আনয়ন করে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর বনানীর বিলুপ্তিও ঘটে। বর্তমানে পঙ্গপাল বনানী ও ফসলের জন্য এক বড় ধরনের সমস্যা না হলেও পৃথিবীর অনেক এলাকায় এগুলো লক্ষ্য করা যায়। সাময়িকভাবে এগুলোর ব্যাপকভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লক্ষ কোটি সংখ্যায় এগুলোর দেশান্তরিত হওয়ার (migrate) সময় সম্মুখভাবে সবুজ বনানীর সকল সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে বনানীর ধ্বংস ডেকে আনে।

বিভিন্ন প্রজাতির বনানীর মধ্যে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা বনানীর পরিবর্তন ঘটায়। কোন এলাকায় আগত বনানীর নতুন প্রজাতি কলোনি সৃষ্টি করার পর যদি প্রজাতিটির জন্য অবস্থা অনুকূল হয়, তাহলে এই উদ্ভিদ শ্রেণী অত্যধিক ক্রমবিকাশ ও সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা অন্য শ্রেণীর উদ্ভিদকে সঙ্কুচিত করে ফেলে (squeeze)। এই বৈশিষ্ট্য ভূতাত্ত্বিক যুগের বনানীর ক্রমবিকাশে লক্ষ্য করা গেছে।

আপদবালাই এবং রোগ বনানীর ক্ষতি বা সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করতে পারে। প্রায় সকল উদ্ভিদ রোগ, পরগাছা বা উদ্ভিদনাশক কীট দিয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর আক্রমণ বনানীর বিলুপ্তি ঘটানোর অবস্থায় ফেলতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকে। আক্রমণকারী ও আক্রান্ত বনানী বহু সময় ধরে সহঅবস্থান করলে আক্রান্ত বনানীর প্রতিরোধ শক্তি জন্মে। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো রোগ বা আপদের আগমন বনানীর জন্য সর্বনাশা অবস্থা বা পরিপূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। আমেরিকার আপালেসিয়ান অঞ্চলের অরণ্যে ১৯০৪ সালে এনডোথিয়া প্যারাসিটিকা (*Endothia parasitica*) ছত্রাকের আবির্ভাব ও আক্রমণের ফলে সকল বৃহৎ চেস্টনাট গাছ ৫০ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়।

২.৫. বনানী ও মানবকুলীয় বা নৃজাতীয় নিয়ামক (Human or Anthropogenic factors)

উদ্ভিদ সম্প্রদায় মানুষের কার্যকলাপের সাহায্যে প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব অ্যানথ্রোপজনিক নিয়ামক নামে পরিচিত। জৈব এবং অজৈব জগত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই বনানীর পরিবর্তন অতি ধীর গতিসম্পন্ন। এই মিশ্র জগতে মানুষের প্রবেশের ফল হচ্ছে বর্ণিত সুন্দর ভারসাম্যে কেবল বাধা প্রদানই লক্ষণীয় নয়, বরং তাদের অর্থাৎ মানুষের আকস্মিক ও দ্রুত কার্যকলাপের ফলাফল বনানীর উপর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। পৃথিবীর বৃহৎ অংশে মানুষের সাহায্যে প্রাকৃতিক বনানীর পরিবর্তন (modification) এত ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ যে প্রাকৃতিক বনানী সেই সকল অঞ্চলে আর বিদ্যমান নেই। বিভিন্ন পন্থায় মানুষ প্রাকৃতিক বনানীর উপর প্রভাব রেখেছে। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ যেমন পশ্চিম ইউরোপের অরণ্য পরিষ্কারের পর শস্য উৎপাদন, এশিয়া মাইনরের ভ্যালোনিয়ার অরণ্য পরিবর্তনের মাধ্যম চারণভূমি বৃদ্ধি এবং উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের তৃণভূমিতে দানা শস্য চাষের উদাহরণ এখানে উল্লেখ্য। মানুষ অনেক এলাকায় নতুন ধরনের উদ্ভিদের প্রবর্তন করেছে। বাগান বা চারণভূমিতে নতুন শ্রেণীর ঘাসের চাষ এর প্রবর্তনের সাহায্যেও প্রাকৃতিক বনানীর পরিবর্তন হয়েছে। ফ্রান্সের অ্যাকুইনটেনের ৩,৩০০ বর্গমাইল এলাকার বালিয়াড়ি ও নলখাগড়ার জলাভূমিতে কনিফার বিশেষ করে ম্যারিটাইম পাইন, নিউজিল্যান্ডের ব্যাপক এলাকার টাসোকি (tussoky) তৃণভূমি উন্নত চারণভূমিতে পরিণত করার জন্য ইউরোপীয় ঘাসের প্রবর্তন এই শ্রেণীর পরিবর্তনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। নিউজিল্যান্ডে বিদেশি থিসল (thestle) প্রবর্তন যা পরে আগাছায় পরিণত হয় বা আফ্রিকা মহাদেশে মানুষের সাহায্যে অস্ট্রেলীয় ইউক্যালিপটাসের প্রচলন বনানী প্রজাতির এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় মানুষ দ্বারা প্রবর্তন নির্দেশ করে। মানুষ আবার পানি নিষ্কাশনের সাহায্যে পানি প্রীতি বনানীর এলাকাকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। নির্বাচিত উদ্ভিদ প্রজাতির উদ্ভাবন, বর্ণ সঙ্করায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বনানীর বর্ধন ও সময় সীমিত করে মানুষ পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম কর্ষিত বনানী সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক বনানীকে পরিবর্তন করেছে। বিজ্ঞানী রিলে ও ইয়ং-এর উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মানুষের সাহায্যে উদ্ভিদ গোষ্ঠীর পরিবর্তনের ব্যাপকতার মূল্যায়ন হচ্ছে এক বিরাট ও জটিল সমস্যা।

২.৫.১. বনানী ও আগুন : প্রাকৃতিক বা মানুষের সাহায্যে সৃষ্ট আগুন অতি অল্প সময়ে ব্যাপক এলাকার উদ্ভিদকে ধ্বংস করার ঘটনা অতীতের কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইন্দোনেশিয়ায় লক্ষ্য করা গেছে। এইরূপ স্বল্প সময়ের ব্যাপক এলাকার বনানী ধ্বংসের পুনরুদ্ধার প্রকৃতির সাহায্যে সমাধা করতে শত শত বছরের প্রয়োজন পড়ে।

একক নিয়ামক হিসেবে সম্ভবত বিদ্যুৎ চমকের (lightning) সাহায্যে বিশেষ করে গ্রীষ্মের অত্যধিক উত্তপ্ত সময়ের শুষ্ক বনানী আগুনের সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম করডিলেরা (western Cordillera) অঞ্চলের স্প্রুস ফার অরণ্যে প্রতি বছর এই শ্রেণীর আগুন দিয়ে শেষ গ্রীষ্ম ঋতুতে উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তুন্দ্রা ভূমির মস ও

লাইকেনজাতীয় বনানীও আগুন দিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ক্ষতিকারক প্রভাব বন্য প্রাণী বিশেষ করে বুগলা হরিণ ও ক্যারিবোরের (caribou) উপর প্রতিফলিত হয়।

আগুন দিয়ে বনানী কেবল ধ্বংসই সাধিত হয় না বরং আগুনের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে আগুন সহ্যকারী বনানীর সৃষ্টি দ্বারা বাস্তু সংস্থানের নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হয়। দক্ষিণ পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে এই আগুন নিরোধক বনানী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আগুনের প্রভাবের অনুপস্থিতিতে সম্ভবত উত্তর মাইনোসোটার ফার অরণ্য কম উৎপাদনশীল অন্য বনানী প্রজাতির দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে পড়তো।

২.৬. বনানীর ভৌগোলিক বিস্তারণ

বনানীর উপস্থিতি পূর্বের আলোচিত স্থানীয় বহুবিধ পরিবেশীয় নিয়ামক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এইক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে মানুষ সৃষ্ট কাচের ঘরের অভ্যন্তরের বনানীর (ফসলের) চাষ। বনানীর বিচ্ছিন্ন বণ্টন ভূ-পৃষ্ঠে লক্ষণীয়। বনানীর কোনো এক প্রজাতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বণ্টিত নয়। এই শ্রেণীর বণ্টনের ফাঁকা অংশ বনানীর অন্য প্রজাতি পূর্ণ করে রেখেছে। বনানীর এই বিস্তারণ দুই মাপকাঠিতে আলোচনা করা যায়। প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারণ হচ্ছে বৃহৎ অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন বা ভৌগোলিক বণ্টন (macro-distribution or geographical distribution)। সাধারণভাবে এই বণ্টন বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত এবং এইক্ষেত্রে মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির অঞ্চল সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ক্ষুদ্র অঞ্চলভিত্তিক বা বাস্তুসংস্থানীয় বিস্তারণ (micro-distribution or ecological distribution)। এই বিস্তারণ বৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় পৃথক অনুকূল পরিবেশ পৃথক উদ্ভিদ প্রজাতির জন্ম ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। উদাহরণ হিসেবে উপযুক্ত পানি নিষ্কাশিত উচ্চভূমি এলাকা বা পৃথক বৈশিষ্ট্যের মৃত্তিকা এলাকার বনানীর উল্লেখ করা যায়।

২.৬.১. বনানীর বিস্তারণের নিয়ামক : বনানী বিস্তারণের নিয়ামকসমূহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জীবের বিস্তারণের কিছু কিছু নিয়ামকের উদ্ধৃতি এই আলোচনায় প্রতিফলিত হবে।

ক) ছড়িয়ে পড়া (dispersal) হচ্ছে উদ্ভিদের একস্থান হতে অন্য স্থানে বিস্তার লাভ করা। কিছু বনানী যেমন পয়জন আইভি (poison ivy) ক্রমবিকাশের সময় এক স্থান হতে অন্যস্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এগুলো হচ্ছে সচল বনানী। অন্য উদ্ভিদের বীজ ও রেণু বায়ুপ্রবাহ, পানি প্রবাহ বা প্রাণীর সাহায্যে অন্যত্র পরিবাহিত হয়। ছড়িয়ে পড়া কার্যক্রম বনানীর ভৌগোলিক বিস্তারণের পরিবর্তন আনতে পারে যদি এগুলো নতুন পরিবেশে টিকে থেকে বংশবিস্তার করতে পারে।

খ) প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক (Natural barriers)। প্রত্যেক জীবের কোনো না কোনো পন্থায় প্রকৃতি প্রদত্ত চলাচলের ক্ষমতা বিদ্যমান। এই ক্ষমতার সাহায্যে ব্যাপক সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র উদ্ভিদ প্রজাতি ছড়িয়ে পড়ে উপযুক্ত বাস্তুসংস্থানীয় পরিবেশে টিকে থাকত যদি না প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক যেমন, জলাশয়, পাহাড়-পর্বত এবং মরুভূমি বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের বাধা হয়ে না দাঁড়াত।

প্রতিবন্ধকের অবস্থান জীবের চলাচলের দিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চলাচলের জন্য প্রাপ্ত পথের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। কিছু উদ্ভিদ কোন এক পথ দিয়ে মুক্তভাবে বিস্তার লাভ করতে পারলেও অন্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পথটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যে পথ কিছু জীবের চলাচলের অন্তরায় (screen) হিসেবে কাজ করে সেই পথ হচ্ছে ফিলটার রুট (filter route)। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের বিন্যাস উৎপত্তিস্থল হতে বনানীর (এবং প্রাণীর) দ্বিপথে চলাচলে সহায়তা করে। এই প্রকার চলাচল পথ চলাচলের বারান্দা (corridors of movement) নামে পরিচিত।

গ) বনানী বিস্তারের হার—সচল উদ্ভিদ পরোক্ষভাবে অন্য উদ্ভিদ অপেক্ষা ধীরগতিতে বিস্তার লাভ করে। যে এলাকায় উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান সেসব স্থানে উদ্ভিদের সংখ্যা এলাকাটির ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় সচল উদ্ভিদ কম ঘনত্ব উদ্ভিদ এলাকায় তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে। প্রতিবন্ধকের বিলুপ্তিকাল দ্বারা উদ্ভিদ বিস্তার যেমন সুইডেনে প্রায় ৩,০০০ বছর-সময়ে বনানী ৬৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করে উত্তরে হিমবাহ পশ্চাদপসরণ প্রান্তে প্রকাশ পেয়েছে। বিস্তারণ যদি বাহ্যিক (passive) নিয়ামক দিয়ে সংঘটিত হয় তাহলে নিয়ামকটির সাহায্যে এই হার নির্ধারিত হয়। যেসব উদ্ভিদের বীজ পরিবাহিত হয় এবং কাঠ বিড়ালী দিয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গ্রথিত হয় (burried by squirrels) সেগুলো প্রতি হাজার বছরে ১.৬ কিলোমিটার দূরত্বে পরিবাহিত হয় বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে টর্নেডোর সাহায্যে মাত্র কয়েক ঘন্টায় ৩০ কিলোমিটার দূরে জীব পরিবাহিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে যেখানে এবং যেভাবেই বনানীর বিস্তারণ সংঘটিত হোক না কেনো দীর্ঘসময়ে উদ্ভিদগুলো তরলাকৃতি পদার্থের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ অন্যত্র পরিবাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ দীর্ঘসময় ধরে বনানী স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ করে না।

বনানীর বিস্তারণের ধরন তিন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ; যথা—

(ক) ভৌগোলিক ধরনের বিস্তারণ,

(খ) বিচ্ছিন্ন ধরনের বিস্তারণ এবং

(গ) অতি সীমিত, কেবল একটি এলাকায় বিস্তারণ।

কিছু প্রজাতির সংবহন নালিকাবিশিষ্ট বনানী, বিশেষত কিছু সংখ্যক তৃণের ব্যাপক এলাকায় ভৌগোলিক বিস্তারণ লক্ষ্য করা গেলেও কোন এক নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি পৃথিবীর প্রতি অংশে লক্ষণীয় নয়। Compositae গোত্রের বহুবর্ষভিত্তিক এবং বহুবর্ষজীবী শক্ত ডাটাহীন লতা ও গুল্ম, যেমন—বিভিন্ন সেনেসিও (senecio) পৃথিবীর প্রায় সকল এলাকায় বিদ্যমান। এগুলো কসমোপলিটান (cosmopolitan) নামে পরিচিত।

যেসব বনানী দুই বা ততোধিক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, অনেক ক্ষেত্রে হাজার হাজার মাইল দূরে (সমুদ্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন) লক্ষ্য করা যায়, সেই সকল বনানীর বিস্তারণ বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের ম্যাগনোলিয়ার বিস্তারণ এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রাণীর ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর বিস্তারণ লক্ষণীয়। যেমন ট্যাপির (tapir) কেবল দক্ষিণ আমেরিকা ও মালয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তারণ অত্যন্ত সীমিত, কেবল এক এলাকায় প্রকাশ পায়। এগুলো স্থানীয় প্রজাতি (endemic species) নামে পরিচিত। স্থানীয় বিস্তারণবাদ (endemism) দুই দৃষ্টিকোণ থেকে—

(ক) কোনো এক পুষ্পল বনানী অঞ্চল (flurirtic region), যেমন পশ্চিম ইউরোপ অঞ্চল বা পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রজাতির বনানীর অবস্থান এবং

(খ) অত্যন্ত ক্ষুদ্র এলাকা, সম্ভবত মাত্র কয়েক বর্গমাইল এলাকার পরিবেশ (micro-environment) বিদ্যমান থাকে।

ব্যাপক এলাকা ভিত্তিক প্রজাতির বিস্তারণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানী ডব্লিউ. বি. বিলিংসের মতে, শীত ঋতুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে কোনো এলাকায় সারা বছরে উৎপাদন কালের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রকাশ পায়। তাই তিনি তিন শ্রেণীর ব্যাপক এলাকাভিত্তিক বনানী প্রজাতির বিস্তারণ প্রকাশ করেছেন। এগুলো হচ্ছে আর্কটিক আলপাইন এবং নাতিশীতোষ্ণ গ্রুপের উদ্ভিদ অঞ্চল এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই শীত ঋতু বিদ্যমান। অন্যদিকে প্যান ট্রপিক্যাল শ্রেণী অঞ্চলে কোন শীত ঋতু লক্ষণীয় নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বনানীর প্রজাতির নিম্নলিখিত বিস্তারণের শ্রেণিবিভাগ করা যায়; যেমন—

(ক) আর্কটিক–আলপাইন
(খ) নাতিশীতোষ্ণ
(গ) প্যান–ট্রপিক্যাল
(ঘ) বিচ্ছিন্ন (Discontinuous)
(ঙ) ব্যাপক এলাকার দেশীয় (Broad edemic) এবং
(চ) অপ্রশস্ত দেশীয় (Narrow endemic)।

২.৬.২. বনানীর পুষ্পল উদ্ভিদ অঞ্চল (Floristic region) : বিভিন্ন বাগানে যেসব বনানী জন্মে থাকে সেগুলোকে আদি বনানী হিসেবে ধরা হলেও সেগুলো আদৌ স্থানীয় আদি বনানী নয়। অন্যদিকে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি নির্দিষ্ট এলাকা যেমন দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কেবল লক্ষ্য করা যায়।

সত্যিকার অর্থে ভূ-পৃষ্ঠে ভিন্ন এবং স্ববৈশিষ্ট্যের বনানীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়াতে Myrtaceae গোত্রের ইউক্যালিপ্টাস্ বর্গের (Eucalyptus) উদ্ভিদ লক্ষণীয়। চিরসবুজ ইউক্যালিপ্টাস্ অস্ট্রেলিয়ার ভূ-দৃশ্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই গাছগুলো দক্ষিণের নাতিশীতোষ্ণ তাসমানিয়া এলাকা হতে উত্তরাংশের কুইন্সল্যান্ডের ক্রান্তীয় অরণ্য এবং উপকূলীয় সমভূমি হতে অস্ট্রেলীয় আলপ্স্ পর্বত পর্যন্ত বিদ্যমান।

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ গাম উদ্ভিদ (Gum trees-Red gums, blue gums, sugar gums, snow gums) বা মাল্যকার বল্কল গাছ (stringy barks or Jarrah and Karri) নামে পরিচিত। দশ ফুট (৩ মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট গাম ঝোপ হতে বিরাটাকার ভিকটোরিয়া ও টাসমানিয়ার ৩৭৫ ফুট (১১৫ মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট গাম গাছ বিদ্যমান। *Eucalyptus amygdalina* ৪৮০ ফুট (১৪৫ মিটার) উচ্চতা (পৃথিবীর সর্বোচ্চ গাছ) পর্যন্ত পৌঁছে।

সুতরাং এটা প্রতীয়মান যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এলাকায় স্ববৈশিষ্ট্যের বনানী বিদ্যমান এবং এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদ ভূগোলবিদ উদ্ভিদ বা পুষ্পল বনানী অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করে থাকেন। বিজ্ঞানী এম. আই. নিউবিগিন (মানচিত্র ৩.অ) এবং পরবর্তীকালে আর. ডি. গুড (মানচিত্র ৩.আ) প্রধান প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চলে পৃথিবীকে বিভক্ত করেছেন।

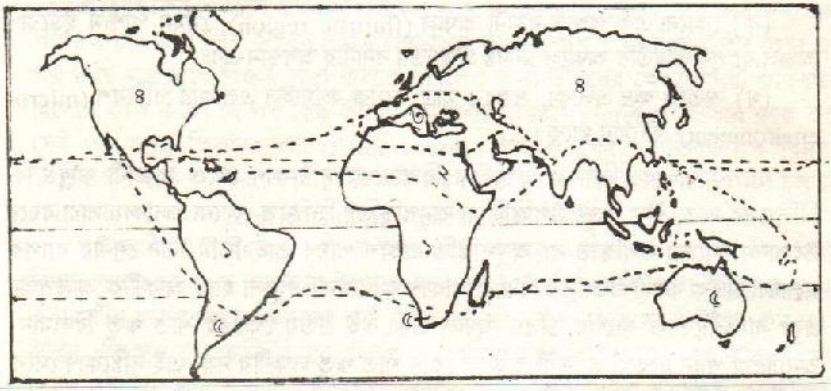

মানচিত্র ৩. অ : নিউবিগিন প্রদত্ত প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চল। ১. আন্তঃক্রান্তীয় ; ২. কেন্দ্রিয় আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ এলাকা, কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণে আফ্রিকার প্রায় সকল অংশ, ভারত, বাংলাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপ্রান্ত ; ৩. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা বলয় ; ৪. উত্তরের স্থলভাগ এবং ৫. দক্ষিণ মহাদেশগুলোর দক্ষিণাংশ।

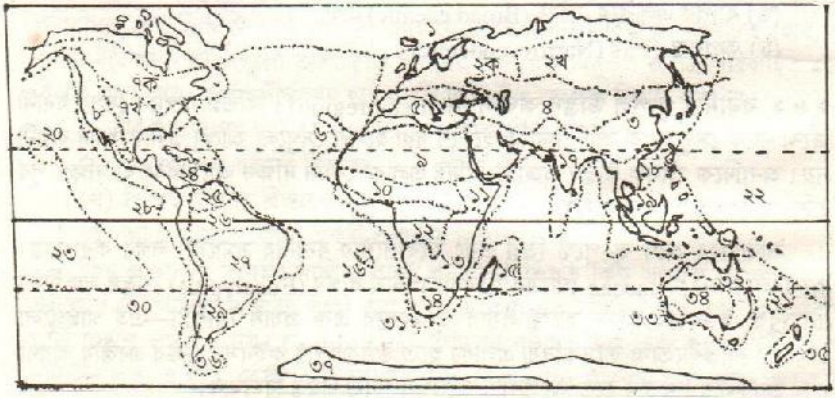

মানচিত্র ৩.আ : পুষ্পাপদ বৃক্ষ অঞ্চল (গুড এর দৃষ্টিকোণ থেকে)। ১. আর্কটিক ও উপ-আর্কটিক ; ২. ইউরো-সাইবেরীয় : ক. ইউরোপ, খ. এশিয়া ; ৩. টৈনিক-জাপানীজ ; ৪. পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় এশিয়া-মহাদেশীয় ; ৫. ভূমধ্যসাগরীয় ; ৬. মাইক্রোনেশিয়ান ; ৭. আটলান্টিক উত্তর আমেরিকা মহাদেশীয় : ক. উত্তরাংশ, খ. দক্ষিণাংশ ; ৮. প্রশান্ত-উত্তর আমেরিকা-মহাদেশীয় ; ৯. আফ্রিকীয়-ভারতীয় মরুভূমি ; ১০. সুদানীয় পার্ক স্টেপ ; ১১. উত্তর-পূর্ব আফ্রিকীয় উচ্চভূমি ; ১২. পশ্চিম আফ্রিকীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য ; ১৩. পূর্ব-আফ্রিকীয় স্টেপ ; ১৪. দক্ষিণ আফ্রিকীয় ; ১৫. মালাগাছি ; ১৬. অ্যাসেনসন সেন্ট হেলেনা ; ১৭. ভারতীয় ; ১৮. মহাদেশীয় দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া ; ১৯. মালয়েশীয় ; ২০. হাওয়াইয়ান ; ২১. নিউ-ক্যালেডোনিয়া, ২২. সেলানেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়া ; ২৩. পলিনেশিয়া ; ২৪. ক্যারিবীয় ; ২৫. ভেনুজুয়েলাও গায়ানা ; ২৬. আমাজান, ২৭. দক্ষিণ ব্রাজিলীয় ; ২৮. অ্যান্দীয় ; ২৯. পাম্পা ; ৩০. জুয়ানফার্নানডেজ ; ৩১. কেপ ; ৩২. উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলীয় ; ৩৩ দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলীয় ; ৩৪. কেন্দ্রীয় অস্ট্রেলীয় ; ৩৫. নিউজিল্যান্ড ; ৩৬. প্যাটাগনিয়া ; ৩৭. নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপসমূহ।

ক) সমগ্র ক্রান্তীয় (Pantropic) বা আন্তঃক্রান্তীয় অঞ্চল—এই অঞ্চল ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ অন্তর্ভুক্ত করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়ে মেক্সিকোর পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ অংশ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র অংশ, আফ্রিকার কেন্দ্রীয় অংশ (উত্তর সীমা হচ্ছে কর্কটক্রান্তি রেখা), ভারতের অধিকাংশ এলাকা, বাংলাদেশ, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের প্রান্তভাগ এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

খ) উত্তরের প্রত্নক্রান্তীয় (Paleotropical) : মরু অঞ্চলের অন্তর্গত এলাকা হচ্ছে উত্তর আফ্রিকা, আরব এবং পাক ভারতের মরুভূমি অঞ্চল।

গ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল : ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রীয় এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণে সাহারার উত্তরাংশ এবং পূর্বে পারস্যের অধিকাংশ এলাকা এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) হোলার্কটিক বা উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (Holartic or North Temperate region) : উত্তর গোলার্ধের এক ব্যাপক বলয়, কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরের সম্পূর্ণ উত্তর আমেরিকা এবং আলপাইন–হিমালয় পর্বতের উত্তরের সম্পূর্ণ ইউরেশিয়া মহাদেশীয় এলাকা অঞ্চলটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ঙ) অস্ট্রেলীয় অঞ্চল (Austral region) : প্রায় সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্গত।

বিজ্ঞানী গুডের উদ্ভিদ অঞ্চল উপরে বর্ণিত অঞ্চলগুলো হতে কিছু পার্থক্য প্রকাশ করে। কারণ এই অঞ্চলগুলোর সাদৃশ্য প্রাণী ভূগোলবিদগণের প্রাণী অঞ্চলের সাথে বিদ্যমান (মানচিত্র ৩.আ)।

ক) বোরিল : পূর্বে বর্ণিত উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনুরূপ অঞ্চল ; কিন্তু পরে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা অঞ্চলটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

খ) প্রত্নক্রান্তীয় (Paleotropical) অঞ্চলকে তিন উপভাগ (অ) আফ্রিকীয় (আ) ভারত–মালেশীয় (indo-malaysian) (ই) পলিনেশিয়ান (polynesian) উপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

গ) আধুনিক বা নতুন ক্রান্তীয় (Neotropical) : কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সকল অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণের প্রান্ত এলাকা অঞ্চলটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকীয় অঞ্চল অন্তরীপ (cape) এলাকা ও কালাহারি মরুভূমি নিয়ে গঠিত।

ঙ) অস্ট্রেলীয় ও টাসমানিয়া দ্বারা অস্ট্রেলীয় অঞ্চল গঠিত।

চ) অ্যান্টার্কটিক অঞ্চল : নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত এবং দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপসমূহ এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই দুই শ্রেণিবিভাগের স্কিমের মধ্যে প্রায় মিল লক্ষ্য করা যায়। ব্যতিক্রম হচ্ছে সংক্রমণগত অঞ্চল হিসেবে ভূমধ্যসাগরীয় মরু অঞ্চল এবং দক্ষিণ আফ্রিকীয় অঞ্চল। দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলোর দক্ষিণ প্রান্তের অংশগুলো একত্রে একই উদ্ভিদ অঞ্চল অথবা পৃথক উদ্ভিদ অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। এই অঞ্চলে যুক্তিও উপস্থাপন করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকীয় অঞ্চলকে পৃথক উদ্ভিদ অঞ্চলে প্রকাশ করেছেন এবং ওডামের এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার (ইউনিয়ন অফ সাইথ আফ্রিকা) অতি প্রাচুর্যপূর্ণ বনানীর (exceotionally rich flora) সমাবেশ লক্ষণীয়। প্রায় ১,৫০০ উদ্ভিদবর্গের মধ্যে ৩০% উদ্ভিদ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এগুলো অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আমেরিকা হতে বহু দূরে অবস্থিত এবং এলাকা দুটিতে ভিন্নধর্মী স্থানীয় বনানী বিদ্যমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত এলাকাগুলোকে পৃথক বনানী অঞ্চল বলেও গণ্য করা যায়। আফ্রিকা হতে বহুপূর্বে মালাগাছির (মাদাগাস্কার) পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে স্পষ্ট বনানীর (এবং প্রাণীর) পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য এই এলাকাকে এক পৃথক উদ্ভিদ অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা যায়—যদিও একে আফ্রিকার উপ-অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক বনানীর শ্রেণিবিভাগ ও বিস্তারণ

৪.০. বনানীর শ্রেণিবিভাগ

ভূগোলবিদগণ দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃতিক বনানীর বিবরণ ও শ্রেণীগুলোর আঞ্চলিক সীমা মানচিত্রে প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু আধুনিক জীব ভূগোলবিদগণ বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বনানী "কখন", "কেন", "কিভাবে" এবং "কোথায়" উৎপত্তি লাভ করেছে এবং টিকে আছে তা জানার চেষ্টা করেন। বনানী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের গুরুত্বের বিষয়টি আমেরিকার ভূগোলবিদ ফিলিপ এল. ওয়েগনারের ভাষায় স্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

> ভূগোলবিদগণের মতামত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তিন মৌলিক উপাদান হচ্ছে অভিজ্ঞতার অবিমিশ্র উপাত্ত ; এগুলো হতে জ্ঞান আহরণ এবং সূত্রবদ্ধ জ্ঞান বা তত্ত্ব নির্ধারণ। বনানী পাঠের বিষয় বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান নির্দেশ করে। ভৌগোলিকগণ বনানীকে জানতে চেষ্টা করেন। কারণ উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও এটি অঞ্চলের সীমারেখার নির্ধারক। ভূগোলবিদগণ তিন পন্থায় উদ্ভিদের জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকেন; প্রাকৃতিক পর্যায়ে : বনানী ও এর প্রজাতির সাথে পরিচিতি লাভ ; উদ্ভিদ ও এর প্রজাতির পাঠের পদ্ধতি—যার মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট অনুমিতিতে পৌছানো যায় এবং বনানীর ক্রমবিকাশ ও গতি বিজ্ঞানের স্থিতিশীল তাত্ত্বিক বোধগম্যতার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। পৃথিবীর সাধারণ স্পষ্ট জ্ঞানের জন্য ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ-আবরণ পরিচিতি প্রতি ভূগোলবিদদের জন্য আবশ্যক। জীব ভূগোলের বিশেষজ্ঞ হওয়ার ক্ষেত্রে বা জীব ভূগোলভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথিবীর উদ্ভিদ আবরণের জ্ঞান অপরিহার্য।[১]

প্রাকৃতিক বনানী বলতে সাধারণত কর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট নয় বরং প্রাকৃতিকভাবে, সৃষ্ট বনানীকে বোঝায়। এই শ্রেণীর বনানী পৃথিবীর পৃষ্ঠে আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। বাস্তবক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সত্যিকার অর্থে আদিম বা প্রাথমিক জন্মভিত্তিক বনানী নির্দেশ করে না। প্রায় ক্ষেত্রে এগুলো নতুন বা দ্বিতীয় প্রজন্মের বনানী এবং এগুলো আদি প্রজন্মের উদ্ভিদের সাথে কদাচিৎ সাদৃশ্য বহন করে। দ্বিতীয় প্রজন্মের উদ্ভিদ আদি বনানী পরিষ্কারকরণ এবং চাষের মাধ্যমে সৃষ্ট। ক্রান্তীয় অরণ্য অঞ্চলেব অনেক স্থানের অরণ্য পরিষ্কার করে ২/৩ বছর কর্ষণ করার পর মৃত্তিকা অনুর্বর (exhausted) হয়ে পড়লে স্থানগুলো কর্ষণ পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যক্ত স্থানগুলো অরণ্যের পরিবর্তে দ্রুত বন্য ঝোপ শ্রেণীর বনানী পরিবর্তিত হয়। মৌসুমী অরণ্য অঞ্চলও পরিষ্করণের পর পরিত্যক্ত অবস্থায় আদি অরণ্যের পরিবর্তে বাঁশ ঝাড় বা জঙ্গলে পরিবর্তিত হয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, বর্ণিত

১. Robinson, H. (1972) : Biogeography, p. 205

পর্যায়ের বনানীকে সত্যিকার প্রাকৃতিক বনানী হিসেবে গণ্য করা যায় না। বিজ্ঞানী ডি.এল. লিনটন প্রাকৃতিক বনানী হিসেবে সেসব এলাকার বনানীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে এলাকায় উদ্ভিদ পরিষ্কার করার পর বহু সময় পর্যন্ত এলাকাগুলোর বনানী নিরুপদ্রব অবস্থায় থেকেছে। মানুষ তার বহুবিধ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর স্থলভাগের বহু এলাকার প্রাকৃতিক বনানী তড়িৎ গতিতে পরিবর্তন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক বনানী শব্দ সর্বজনস্বীকৃত না হলেও এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী লিনটনের মত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক বনানী বর্তমানে সীমিত অঞ্চলে বিদ্যমান। আমাজানিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যের অপ্রবেশ্য মধ্যাঞ্চল, কানাডা ও সাইবেরিয়ার পর্ণমোচী বনের অনেক অংশ সম্ভবত প্রাকৃতিক বনানীর পর্যায়ে পড়ে। উপ-আর্কটিক তুন্দ্রা এবং মরু গুল্মও সম্ভবত মানুষ এবং প্রাণীর সাহায্যে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমির ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী মত লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, মোটামুটিভাবে এগুলো প্রাকৃতিক (যদিও অনেক এলাকার বনানী মানুষ অথবা প্রাণীর সাহায্যে পরিবর্তিত হয়েছে)। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন যে, অঞ্চলগুলো আদিতে গাছ দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল এবং এই গাছগুলো পরবর্তীতে আগুন, প্রাণী, মানুষ প্রভৃতির সাহায্যে রূপান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের বনানী, ঘাস জন্মলাভ করেছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে দীর্ঘকাল ভিত্তিক মানুষের বসবাস অঞ্চল, যেমন—ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার প্রাকৃতিক বনানী নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলগুলোর উদ্ভিদসহ ভূদৃশ্য হচ্ছে মানুষ দিয়ে সৃষ্ট।

বনানীর প্রকার—অরণ্য, তৃণভূমি বা মরুভূমি জলবায়ুগত নিয়ামক জলীয় পদার্থের পরিমাণ বা ঋতুভিত্তিক আপতন (incidence) সাহায্যে নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে উদ্ভিদকুল যেমন প্রশস্ত পাতাবহুল গাছের অরণ্য পর্ণমোচী অরণ্য, সাভানা, স্টেপ প্রভৃতি তাপের সাহায্যে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত বৃহৎ এলাকাভিত্তিক বনানী সমষ্টি (great plant formation)—অরণ্য, তৃণ এবং ঝোপের সৃষ্টি করে এবং এই বনানী গঠন বৃহৎ এলাকায় তাপের তারতম্যের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন এলাকার বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদকুলের সৃষ্টি করেছে।

প্রতি মহাদেশেই তিন বৃহৎ বনানী ফরমেশেন প্রকাশ পেলেও শুধু এর বিকাশ লক্ষণীয়। প্রতি ফরমেশনে বনানীর প্রকার ও প্রজাতির সুস্পষ্ট সম্প্রদায় প্রকাশ পায়। যেমন অরণ্যের ক্ষেত্রে ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ শীতল অরণ্য এবং এগুলোর আবার উপভাগ নির্দেশ করে। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ শ্রেণীর তৃণভূমি এবং এগুলোর আবার উপভাগ সমগ্র তৃণভূমির প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাকৃতিক বনানী জলবায়ুর অবস্থার প্রতিফলন হলেও মৃত্তিকা, ঢাল এবং পানি নিষ্কাশনও বনানীর উপর প্রভাব বিস্তার করে বনানী শ্রেণীর পরিবর্তন আনে। আবার মানুষ এবং প্রাণীর দ্বারা স্পষ্ট প্রতিবন্ধক যেমন—উদ্ভিদভূমি পরিষ্করণ, বনানী পোড়ানো, ভূমির পানি নিষ্কাশন অতি পশুচারণ প্রভৃতি সম্ভবত ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক এলাকায় প্রাকৃতিক বনানীর উপর প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার প্রয়োজনে নতুন বনানী অনেক এলাকায় অভিযোজনও করেছে।

সাধারণ দৃশ্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বনানীর শ্রেণিবিভাগ, অরণ্য, তৃণ ও মরু বনানী উপস্থাপন করা যায় (চিত্র ৪.১, মানচিত্র ৪.অ)। তিন শ্রেণীর অরণ্য হচ্ছে (ক) শীতল অরণ্য (খ) নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য এবং (গ) ক্রান্তীয় অরণ্য।

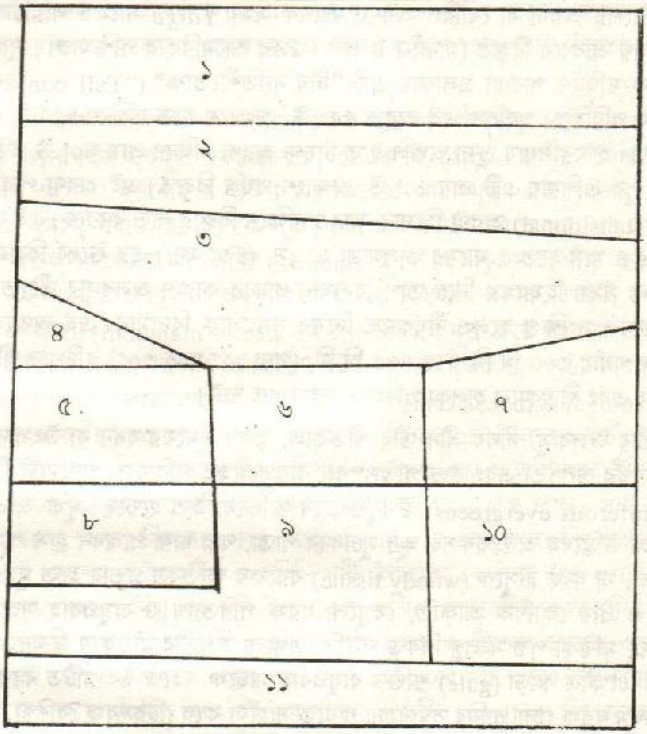

চিত্র ৪.১ : অরণ্য। ১. চিরতুষার ২. তুন্দ্রা ৩. সরলবর্গীয় অরণ্য ৪. পাতাঝরা অরণ্য ৫. চিরসবুজ বৃহৎ পত্রযুক্ত অরণ্য ৬. স্টেপ ৭. পাতাঝরা সমৃদ্ধ অরণ্য ৮. মরুভূমি ৯. স্যাভানা ১০. উষ্ণ আর্দ্র চিরসবুজ এবং পাতাঝরা অরণ্য ১১. নিরক্ষীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য

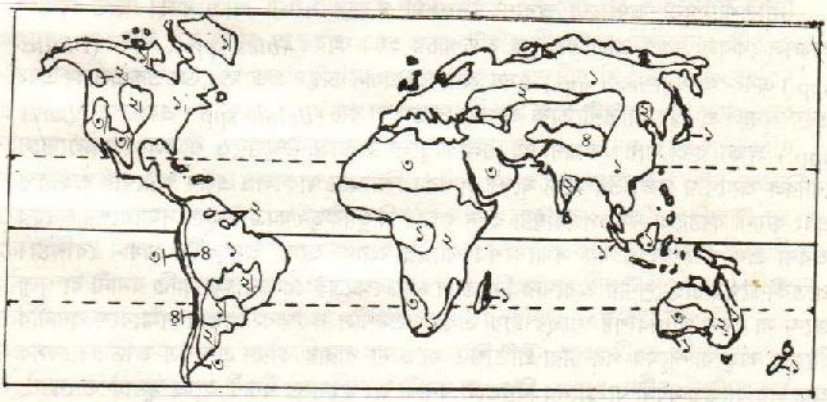

মানচিত্র ৪.অ : অরণ্য, তৃণভূমি ও মরুভূমির বিস্তারণ। ১. অরণ্য ২. তৃণভূমি ৩. মরুভূমি ৪. তুন্দ্রা ও পর্বত

উত্তরাংশের অরণ্য বা বোরিল অরণ্য, অনেক সময় *Taiga* নামেও পরিচিত, উত্তর গোলার্ধে বলয় আকারে বিস্তৃত (মানচিত্র ৪.আ)। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশ ; সুমেরু বৃত্ত হতে অনেক দক্ষিণে পার্বত্য এলাকায় এটি "দীর্ঘ নাতিশীতোষ্ণ" ("Tall coniferous") অরণ্য নামে পরিচিত। পূর্বাংশে এই অরণ্য ৫৫° উ. অক্ষাংশ হতে দক্ষিণে ৪৫° উ. অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরেশিয়ায় তুন্দ্রা অঞ্চল হতে টায়গা অরণ্য দক্ষিণে প্রায় ৬০° উ. ইউরোপীয় অংশ এবং পূর্ব-এশিয়ায় এটি প্রায় ৫০° উ. অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অরণ্য পার্বত্য এবং সক্রমণগত (tansitional) অরণ্য হিসেবে আরও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করেছে। এই বনাঞ্চলে বছরের মাত্র ৪ মাস হতে ৫ মাসের তাপমাত্রা ৬° সে. (৪৩° ফা.) এর উর্ধ্বে বিরাজ করে। বছরের অন্য সময় হিমাঙ্কের নিচে তাপ বিদ্যমান থাকার কারণে জলবায়ুর তীব্রতা প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকাল সংক্ষিপ্ত হলেও দীর্ঘকালে দিনের সূর্যালোক বিদ্যমান। এই অঞ্চলে নগণ্য থেকে মধ্যম পর্যায় ৩০০ মি.মি. হতে ৭৫০ মি.মি. (প্রায় ১২" হতে ৩০") বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে সংঘটিত হয় এবং শীতকালে হালকা পরিমাণে বরফপাত ঘটে।

এই তীব্র জলবায়ু, দীর্ঘকালীন তীব্র শীতকাল, স্বল্প সময়ের বর্ধন বা উৎপাদন ঋতু, জলীয় পদার্থের স্বল্পতা এবং উচ্চ গতিসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহের পরিবেশে পর্ণমোচী চিরসবুজ উদ্ভিদ (coniferous evergreens) উপযুক্তভাবে অভিযোজিত হয়েছে। মুখ্য অভিযোজন প্রক্রিয়া হচ্ছে উদ্ভিদের অন্তঃত্বকসহ ক্ষুদ্র সুচাকার পাতা, যার দ্বারা প্রস্বেদন হ্রাস পায় ; পুরু লাক্ষিক ছাল, যা কাষ্ঠ টিসুকে (woody tissue) বরফের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত রাখে ; ঘনবিন্যস্ত ও প্রায় কৌণিক আকৃতি, যেগুলো বরফ পরিত্যাগ ও বায়ুপ্রবাহ সহ্য করতে সাহায্য করে, মৃত্তিকা পৃষ্ঠ সংলগ্ন শিকড় পদ্ধতি, এগুলো অগভীর মৃত্তিকায় জন্মাতে সাহায্য করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঝড়ো (gale) শক্তির বায়ুপ্রবাহ গাছকে সহজে উৎপাটিত করে ও পৃষ্ঠ এলাকার প্রথম বরফ গলা পানির সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করে ; চিরসবুজ বৈশিষ্ট্য, উষ্ণতর আবহাওয়ার দিন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণ কার্যক্রম আরম্ভ করে এবং মোচাকার বীজের (seeding by means of cones—যা ফলের মতো তাড়াতাড়ি পচনক্রিয়ার আওতায় আসে না) অঙ্কুরোদগম।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অরণ্যে ভিন্নধর্মী গাছের সংখ্যা অতি কম। অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কেবল একই প্রজাতির বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। ফার (*Abies* spp.), পাইন (*Pinius* spp.) এবং স্প্রুস (*Pieca* spp.) এসব অরণ্যের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি। উচ্চতর এলাকা এবং তুন্দ্রা অঞ্চল প্রান্তের নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যে পাতাঝরা বার্চ (*Belula* spp.) এবং লার্চ (*Larix* spp.) লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই এলাকাগুলো অত্যন্ত উন্মুক্ত ও শীতল। অঞ্চলভেদে বোরিল অরণ্যের প্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও এসব অরণ্যের বাহ্যরূপ এবং বনানী কাঠামো সমরূপ বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত সমাবেশের গাছের অরণ্য প্রকাশ পেলেও ঘন সমাবেশের গাছের অরণ্য হচ্ছে অঞ্চলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিকীরূপের এই শ্রেণীর অরণ্যের নিম্নতলে প্রায় ক্ষেত্রেই কোনো ক্ষুদ্রাকৃতি বনানী বা গুল্ম জন্মে না। ঘন সন্নিবিশিষ্ট গাছের ছায়া এবং পতনশীল কাক্ষিক পাতার সমাবেশে বনানীর বীজের অঙ্কুরোদগমের পর চারা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার কারণ এক্ষেত্রে জড়িত। যেসব অরণ্যের ব্যতিক্রমধর্মী বা স্থানের নিম্নতলে বনানী জন্মে সেসব বনানী হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি ঝোপ, শেওলা এবং ছত্রাক। নিম্নতলের বনানীর ঘনত্ব অরণ্যের গাছের প্রজাতির উপর নির্ভর করে।

যেমন নরওয়ে স্প্রুস ও জাপানিজ লার্চের অরণ্যে অন্য শ্রেণীর গাছের অরণ্য অপেক্ষা পূর্ববর্ণিত গাছের ছায়ার সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা প্রকাশ পায়। তাই নিম্নতলে কোনো বনানী জন্মে না।

ইউরো–এশিয়ান ফরমেশন স্ক্যানডেনেভিয়ার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হতে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত প্রায় ৮,০০০ কি.মি. (৫,০০০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়ার অংশ অপেক্ষা ইউরোপের অরণ্য অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ। এই বিস্তীর্ণ এলাকার নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যে প্রধান পাঁচ শ্রেণীর—(ক) ফেন্নো স্ক্যানডিয়ান অরণ্য (খ) লার্চ ফার অরণ্য (গ) পশ্চিম সাইবেরীয় জলাভূমির (swamp) অরণ্য (ঘ) পূর্ব সাইবেরীয় অরণ্য এবং (ঙ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় অরণ্যের সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অনেক বিজ্ঞানী ষষ্ঠ শ্রেণী হিসেবে পর্বত–অরণ্য (mountain forest) এই শ্রেণিবিভাগে যুক্ত করে থাকেন। এই পর্বত শ্রেণীর নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য আল্পস ও কেন্দ্রীয় ইউরোপ এবং ককেসাস ও টা–খিনগান সান পর্বতগুলোতে বিদ্যমান। ফেন্নো–স্ক্যানভিয়ান অঞ্চলে (Fenno-Scandian region) স্কটস্ পাইন এবং নরওয়েজীয় স্প্রুসের প্রাধান্য বিদ্যমান। ফিনল্যান্ডে সিলভার বার্চ *(Betula pendula)* প্রায়শই লক্ষণীয়। ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশ এবং সাইবেরিয়ার ইনিসি নদী উপত্যাকার অধিকাংশ এলাকায় লার্চ–ফার অরণ্য বিদ্যমান। প্রধান গাছ হচ্ছে—সাইবেরিয়ান ফার, সাইবেরিয়ান স্প্রুস, সিলভার ফার, সাইবেরিয়ান লার্চ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি সাইবেরিয়ান পাইন। এই দুই অংশের (ইউরোপীয় ও ইনিসি নদী উপত্যকা কেন্দ্রিকা লার্চ–ফার অরণ্য) মধ্যবর্তী এলাকা, মধ্য ও নিম্ন ওব নদী উপত্যকায় পশ্চিম সাইবেরীয় জলাভূমির অরণ্য বিদ্যমান। অঞ্চলটি সমতল এবং নিচু। এজন্য শেষ বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ওব নদীর প্লাবিত পানি এই ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভ করে জলাভূমির সৃষ্টি করে। এই কারণে এটি জলাভূমির অরণ্য নামে পরিচিত এবং এই অরণ্যে ঘন ও জটিল (tangled) নিচুস্তরের বনানী বিদ্যমান। এই অরণ্যে লার্চ কদাচিৎ লক্ষণীয় এবং সাইবেরীয় ফার–এর প্রাধান্য বিদ্যমান। পানি প্রবাহ পথ প্রান্তে পাতাঝরা গাছ যেমন—অ্যাসপেন (aspen), বার্চসহ অ্যালডার, পপলার (poplars) এবং জলজ গুল্ম (willows) লক্ষ্য করা যায়।

ইনিসি নদীর পূর্ব প্রান্ত হতে স্ট্যানোভই পর্বত পর্যন্ত এলাকায় পূর্ব–সাইবেরীয় অরণ্য বিদ্যমান। অঞ্চলটি উচ্চভূমির অন্তর্গত এবং এখানে তীব্র শীতকাল বিদ্যমান। তীব্র ও দীর্ঘকালীন শীতকাল বনানীর ক্রমবিকাশকে ব্যাহত করে। অগভীর শিকড়বিশিষ্ট ডাহুরিন লার্চ (dahurin larch) অরণ্যের সকল অংশে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এই গাছগুলোর পাতাঝরা বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করতে সাহায্য করে। অনেক স্থানে সাইবেরীয় ফার, স্কট পাইন এবং স্টোন পাইন (*Pines oceanibra* যা অনেক সময় সাইবেরীয় সেডার নামে পরিচিত) লক্ষ্য করা যায়। এই অরণ্যে অতি নগণ্য নিম্নতলের বনানী বিদ্যমান। দূর প্রাচ্যের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অরণ্য মহাদেশীয় প্রান্ত, উত্তরে কামচাটকা হতে দক্ষিণে সিখোটি অ্যালিন পর্বতমালা এবং সমুদ্র তীরাতিক্রান্ত সাখালিন ও হোক্কাইডো দ্বীপে বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষসহ এই সরলবর্গীয় অরণ্যে বনানীর প্রাচুর্যতম বৈশিষ্ট্য বহন করে। ডাহুরিন লার্চ বহুল সংখ্যায় বিদ্যমান এবং সাইবেরিয়ান ফার ও স্টোন পাইন অরণ্যটিতে অতি সাধারণ গাছ হিসেবে চিহ্নিত। সেখোটি অ্যালিন পর্বতমালা এবং আমুর নদীর উত্তরাংশের পর্বতগুলোতে পাতাঝরা গাছ যেমন—ওক, এলম, মেপল, লাইম, ওয়ালনাট এবং বন্য

আপেল গাছে লক্ষণীয়। দক্ষিণের অক্ষাংশ অঞ্চলীয় উচ্চভূমি, আল্পস, ককেশাস ও খিনগানে ফার, পাইন ও লার্চসহ স্প্রুস গাছের সরলবর্গীয় বন বিদ্যমান। নিম্ন উচ্চতায় ওক, চেস্টনাট ও বার্চসহ নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা বন লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর আমেরিকার বোরিল অরণ্যের সাথে ইউরোপীয় বোরিল অরণ্যের মিল থাকলেও দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য, প্রথমত উত্তর আমেরিকীয় অরণ্যে বহু প্রজাতির গাছ লক্ষ্য করা যায় এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকান উদ্ভিদ ফরমেশনের প্রধান উদ্ভিদ (dominants) এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় ব্যাপক পার্থক্য নির্দেশ করে। এই অরণ্য ফরমেশনে উদ্ভিদের পর্যায়ক্রমিক পার্থক্য প্রকাশ পেলেও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এই অরণ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির গাছ হচ্ছে হোয়াইট স্প্রুস *(Picea glauca)* এই গাছ আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল হতে কানাডা হয়ে আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত। কুবেক ও অনটারিও প্রদেশ এবং নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডের অংশবিশেষ ও সামুদ্রিক প্রদেশগুলোর উত্তম পানি নিষ্কাশিত এলাকায় হোয়াইট পাইনের সহচর হিসেবে বালসাম ফার *(Abies balsamea)* বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত সিক্ত ও অনুর্বর মৃত্তিকায় জ্যাক পাইন *(Pinus banksiana)*, ব্ল্যাক স্প্রুস *(Picea mariana)* এবং ট্যামারাক *(Larix laricina)* প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। পূর্বাংশের এই প্রধান বৃক্ষগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাস পেয়ে পশ্চিম দিকে উত্তর ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও আলাস্কায় অ্যালপাইন ফার *(Abies lasiocarpa)* এবং লজপোল পাইন *(P. contorta)* এর আগমন ঘটেছে। এসব অরণ্যের তলে মাঝে মাঝে জলজ গুল্ম এবং বার্চ প্রকাশ পায়। যেসব অরণ্য এলাকা আগুন দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেসব এলাকায় বহুল সংখ্যায় অ্যাসপেনের (*Populus* spp.) দণ্ড বিদ্যমান। এই অরণ্যের প্রশস্ত পাতার গাছগুলো হচ্ছে ক্যানো বার্চ *(Betula papyrifera)*, বালসাম পপলার *(Poplus balsamifera)* এবং কোয়েকিং অ্যাসপেন (*Populus tremuloides*)।

পার্বত্য পর্ণমোচী বনভূমির উচ্চতা, বিশেষ করে পর্বতের উচ্চ এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পার্বত্য এলাকায় বলয় আকারে বনানীর সমাবেশ প্রকাশ পায়। পার্বত্য এলাকায় উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তাপের হ্রাস, দিকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত, ঊর্ধ্বমাত্রার আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও অধিক উন্মুক্ততা (greater exposure) ছাড়াও খাড়া ঢালে পাথর মিশ্রিত অপরিণত অগভীর মৃত্তিকা প্রকাশ পায়। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে পাতাঝরা প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মলাভ করে না। কিন্তু অগভীর শিকড়বিশিষ্ট সরলবর্গীয় ঘন সন্নিবিশিষ্ট গাছ জন্মলাভে পরিবেশটি সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পার্বত্য সরলবর্গীয় বনে টায়াগা অরণ্যের অনুরূপ স্বল্প সংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতি বিদ্যমান।

উত্তর আমেরিকায় পার্বত্য সরলবর্গীয় অরণ্য উত্তমাকারে বিকাশ লাভ করেছে। এখানকার বৃহৎ সমান্তরাল পর্বত শ্রেণীর (Cordillera) মাধ্যমে সরলবর্গীয় অরণ্য দক্ষিণে ককটিক্রান্তি রেখা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এক্ষেত্রে কয়েক গোত্রের উদ্ভিদসহ দুই স্পষ্ট অরণ্যের ফরমেশনের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি উপকূল অরণ্য এবং দ্বিতীয়টি পার্বত্য অরণ্য নামে পরিচিত। উপকূল অরণ্য আলাস্কার উপকূল অঞ্চল, প্রায় ৬০° অক্ষাংশ হতে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কা এবং উত্তর ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মৃদু শীতল ও আর্দ্র অবস্থায় সিটকা স্প্রুসের অরণ্য বিকাশ লাভ করেছে। দক্ষিণে, দক্ষিণ ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওয়াশিংটন ও ওরিগনের উপকূল অরণ্যে বৃহৎ চার শ্রেণীর গাছ পশ্চিমাংশের

হেমলক *(Tsunga heterophylla)*, পশ্চিমাংশের সেডার *(Thuja plicata)*, গ্র্যান ফার *(Abies grandis)* এবং অতি পরিচিত ডগলাস ফার *(Pseudotsuga taxifolia)* এর প্রাধান্য বিদ্যমান। এই সকল গাছের উচ্চতা ৪৫ মিটার হতে ৬০ মিটার (১৫০ হতে ২০০) কিন্তু ডগলাস ফারের উচ্চতা ৯০ মিটার (৩০০) পর্যন্ত দাঁড়ায়। অধিক বৃষ্টিপাত, উপকূলীয় কুয়াশা এবং উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা এই বৃহৎ গাছগুলোর বিকাশ লাভে সহায়তা করে। আরও দক্ষিণে এই বৃহৎ গাছগুলো অপেক্ষা উচ্চতর সিকুইয়া বিদ্যমান। ওরিগন ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে প্রকাণ্ড রেডউড *(Sequoia semeper virens)* লক্ষ্য করা যায় এবং গাছগুলো ৯০ মিটারের (৩০০) অধিক উচ্চতায় পৌঁছে। সিয়েরা নেভাডার পশ্চিম ঢালে সাধারণভাবে বৃহৎ বৃক্ষ নামে পরিচিত, *Sequoia semeper virens* বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ এলাকা, কাসকেড পর্বত শ্রেণী হতে অন্য উদ্ভিদ প্রজাতি হোয়াইট পাইন *(Pines monticola)* এবং পশ্চিমীয় লার্চের *(Larix occidentalis)* প্রাধান্য লক্ষণীয়। এই এলাকায় *(Pinus ponderosa)* এবং লজপোলও সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচরে পড়ে।

দ্বিতীয় পার্বত্য অরণ্যটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যাংশের ঢালে বিকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ এখানে বিদ্যমান এবং দক্ষিণে গাছের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউমেক্সিকো অঞ্চলের অনেক অংশে ২,৭০০ মিটার উচ্চতায় এই অরণ্য বিদ্যমান। তিন প্রকার—হোয়াইট ফার, ডগলাস ফার এবং সুগার পাইন এলাকাটির প্রধান বৃক্ষ।

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে উত্তর আমেরিকার অনুরূপ পার্বত্য সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চল, পিরিনিজ আল্পস, কারপেথিয়ান, ডিনারিক, বলকানীয় পর্বত, ককেসস এবং হিমালয়ে বিদ্যমান। এসব অরণ্যে ফার, পাইন, ও স্প্রুস প্রজাতির গাছ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। পার্বত্য অরণ্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির স্তরবিন্যাস (stratification) লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাংশের পাইন বন শীতল অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বন নিউজারসি হতে টেক্সাসের পূর্বাংশ এবং অধিকাংশ উপকূলীয় সমভূমিতে বিদ্যমান। এই বনে কনিফারের কয়েক প্রজাতি, বিশেষ করে পাইন বিদ্যমান এবং এই পাইন বৃক্ষ দক্ষিণের ক্রান্তীয় এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। একই প্রজাতির বৃক্ষ সচরাচর লক্ষণীয় হলেও লবলবি পাইন *(Pinus laeds)*, সর্টলিফ পাইন *(P. echinata)*, লংলিফ পাইন *(P. palustris)* প্রভৃতি গাছও প্রকাশ পায়। এই বন এলাকায় অপরিণত বালি মৃত্তিকা বা নিম্ন এলাকার জলাভূমির মৃত্তিকা বিদ্যমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মন্তব্যে উপনীত হতে পারেন যে, এই ব্যাপক এলাকায় পাইন অরণ্যে জলবায়ুগত শীর্ষ পর্যায়ের গোত্রে পৌঁছেনি। এই মন্তব্য আরও সুদৃঢ় হওয়ার যুক্তি হতে পারে যে, অরণ্যটি এনক্লেভ আকারে উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণের উন্নততর পানি নিষ্কাশিত উর্বর মৃত্তিকায় প্রশস্ত পত্রবহুল বৃক্ষ, ওক, হিকরি ও চেস্টনাট প্রজাতির আদি অরণ্যের সাহায্যে পরিবেষ্টিত। উত্তর আমেরিকার পাতাঝরা গ্রীষ্মকালীন প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট অরণ্যের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে এখানকার জলবায়ু উপযুক্ত হলেও এই পাইন অরণ্য জলবায়ুজনিত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি। বালিময় কিছু পাইন অরণ্য প্লাগিও ক্লাইমাক্স পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ এই অরণ্যের অনেক অংশ মাঝে মাঝে পোড়ানো হয়েছে। বলা যায় দীর্ঘসময় ধরে মানুষের সাহায্যে কর্ষণ ও পোড়ানো কার্যক্রমের সাহায্যে এই অঞ্চলের অরণ্য প্রভাবিত হয়েছে।

৪.১. নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য

৪.১.১. নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্য : এই শ্রেণীর প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট পর্ণমোচী অরণ্য পর্ণমোচী গ্রীষ্মকালীন অরণ্য নামেও পরিচিত। যেসব অঞ্চলে ৭৫০ মি.মি. হতে ১,৫০০ মি.মি. (৩০" হতে ৬০") বৃষ্টিপাত বছরে সমভাবে বণ্টিত এবং জোরালো (emphatic) ঋতু পরিবর্তনের তাপসহ পরিমিত (moderate) তাপ বিদ্যমান থাকে সেসব অঞ্চলে বর্ণিত গাছের অরণ্য গড়ে উঠেছে (মানচিত্র ৪.আ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গাছের পাতাঝরা প্রারম্ভ শীত ঋতুতে আরম্ভ হয়। কারণ শীত ঋতুতে তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং বরফাবৃত ভূ-পৃষ্ঠ সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার কম তাপমাত্রা উদ্ভিদের শিকড়ের পানি শোষণ ক্ষমতাকে কমিয়ে ফেলে। ফলে শীতকালীন কম তাপমাত্রায় বনানীর শারীরবৃত্তীয় উষ্ণতা (physiological draught) সৃষ্টি হয়। ফলে শিকড় স্বল্প পরিমাণে মৃত্তিকার জলীয় পদার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায় মৃত্তিকা বরফাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদের পূর্ণমাত্রায় শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতার সৃষ্টি হয়। বৃক্ষ পাতা ঝরিয়ে ফেলার সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্বেদন কমিয়ে ফেলে। ফলে শীতকালে বৃক্ষ জলীয় পদার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

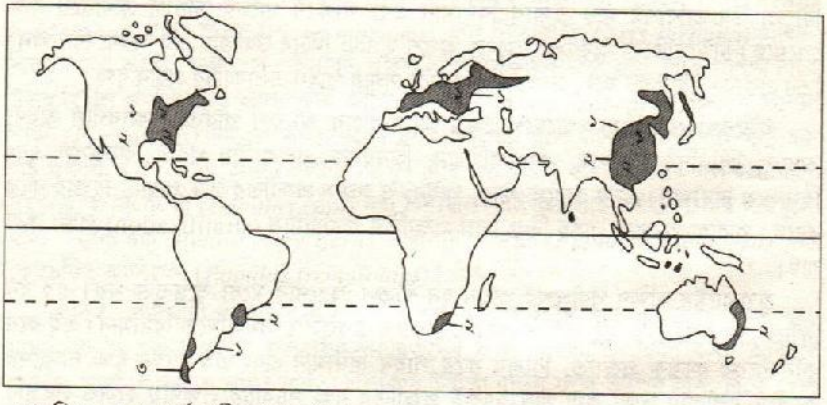

মানচিত্র ৪. আ. পর্ণমোচী বা পাতাঝরা অরণ্য

১ নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য, ২ উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ প্রশস্ত ও সূচাকার পাতার অরণ্য
৩ মৃদু নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র চিরসবুজ অরণ্য।

এই ঋতুতে উদ্ভিদের প্রাণরসে (sap) শর্করা বৃদ্ধি পায়। এই শর্করা মিশ্রিত প্রাণরস উদ্ভিদের কোষে পানি সরবরাহ করলেও প্রস্বেদন দ্বারা পানির হ্রাসকে এই রস বাধা দেয়। উদ্ভিদের এই পাতাঝরা আচরণ এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এর ফলে উদ্ভিদ জলীয় পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষতিকে কমিয়ে রাখে। অন্যথায় জলীয় পদার্থের সীমিত সরবরাহের সময় গাছ মৃত্যুবরণ করে থাকে। যখনই তাপ ৬° (৪৩° ফা.) এ বৃদ্ধি পায় তখনই গাছ ও গুল্মের সুপ্ত কিশলয়ে পাতা ও পুষ্প গজাতে শুরু করে। সচরাচর পাতা গজানোর পরে পুষ্প গজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পাতার কিশলয় উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বেই পুষ্প বিকশিত হয়। বনতলের গুল্ম ও লতাজাতীয় বনানীর স্তর আলো প্রাপ্তির জন্য উদ্ভিদের পাতা গজানোর পূর্বেই মুকুলিত হয়। পূর্বে মুকুলিত হওয়ার কারণে বায়ুপ্রবাহ পরাগায়ন করতে একদিকে যেমন সাহায্য করে

অন্যদিকে তেমনি বেরিজাতীয় অর্থাৎ বীজশূন্য বৈচিফল ও অন্যান্য ফল পরিবর্ধিত হওয়া ও পরিপক্ব হওয়ার জন্য দীর্ঘসময় পায়।

নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্যের পার্থক্য শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। শীতকালে গাছের পাতাগুলোর নিরাবরণ এবং বনতলের বনানীর মৃত্যুর চিত্র অরণ্যের কঙ্কালবৎ এবং মলিন ও বিষণ্ন দৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু অরণ্যের বসন্তকালীন তাজাভাব বা বনানীর শরৎকালীন বর্ণাঢ্য দৃশ্য অপূর্ব রূপ ধারণ করে। উন্মুক্ত অবস্থায় পাতাঝরা উদ্ভিদ ভূমির বৃক্ষের আকার গোলাকৃতি চূড়াসহ গ্লোব বা ব্যারেল আকৃতি ধারণ করে। এই পরিবেশের বৃক্ষের শাখা কাণ্ডের অনেক নিচু অংশে শুরু হয়। শাখাগুলো দীর্ঘাকৃতি ও ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভ করে এবং পত্রসমূহের ঘাঘরারূপের (skirt) কাঠামো প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে গাছের গুঁড়ি বা অশাখায়িত কাণ্ড সমগ্র গাছের তুলনায় ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ পায়। ঘন সন্নিবেশিত গাছের অরণ্যে গাছের উর্ধ্বদিকের বর্ধন বৃদ্ধি পায় এবং চূড়ায় পাতাগুলোর বেশি সমাবেশ ঘটে। এক্ষেত্রে শাখা উচ্চ এলাকায় বিকশিত হয়। ফলে গাছের গুঁড়ি দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে। প্রায় সকল পাতাঝরা বৃক্ষের অপেক্ষাকৃত মোটা ও বলিষ্ঠ ছাল বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ছাল তুষারের ক্ষতিকর প্রভাবের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে।

সাধারণত সকল পাতাঝরা অরণ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গাছ দেখা যায়। এই কারণে এগুলোকে মিশ্র পাতাঝরা বন বলা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এক বা দুই প্রজাতির উদ্ভিদের প্রাধান্যও লক্ষণীয়। নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্যের নিম্নতলে সুবিকশিত গুল্ম ও ঝোপের স্তর বিদ্যমান। কোনো কোনো অরণ্যে এই স্তর স্পষ্টভাবে প্রকাশ না পেলেও অনেক ক্ষেত্রে এই স্তরের সংখ্যা ৪ এ দাঁড়ায়। ভূমি পৃষ্ঠের স্তরে শেওলা ও লিভারওয়াট, এর উর্ধ্বে মিশ্র লতা-পাতাজাতীয় বনানী, ব্র্যাকেন অর্থাৎ পর্ণবিশেষ ও ঘাস ; এর পরবর্তী স্তর প্রায় ৪.৫ মি. (১৫′) উচ্চতাবিশিষ্ট গুল্ম যেমন হোলি ও ব্র্যামবল এবং শেষে বৃক্ষের সাহায্যে বিভিন্ন উচ্চতার স্তর প্রকাশ প্রায় এবং এই শেষের স্তর ৩০ মিটার (১০০′) উচ্চতা প্রায়শই অতিক্রম করে না। এসব অরণ্যের নিম্নস্তরের বনানী, অরণ্যটির উন্মুক্ত অবস্থা, প্রজাতি অনুযায়ী গাছের ছায়ার পরিমাণ এবং মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

অতীতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ব্যাপক অঞ্চলে প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট পাতাঝরা গাছের অরণ্য বিদ্যমান ছিল। এসব অরণ্যের মৃত্তিকা ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত হওয়ার কারণে দীর্ঘকালীন বসবাসরত মানুষ এই বৃক্ষভূমিগুলো পরিষ্কার করে ফসল চাষের ভূমিতে পরিণত করেছে। উত্তর গোলার্ধে প্রধান তিনটি নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা বৃক্ষের অরণ্য হচ্ছে —ইউরোপ, পূর্ব-উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়া। দক্ষিণ গোলার্ধে এই শ্রেণীর অরণ্য নেই বললেই চলে। আন্দিজ পর্বতমালার পূর্ব ঢালের ৪৩° দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে অতি ক্ষুদ্র এলাকায় এই শ্রেণীর অরণ্য বিদ্যমান।

৪.১.২. ইউরোপীয় নীতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্য : ইউরোপীয় নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্য আদিতে ৪২° উত্তর অক্ষাংশ হতে ৬১° উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বে ২৩° পূঃ দ্রাঘিমাংশ এলাকার পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় ইউরোপের অধিকাংশ নিম্নভূমি দখল করে বিরাজ করতো। ইউরোপীয় সমভূমির উত্তরে এই অরণ্য মিশ্র পাতাঝরা সরল বর্গীয় অরণ্যের সাথে মিশ্রিত

হয়েছে। পূর্বদিকে পাতাঝরা বনের দুই শাখা—এক শাখা দক্ষিণ পোলান্ড হতে পূর্ব-উত্তর পূর্ব মিশ্র পাতাঝরা-সরল বর্গীয় বনের দক্ষিণ দিক দিয়ে উরাল পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয়টি দানিউব পর্যন্ত অতিক্রম করে বলকান উপদ্বীপ এবং এক্ষেত্রে কৃষ্ণসাগরের ভগ্নাসহ ককেসাস পর্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে রয়েছে।

পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় ইউরোপের অরণ্যে পার্বত্য এবং অনুর্বর ও বালিময় মৃত্তিকা—এলাকার সরল বর্গীয় বৃক্ষ ছাড়া অন্য সকল এলাকায় প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট পাতাঝরা গাছ বিদ্যমান। ব্রিটেনে স্কট পাইন ও ইউ *(Texus baccata)* প্রজাতি এবং নিম্নভূমি অঞ্চলে পেনডানকুলেট ওকের *(Quercus robur)* প্রাধান্য লক্ষণীয়। চক ও চুনাপাথর অঞ্চলের হালকা ও শুষ্ক চুনো মৃত্তিকায় বিচ *(Fagus sylvatica)* ও অ্যাশ *(Fraxinus excelsion)* বিদ্যমান। দক্ষিণে এলম *(Ulmus spp.)* এবং লাইম *(Tilia cordata)* মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। ইংল্যান্ডে ফিনল্যান্ডের আর্দ্র এলাকায় আলডার এবং উইলো প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

ইউরোপের দক্ষিণাংশ-স্পেনের বিস্কে উপসাগরীয় নিম্নভূমি ও লম্বার্ডি সমভূমি এলাকায় নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বন বিদ্যমান। এখানকার সাধারণ উদ্ভিদ প্রজাতি হচ্ছে ওক। কিছু চেস্টনাট ও সিকামোর প্রজাতিও এসব বনে বিদ্যমান রয়েছে। আল্পস এবং সুইস মালভূমির নিম্ন ঢাল, ৩৬০ মিটার হতে ৯০০ মিটার (১,২০০ হতে ৩,০০০) উচ্চতায় বিচের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রীয় ইউরোপে হারসেনিয়ান উচ্চভূমি ১৮০ মিটার হতে ৬০০ মিটার উচ্চতায় বিচ অরণ্যের প্রধান উদ্ভিদ হিসেবে পরিগণিত। উচ্চভূমির মধ্যবর্তী পর্যন্ত ও নিম্নভূমিতে ওক বনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। উত্তর জার্মানি ও পোলান্ডের সমভূমির অপেক্ষাকৃত কম উর্বর, হালকা, এবং বালুময় মৃত্তিকা-এলাকায় ওক-বার্চ গোত্রের উদ্ভিদের অরণ্য প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এই এলাকার উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকায় বিচের বনাংশ বিদ্যমান। পূর্বদিকে বিচের প্রাধান্য কমতে থাকে এবং ভিসটুলা প্রাট নদী (vistula prut river) এলাকায় বিচ অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপের পাতাঝরা অরণ্যের বলয় কার্পেথিয়ান পর্বত হতে রুশীয় সমভূমির মধ্য দিয়ে উরাল পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের লোয়েস মৃত্তিকায় ওকের প্রাধান্য বিদ্যমান।

৪.১.৩. উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা উদ্ভিদ ফরমেশন : উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্য অ্যাপোলেসিয়ান এলাকা হতে পশ্চিম দিকে মিসিসিপি অতিক্রম করে দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের গ্রেট লেক অঞ্চলে মিশ্র বনভূমি ইকোটন (ecotone) হতে দক্ষিণ পূর্বে, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, আলাবামা এবং দক্ষিণ মিসিসিপির পাইন অরণ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই অরণ্য। এই অঞ্চলে ইউরোপীয় আদিবাসীদের বসতি স্থাপন এবং পরবর্তীতে মহাদেশটির অভ্যন্তর, উদ্ভিদ প্রজাতির দিক দিয়ে ইউরোপীয় অঞ্চল অপেক্ষা এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। ইউরোপে মাত্র এক ডজন বা অনুরূপ উদ্ভিদ প্রজাতি লক্ষণীয় হলেও আমেরিকায় উদ্ভিদ ফরমেশনে প্রজাতির সংখ্যা কয়েক ডজনে দাঁড়ায়। আমেরিকায় এই শ্রেণীর অরণ্য প্রজাতির দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হলেও

প্রজাতির বন্টনের দিক থেকে অরণ্যগুলোর মধ্যে বেশ সমতা বিদ্যমান। ওক এবং হিকরি উদ্ভিদ ফরমেশন সকল অঞ্চলে বিদ্যমান। কিন্তু বিচ, বাচ উড (*Tilia americana*) এবং ম্যাপল পূর্বাংশে ব্যাপক হারে বিদ্যমান। উপসেরি (subsere) এবং উপ-চরম পর্যায়ের প্রজাতি হিসেবে অ্যাশ ও বার্চ সর্বত্র বিদ্যমান।

আমেরিকান নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা অরণ্যে অনেক উদ্ভিদ ফরমেশন বিদ্যমান। বিজ্ঞানী ব্রউন এ ফরমেশনের নয়টি উপভাগ উপস্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরিপূর্ণ পর্যায়ের বন বিদ্যমান। এই উপভাগে দক্ষিণ পূর্বের চিরসবুজ বন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অনেকে এই অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন।

সামুদ্রিক প্রদেশ ও নিউ ইংল্যান্ড এবং গ্রেট লেক-এর দক্ষিণের সংযুক্ত বন ইকোটন সৃষ্টি করেছে। এই বনের বৃক্ষগুলো হচ্ছে বিচ ও বার্চ এবং বার্চসহ হেমলক ও হোয়াইট পাইন। অ্যাপালেসিয়ানের অনেক অঞ্চলে প্রাচীন অরণ্য এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এই অঞ্চলের উচ্চ এলাকা ও বালি মৃত্তিকা এলাকা ছাড়া ওক, বিচ, ম্যাপল, চেস্টনাট এবং ইয়োলো পপলারের প্রাধান্য লক্ষণীয়। পাদদেশীয় সমভূমি, শৈলশিলার কিছু উপত্যকা তল ও ঢাল, উপত্যকা এলাকা এবং অ্যাপালেসিয়ান মালভূমি এলাকার আদি বন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব এলাকার কর্ষণ পরিত্যাক্ত অংশে দ্বিতীয় প্রজন্মের বনের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ মিচিগান, ওহিও, ইলিনয়িস এবং ইন্ডিয়ানায় বিচ ও ম্যাপলসহ কিছু প্রজাতির গাছ যেমন—ওক, চেস্টনাট এবং টিউলিপ প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এই বিচ ম্যাপল অরণ্য সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী। দীর্ঘ গাছবিশিষ্ট এই অরণ্যের নিম্নতলের ক্ষুদ্রাকৃতি বৃক্ষ যেমন হর্নবিচ, ওয়াইল্ড চেরি, হথর্ন প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই অরণ্যে মাঝে মাঝে উর্বর ভূমিতে সমৃদ্ধ বনানীও লক্ষণীয়। এই বিচ ম্যাপল অরণ্য দক্ষিণের ওক-চেস্টনাট অরণ্যের সাথে মিশে গেছে। *Endothena parasitica* ছত্রাকের আক্রমণে চেস্টনাট গাছ প্রায় অবলুপ্তির পথে। মিসিসিপির পশ্চিমে এই অরণ্য ওক চেস্টনাট ওক হিকোরী বনের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। ওয়াসিটা উচ্চভূমির ঢাল ও ওজার্ক মালভূমিতে ব্যাপক আকারের অরণ্য বিদ্যমান। পাতাঝরা বনের বিস্তৃতি মিসিসিপি নদীর দক্ষিণের শাখানদী এলাকায়ও প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রেইরি অঞ্চলের সাথে ক্রমান্বয়ে এটি মিশ্রিত হয়েছে।

৪.২. পূর্ব-এশীয় ফারমেশন

পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা বনের ফরমেশন ধ্বংস হয়েছে। মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব প্রান্ত, কোরিয়া, উত্তর চীনের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, শানসি মালভূমির অধিকাংশ এলাকা, সানটাংস এবং হনসু দ্বীপের উত্তরের অর্ধাংশে এই অরণ্য বিদ্যমান ছিল। এই ব্যাপক অরণ্যের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু ক্ষুদ্র এলাকা ছাড়া সকল আদি অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাঞ্চুরিয়ার উচ্চভূমি ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ এই অরণ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্ব-মাঞ্চুরীয় পর্বত এবং গ্রেট ও লেসার খিনগান পর্বতে বর্তমানেও সমৃদ্ধশালী অরণ্য বিদ্যমান। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অরণ্যের প্রজাতির অনুরূপ ওক, অ্যাশ, এলম, বিচ, বার্চ, চেস্টনাট এবং ওয়ালনাট এই সকল অরণ্যে লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় বিচ (*Fagus crenata*) চমৎকার ও বিশাল অরণ্যের সৃষ্টি করেছে যেখানে অ্যাশ এবং বার্চও

সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রে হিকোরির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু টিউলিপ গাছ গণ *liriodendron* কেবল উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান।

উত্তর আমেরিকার বোরিল অরণ্য ও এশিয়ার বোরিল অরণ্য এবং উভয় ক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলদ্বয়ে অপ্রশস্ত পাতাঝরা অরণ্য বলয় আকারে বিদ্যমান। টায়গা অরণ্যের দক্ষিণদিকে সরলবর্গীয় গাছ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অ্যাসপেন, বার্চ এবং উইলো–এর প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে। এই সরু বলয়ের পাতাঝরা গাছের অরণ্য দক্ষিণে আর এক ক্ষুদ্রাঞ্চল, কুঞ্জবন বলয় (grove belt) বা বৃক্ষের স্টেপ (wooded steppe) অর্থাৎ উন্মুক্ত গাছসহ তৃণভূমির সৃষ্টি করেছে। কানাডার পাতাঝরা অরণ্য বলয়ে মোটামুটি সিক্ত অঞ্চলে বালাসাম পপলার এবং শুষ্ক অঞ্চলে অ্যাসপেনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এশিয়ার অনুরূপ বলয় ইউরাল পর্বত হতে নদী উপত্যকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পূর্বে বলয়াকারে ১২০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

৪.২.১. দক্ষিণ গোলার্ধ : দক্ষিণ আমেরিকার অতি সীমিত এলাকায় নাতিশীতোষ্ণ পাতাঝরা উদ্ভিদ ফরমেশন বিদ্যমান। আন্দিজ পর্বতমালার নিম্ন পূর্ব ঢালের টেরাডেল ফুয়েগো হতে প্রায় ৪৩° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এক সরু বলয়ে এই অরণ্য বিস্তার লাভ করে আছে। এখানকার প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি হচ্ছে বিচ (*Nathofagus* spp.)। এখানকার প্রায় সকল উদ্ভিদ প্রজাতি সবুজ বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু আন্দিজের শুষ্ক এলাকায় পাতাঝরা গাছের প্রজাতি বিদ্যমান। চিলির পাতাঝরা উদ্ভিদ ফরমেশনের প্রায় সকল প্রধান প্রজাতি হচ্ছে পাতাঝরা বিচ, বিশেষ করে নায়ার (*Nothofagus antarctica*), বায়ুপ্রবাহের প্রভাবমুক্ত এলাকায় এগুলো দীর্ঘকায় ও শোভন বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু টেরাডেলফুয়েগোর উন্মুক্ত ও বায়ুপ্রবাহ–আওতা–এলাকায় উদ্ভিদ কুগঠিত ও মোচড়ানো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রয়েছে। উচ্চতর ও উন্মুক্ত এলাকায় ক্ষুদ্রাকৃতি লেঙ্গু (*N. pumilio*) প্রকাশ পেয়েছে।

৪.৩. উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টিবহুল অরণ্য

উপক্রান্তীয় বা উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলের পূর্ব পার্শ্বের স্থলভাগে যথেষ্ট পরিমাণে সমভাবে বণ্টিত বৃষ্টিপাত বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সৃষ্টি করেছে এবং এই অরণ্যের সাথে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই অঞ্চলে শীত ঋতু (cold season) না থাকার কারণে পাতাঝরার কোনো স্পষ্ট ঋতু নেই। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের তাপমাত্রা কম হেতু ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনুরূপ সমৃদ্ধ বনানীর বিকাশ ঘটেনি, যদিও দক্ষিণ চীনে সমৃদ্ধশীল উদ্ভিদ প্রজাতি বিদ্যমান। উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় গোলার্ধের ২৩° এবং ৩৫° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ–পূর্বাংশের উপকূলীয় সমভূমি, চীনের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ জাপান, দক্ষিণ–পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার দক্ষিণ–পূর্বের উপকূল অঞ্চল এবং ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে এই শ্রেণীর অরণ্য বিদ্যমান। বর্তমানে এসব অরণ্যের অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এসব অরণ্যের সঠিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ এই অরণ্যগুলো মিশ্র সম্প্রদায়, প্রশস্ত পাতাবহুল চিরসবুজ ও প্রশস্ত পাতাবহুল পাতাঝরা এবং পর্ণমোচী গাছ বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বনানীর বনও

প্রকাশ পেয়েছে। আবার কোথাও কোথাও পর্ণমোচী বৃক্ষ বা নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলের ক্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যের বনানীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। সাধারণত এসব অরণ্য অপেক্ষাকৃত নিবিড় হলেও বৃক্ষের চূড়াসমূহের চাঁদোয়া ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যের বৃক্ষের অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন চাঁদোয়া প্রকাশ করে না। বৃক্ষের কাণ্ডের ঠেস (buttress) গড়ে উঠে না এবং লায়না (*Liana*) দেখা গেলেও ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনুরূপ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় নয়। মাঝে মাঝে বনাঞ্চলের নিম্নতলের বনানী তালজাতীয় গাছ, ঝোপ, বাঁশ প্রভৃতি ঘন সন্নিবেশিতভাবে প্রকাশ পায়।

৪.৩.১. দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল, প্রায় কেপ হাটারাস্ হতে মিসিসিপি বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা আদিতে শীর্ষ পর্যায়ের প্রশস্ত পাতাবহুল চিরসবুজ অরণ্যে আবৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অরণ্য কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত এলাকায় বিদ্যমান। লাইভ ওক *(Quercus vergiana* এবং *Q. virens)* হচ্ছে এই অরণ্যের সাধারণ ও প্রধান প্রজাতি। নদীতল এলাকায় সাইপ্রেস, টিউলিপ, কটন উড ও রেডগামও জন্মে থাকে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বনাঞ্চল এলাকা বা হালকা বালি মৃত্তিকায় প্রধান গাছ পাইন লক্ষ্য করা যায়। ফ্লেরিডায় জলাভূমি অরণ্য এবং উপসাগরীয় উপকূলে জলজ সাইপ্রেস, টাইপেলো এবং গাম গাছ বিদ্যমান।

৪.৩.২. চীন ও জাপানের দক্ষিণাংশ : সিংলিনসান এর দক্ষিণে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উষ্ণ বৃষ্টিবহুল নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে বসবাসরত মানুষ হয় এই অরণ্য নিশ্চিহ্ন করেছে, না হয় পরিবর্তিত করেছে। বর্তমানে জাপানে বিদ্যমান বিলুপ্তপ্রায় এই আদি অরণ্যাংশ অরণ্যটির উদ্ভিদ প্রজাতির প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কিছু সরল বর্গীয় গাছ ও বাঁশ ঝাড়সহ প্রশস্ত পাতাবহুল ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গাছে অরণ্য পাহাড়, উপত্যকা এবং সমভূমি এলাকায় এককালে বিদ্যমান ছিল। মিশ্র নাতিশীতোষ্ণ ও সরলবর্গীয় অরণ্যের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ পর্বতশ্রেণী আবৃত ছিল। বিশেষ করে চীনের পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির চিরসবুজ ওক, লরেল এবং ম্যাগনোলিয়াসহ ক্যামেলিয়া, ম্যাপল, ওয়ালনাট এবং টাংগ গাছ *(Aleurites fordie* and *A. montana)* লক্ষ্য করা যায়। এগুলো ছাড়া লরেল গোত্রের অতি পরিচিত ক্যামফোর *(Cinnamomum camphora)* ও অন্যান্য বৃক্ষের সাহায্যে সৃষ্ট অরণ্যতলে ক্ষুদ্র গাছ ও ঝোপ এবং গুল্মের সাহায্যে ঘন বনানীর সমাবেশ প্রকাশ পেয়েছে। মাঝে মাঝে কাষ্ঠল লতা বৃক্ষগুলোকে মাল্য শোভিত করে রেখেছে। বাঁশ অরণ্যের এক প্রধান ও সাধারণ উপাদান। বাঁশঝাড় পরিষ্কার করার ফলে অরণ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে নানলিংসাং-এর অধিকাংশ বন্য উচ্চভূমি এলাকা ঘন সন্নিবেশিত বাঁশঝাড় দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে।

৪.৩.৩. দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড, ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নের মধ্যবর্তী এলাকায় অতীতে উপক্রান্তীয় চিরসবুজ অরণ্যের এক প্রশস্ত বলয় বিদ্যমান ছিল। ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের পর এই অরণ্য বলয়ের অধিকাংশ বনানী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শক্ত কাষ্ঠবিশিষ্ট ইউক্যালিপটাসের প্রাধান্য এই অরণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এগুলোর মধ্যে সিডনি ব্লুগাম *(Eucalyptus salignu)*, ব্লাকবাট *(E. pilularies)*, মাউন্টেন অ্যাশ *(E. regnaus)* এবং অ্যালপাইন অ্যাশ *(E. gigatea)* প্রধান। অরণ্যটি উন্মুক্ত বৈশিষ্ট্য

বহন করে। ফলে অরণ্যের নিম্নতল ক্ষুদ্র ঘন গাছ, ঝোপ বা গুল্ম এবং পূর্ণাঙ্গ গাছ দিয়ে আচ্ছাদিত। অস্ট্রেলীয় প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট চিরসবুজ অরণ্যের স্বাতন্ত্র্যতার (distinctiveness) জন্য বিজ্ঞানী আয়ার (Eyre) এই অরণ্যকে অস্ট্রেলীয় স্ক্লেরোফাইলাস (*Australian sclerophyllous*) অরণ্য নামে অভিহিত করেছেন।

৪.৩.৪. **দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা :** দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের উপকূল অঞ্চল উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে সারা বছর সমভাবে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। ফলে অতীতে সমগ্র অঞ্চলটিতে নাতিশীতোষ্ণ চিরসবুজ অরণ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে স্মৃতি সংরক্ষণার্থে অবশিষ্টাংশ (relics) ছাড়া অরণ্যের প্রায় সকল অংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নাতিশীতোষ্ণ ইয়েলো উড (*Podocarpus* spp.) অরণ্যটির চাঁদোয়া সৃষ্টি করে রেখেছে। অরণ্যের দক্ষিণাংশে ফার্ন যেমন *Hemitelia capensis* অরণ্য তলের বনানী হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তরাংশের প্রায় শুষ্ক অরণ্য তলে জিওফাইট (geophytes) এবং কন্দকার (bulbous) বনানী বিদ্যমান।

৪.৩.৫. **দক্ষিণ ব্রাজিল :** ব্রাজিলের দক্ষিণাংশের উচ্চভূমি অঞ্চলের প্যারানা, সান্তা ক্যাটারিনা ও রিওগ্রান্ডি ডো সোল এবং প্যারাগুয়ের পূর্বাংশের এক বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী চিরসবুজ মিশ্র অরণ্য বিদ্যমান। প্যারানা পাইন (*Araucaria augustifolia*) বৃক্ষের প্রাধান্যের জন্য এই অরণ্য অরোকেরিয়া অরণ্য নামেও পরিচিত। এই গাছগুলো দীর্ঘকায়, খাড়া এবং শাখাবিহীন। অবিমিশ্র পাইন অরণ্য তল সচরাচর বনানী মুক্ত বলে পরিগণিত। প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট চিরসবুজ গাছ ও গুল্ম বা ঝোপ যেমন ইয়ারবা মেটসহ (*Ilex paraguensis*) পাইন অরণ্যের তলদেশে মোটামুটি ঘন বনানীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় চিলির বিও বিও (Bio Bio) নদীর দক্ষিণে সারা বছর সংঘটিত বৃষ্টিপাত ঘন ও সমৃদ্ধ চিরসবুজ বনের সৃষ্টি করেছে এবং এই বন ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ চিলির নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সাথে মিশে গেছে। এই অঞ্চলের সমগ্র অরণ্যের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি *Araucaria imbricata* ব্রিটেনে মাঙ্কি পাজল বৃক্ষ নামে পরিচিত, চিরসবুজ বিচ (*Nothofagus* spp.), চিলিয়ান সেডার (*Libocedrus chilensis*) এবং সাবান গাছ (*Quillaja saponaria*)।

৪.৪. মৃদুশীতল বৃষ্টিবহুল নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য

দক্ষিণ গোলার্ধে শুধু দক্ষিণ চিলি, তাসমানিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে মৃদু শীতল বৃষ্টিবহুল নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য বিদ্যমান। অক্ষাংশভিত্তিক অবস্থানের দৃষ্টিকোণ হতে এসব স্থানে পাতাঝরা অরণ্য গড়ে উঠার কথা। কিন্তু এসব এলাকার জলবায়ুর অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুকূল বনানীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত সুষম সামুদ্রিক জলবায়ুর এই অঞ্চলগুলোতে কদাচিৎ তুষারপাত সংঘটিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের বর্ণিত অঞ্চলগুলো পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ এলাকার আওতাভুক্ত এবং অঞ্চলগুলোর উচ্চভূমি প্রচুর বৃষ্টিপাতের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। চিলি, তাসমানিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের অরণ্যগুলো মিশ্র অরণ্যের অন্তর্গত এবং এই বনভূমিগুলোতে চিরসবুজ দক্ষিণীয় বিচের (*Nothofagus* spp.) প্রাধান্য বিদ্যমান।

৪.৪.১. চিলির বৃষ্টিবহুল অরণ্য : চিলির ৪০° দক্ষিণ হতে ৫৪° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার (১,০০০ মাইল) দূরত্ব এলাকায় বৃষ্টিবহুল অরণ্য বিস্তার লাভ করে আছে। এই অরণ্য অত্যন্ত ঘন এবং অরণ্যটিতে অনেক অপ্রবেশ্য এলাকা বিদ্যমান। এই মিশ্রিত বনাঞ্চলে ক্ষুদ্রাকৃতি দক্ষিণীয় বীচের প্রাধান্য বিদ্যমান। কিছু কিছু সরলবর্গীয় গাছ অনেক এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এলাকায় পাতাঝরা গাছও বিদ্যমান। এই পানিসিক্ত অরণ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উপগাছা এবং লতানো বনানী লক্ষণীয়। চুসকি *(Chusquea)* প্রজাতির বাঁশ ঘন অরণ্য অঞ্চলে নিচু তলের বনানী হিসেবে গুরুত্ব বহন করে রয়েছে। বনাঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে 'গেল' শক্তির (Gale force) পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহের ফলে গাছগুলো নোয়ানো ও মোচড়ানো বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুদ আকার প্রকাশ করে রয়েছে এবং বৃক্ষের এই অবস্থা ক্রুমহোলজ (Krummholz) নামে পরিচিত।

৪.৪.২. তাসমানিয়া বৃষ্টিবহুল অরণ্য : তাসমানিয়ার ১,২৭০ মি.মি. হতে ৩,৫৫০ মি.মি. (৫০" হতে ১৪০") বৃষ্টিপাত সংঘটিত এলাকা বিশেষ করে পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় অংশে বৃষ্টিবহুল অরণ্য গড়ে উঠেছে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত এলাকায় দীর্ঘ চিরসবুজ বিচ গাছ ৬০ মিটার (২০০') উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই অরণ্য তলে ঘন ঝোপ লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বীপের শুষ্কতর ইউক্যালিপ্টাস অরণ্যের সাথে বর্ণিত অরণ্যের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তাসমানিয়ার বৃষ্টিবহুল অরণ্যে অন্য প্রজাতির ক্ষুদ্রাকৃতি বনানী বিদ্যমান এবং চিলি ও নিউজিল্যান্ডের বনানীর সাথে এগুলোর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৪.৪.৩. নিউজিল্যান্ডের বৃষ্টিবহুল অরণ্য : নর্থ আইল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকা এবং সাউথ আইল্যান্ডের দক্ষিণাংশ বৃষ্টিবহুল অরণ্যের দ্বারা আবৃত। নর্থ আইল্যান্ডে উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল এবং সাউথ আইল্যান্ডে উপ অ্যান্টার্কটিক বৃষ্টিবহুল অরণ্য প্রকাশ পেয়েছে। নর্থ আইল্যান্ডের কিছু এলাকার আদি অরণ্যের অবশিষ্টাংশ ছাড়া সকল এলাকার আদি অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই অরণ্যে প্রচুর এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির বনানী বিদ্যমান। অরণ্য স্তরাকারে সজ্জিত এবং লায়ানার *(Lianas)* সাথে বৃক্ষগুলো বুননকৃত (interwined) এবং তলদেশ ঘন বনানী সন্নিবেশিত। অনেক বৃক্ষের ব্যাপক বিস্তৃতি যেমন—প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আবার অনেকগুলোর স্বল্প বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। উত্তরের ম্যাজেস্টিক কাউরি *(Agathis auistralis)* এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো হচ্ছে টোটরা *(P. dacrydioides)*, টোয়া *(Beilschmicdia tawa)*, টারাইরে *(B. taraire)* এবং মেয়ারে *(Olea cunninghamii)*। নিউজিল্যান্ডের বৃষ্টিবহুল এলাকায় কনিফার এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ গাছ দিয়ে মিশ্রজাতীয় অরণ্য সৃষ্টি করেছে। সাউথ আইল্যান্ডের উপ-আন্টার্কটিক বৃষ্টিবহুল অরণ্য অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ অরণ্য এবং অরণ্যটির প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি হচ্ছে সাউদার্ন বিচ *(Nothofagus* spp.)। বিজ্ঞানী আয়ারের অভিমত হচ্ছে যে, উত্তর গোলার্ধের সূচাকার বোরিল অরণ্যের কনিফারের গঠন কাঠামো ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হতে নিউজিল্যান্ডের কনিফারের বৈশিষ্ট্য পৃথক। তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দক্ষিণ গোলার্ধের অন্যান্য মিশ্র অরণ্যসহ নিউজিল্যান্ডের অরণ্য হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীভিত্তিক অতীতের মধ্য অক্ষাংশীয় অরণ্যের সত্যিকার বংশধর।

৪.৫. প্রশস্ত পত্রবহুল সবুজ অরণ্য

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বহনকারী অঞ্চলসমূহে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদভূমি (wood land) এবং ঝোপ প্রজাতি সমাবেশের অরণ্য বিদ্যমান। এসব অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। বিজ্ঞানী ড্যানসেরু এই শ্রেণীর অরণ্যকে বায়োকোর (biochore) এবং আয়ার স্ক্রাব ফরমেশনের (scrub formation) স্ক্লেরোফাইলাস উদ্ভিদভূমি (sclerophyllous wood land) বলে গণ্য করেছেন। ভূমধ্য সাগরীয় এলাকা বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর বেষ্টিত ভূমিতে জলবায়ু ও বন্ধুরতার ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তদুপরি এই অঞ্চলগুলোর প্রাকৃতিক বনানীর উপর দীর্ঘকালব্যাপী মানুষ এবং প্রাণীর প্রভাবের প্রতিবন্ধকতা দ্বারা মোজেইক বৈশিষ্ট্যের অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন বনানীর সমাবেশ ফুটে উঠেছে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উষ্ণ ও আর্দ্র শীতকাল এবং উত্তপ্ত ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল। শরৎ ও বসন্ত কালদ্বয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না এবং কালদ্বয় স্বল্পস্থায়ী। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৩৮০ মি.মি. এবং ১,০০০ মি.মি. (প্রায় ১৫" হতে ৪০") এর মধ্যে সংঘটিত হলেও কোনো কোনো স্থানে আরও কম বা বেশি বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে এবং বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বনানীর পরিবর্ধনের সুপ্ত সময়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যে সময় থেকে তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে বনানীসমূহ শীতকালীন সংরক্ষিত পানি সেই সময় থেকে ব্যবহার করে দ্রুত গতিতে বর্ধিত হতে থাকে। দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক তাপবিশিষ্ট ঋতুতে বনানী দীর্ঘ সময়ের শুষ্ক অবস্থা সহ্য করার বৈশিষ্ট্য বহন করে। ফলে অনেক বনানী স্ক্লেরোফাইলাস শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মৃত্তিকার উর্ধ্ব হোরাইজন শুষ্ক হয়ে পড়ে সেহেতু অনেক বনানী খাড়া মূল শিকড়ের মাধ্যমে উপপৃষ্ঠ তলের জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করে থাকে।

প্রধানত এই অঞ্চলে তিন শ্রেণী যথা—(১) শক্ত কাষ্ঠবিশিষ্ট প্রশস্ত পাতাবহুল চিরসবুজ অরণ্য, (২) পরিবর্তিত বনানী ভূমি ও গুল্ম এবং (৩) সরলবর্গীয় অরণ্য বিদ্যমান। অতীতে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে প্রশস্ত পাতাবহুল চিরসবুজ অরণ্য ব্যাপক এলাকায় বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রধান বনানী হচ্ছে গুল্ম। আদি অরণ্য বিলীন এলাকাসমূহে ক্ষুদ্রাকৃতি এবং পরিবর্তিত স্ক্লেরোফাইলাস বৈশিষ্ট্যের প্রধানত চিরসবুজ গুল্ম গড়ে উঠেছে।

৪.৫.১. ভূমধ্যসাগরীয় পত্রবহুল অরণ্য : ভূমধ্যসাগর পরিবেষ্টিত ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার বনানীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ব্রানিগান ও জারেট ভূমধ্যসাগর বেষ্টিত অঞ্চলের বনানীকে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রধানত চারটি ভূমধ্যসাগরীয় বনানীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ৫,০০০ হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের বনানী মানুষ ও প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার মধ্যে গড়ে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুভিত্তিক জলপাই বাগানের চাষ এই অঞ্চলের অরণ্য প্রকৃতির সীমা নির্দেশ করে। ভূমধ্যসাগর এলাকায় আদিতে প্রশস্ত পাতাবহুল চিরসবুজ বন সম্ভবত জলবায়ুর শীর্ষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্যায়ের বনানী বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। তদুপরি জানা গেছে যে, এই উদ্ভিদ পর্যাপ্ত সুযোগ প্রাপ্তিস্থান এমনকি ঝোপ শ্রেণীর বনানী অঞ্চলেও গড়ে উঠে। অতীতের ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত অরণ্যের উদ্ধৃতি এবনে খালদুনের চতুর্দশ শতকের

লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, ফেজ হতে তিউনিস পর্যন্ত তিনি ঘোড়ায় চড়ে সমগ্র পথ গাছের নিচ দিয়ে অতিক্রম করেছেন। এক বা দুই এলাকায় (যেমন—দক্ষিণ ইটালি) শিকারের ক্ষেত্র হিসেবে দীর্ঘকাল হতে সংরক্ষিত রাখার ফলে ঘন অরণ্য বজায় রয়েছে। তবুও আবরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অরণ্যগুলো তত ঘন বা সমৃদ্ধ বলে বিবেচনা করা যায় না। এগুলো উন্মুক্ত উদ্ভিদ ভূমি বা পাতলা অরণ্য নামে পরিচিত। মরক্কোর মারমোরা বন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর বনে স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ওক গাছ বিক্ষিপ্তাকারে বিদ্যমান। এই গাছ ছাড়াও উদ্ভিদ ভূমিতে বন্য জলপাই, ফিগ, ক্যারোব এবং লেনটিস্ক বৃক্ষও বিদ্যমান। ফাঁকা স্থানে স্ক্লেরোফাইলাস গুল্ম এবং কন্দকার ও কন্দাল মূলবিশিষ্ট বনানী গড়ে উঠেছে।

প্রধান প্রধান ওক প্রজাতি হচ্ছে হোম ওক (*Quercus ilex*), কর্কওক (*Q. suber*) এবং কার্মেস ওক (*Q. coccifera*)। জলপাই অপেক্ষা হোম ওক কিছুটা ব্যাপক আকারে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বিস্তৃত যদিও লেভান্টে এই বৃক্ষ লক্ষ্য করা যায় না। কর্ক ওক শুষ্কতা সহ্যকারী বৃক্ষ হলেও এর প্রাধান্য পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অর্ধাংশের অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে বিদ্যমান। ডালমেসিয়া উপকূলের পূর্বাংশের এলাকাগুলোতে এই গাছ দৃষ্টিগোচরে আসে না। ইটালি ছাড়া কারমেস ওক ভূমধ্যসাগরীয় সকল অঞ্চল বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা এবং ল্যাভেন্টাইনে বিদ্যমান। শুষ্ক অথবা অগভীর মৃত্তিকা অঞ্চল যেমন—মাল্টা ও প্যালেস্টাইনে চিরসবুজ ওকের পরিবর্তে ক্যারব, ফিগ ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মলাভ করেছে। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকৃতি গাছ ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ইটালি ও আটলাস অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ হিসেবে চিহ্নিত।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ঝোপবিশিষ্ট উদ্ভিদভূমি হচ্ছে এক সাধারণ স্পষ্ট স্ক্লেরোফাইলাস বৈশিষ্ট্যসহ ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিবর্তিত ভিন্ন ভিন্ন বনানী ফরমেশন। অরণ্য নিশ্চিহ্ন এলাকা (মানুষ, প্রাণী বিশেষত ছাগল দিয়ে সৃষ্ট) এবং নিম্ন পরিমাণ বৃষ্টিপাত সংঘটন ও নিম্নমান বা অগভীর মৃত্তিকা অঞ্চলে দ্বিতীয় প্রজন্মের বনানী দিয়ে উদ্ভিদভূমি গড়ে উঠেছে। বনানীর উচ্চতা ১.৫ হতে ৩ মি. (৫ হতে ১০′) এর মধ্যে লক্ষণীয় এবং বনভূমিগুলো বাস্তবে অপ্রবেশ্য বৈশিষ্ট্য বহন করে। শুষ্কতা সহ্যকারী চর্মের অনুরূপ পাতাবিশিষ্ট চিরহরিৎ এবং চিরসবুজ বনানী এই বনগুলোতে প্রকাশ পায়। প্রধান প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো হচ্ছে—কাঁটাবহুল সিসটাস (*Cistus* spp.), ব্রুম (*Genista* spp.), গোর্স (*Ulex* spp.), রোজমেরি (*Rosmarinus officinalis*), লরেল (*Laurus nobilis*) এবং মার্টল (*Myrtus communis*)। এগুলো ছাড়াও লতা যেমন—থাইম (*Thymus* spp.), হিথার (*Erica* spp.) এবং বহু জিওফাইট বিদ্যমান। ঘন এবং ক্ষুদ্রাকৃতি এই শ্রেণীর স্ক্লেরোফাইলাস গুল্ম বিশেষ করে কর্সিকা ও ক্যালিব্রিয়ায় সুগঠিত পশ্চিম স্পেন, আলজিরিয়ার কিছু অংশ এবং তুরস্কের এজিয়ান উপকূল এলাকায়ও এই শ্রেণীর বনানীর বন গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ ইটালি ও গ্রিসে পাতলা অপেক্ষাকৃত পরিবর্তিত শ্রেণীর বন বিদ্যমান এবং এগুলো স্থানীয় বিশেষ নাম যেমন—দক্ষিণ ফ্রান্সে ম্যাকুইস, ইটালিতে ম্যাসিয়া এবং স্পেনে ম্যাটোরাল এর প্রচলন রয়েছে।

চুনাপাথর এলাকার অগভীর অনুর্বর ও শুষ্ক মৃত্তিকা এলাকায় বর্ণিত বনের বনানী আরো পরিবর্তিত হয়ে যে বনের সৃষ্টি হয়েছে তা গ্যারিগ (garigue) নামে পরিচিত।

৪.৫.৫. অস্ট্রেলিয়ার পত্রবহুল অরণ্য : অস্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের এলাকাগুলোতে উত্তর গোলার্ধের অনুরূপ স্ক্লেরোফাইলাস ফরমেশনের উদ্ভিদ ভূমি ও গুল্ম বিদ্যমান। এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় বনানীর স্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ পায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ–পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমান ৭৬০ মি.মি. হতে ১,০০০ মি.মি. (প্রায় ৩০°–৪০°)। এজন্য এই অংশে দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস, টুয়ার্ট, জাররাহ এবং ক্যাররি (Eucalyptus, Tuart, Jarrah, Karri) বৃক্ষের অরণ্য গড়ে উঠেছে। এই অরণ্যের তলদেশে শক্ত পাতাবিশিষ্ট লতাজাতীয় সমৃদ্ধ বনানী লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তর এলাকায় বৃক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়ে পূর্বদিকে আরও অভ্যন্তর ভাগে ঝোপজাতীয় বনানীর সৃষ্টি করেছে এবং এগুলো ম্যালি (mallee) ঝোপ নামে পরিচিত। ধূসর সবুজ বর্ণের ১ মি. হতে ২.৫ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট এই শ্রেণীর বিজড়িত জটপাকানো ঝোপ অপ্রবেশ্য এবং পরিষ্কার করা অতি কষ্টকর। প্রায় সকল ম্যালি প্রজাতির উদ্ভিদ *Eucatyptns* গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ব্লু–বুশ ও সল্ট বুশ–এর মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি ইউক্যালিপটাসও লক্ষ্য করা যায়। অনেক গুল্ম অত্যন্ত সৌরভযুক্ত।

৪.৬. ক্রান্তীয় অরণ্য

৪.৬.১. ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য : নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে নিয়মিত ভারি পরিচলন বৃষ্টিপাত এবং অবিরত উচ্চ তাপমাত্রা বনানীর ক্রমবিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা নির্দেশ করে। সব সময়ের উচ্চ তাপ ও জলীয় পদার্থের প্রাচুর্য বনানীকে বাধাহীন অবস্থায় ক্রমবিকাশ লাভ করতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলে বনানী প্রচুর সংখ্যায় শুধু বংশবৃদ্ধিই করে না (proliferates), সুবিন্যস্ত ও আকর্ষণীয় (spectacular) হারে ক্রমবিকশিতও হয় (মানচিত্র ৪.ই)। এই অঞ্চলের অরণ্যে সমৃদ্ধশালী মিশ্র বনানী বিদ্যমান এবং সম্ভবত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ১,০০,০০০। শুধু মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ৪৫,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি লক্ষ্য করা যায়।

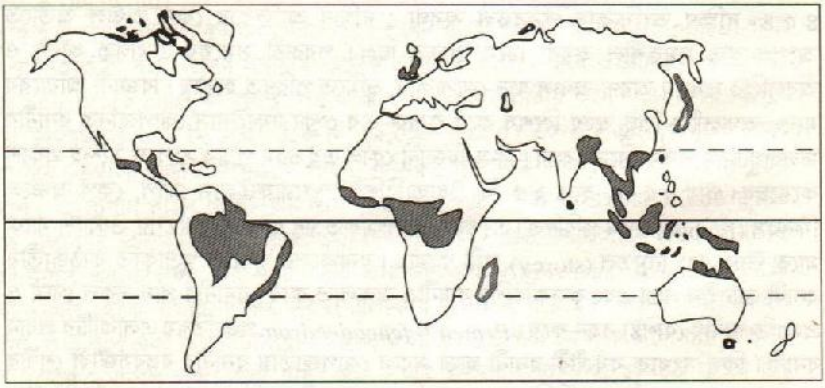

মানচিত্র ৪.ই. ▬ ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য।

বৃষ্টিবহুল এই অরণ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অঞ্চলটিতে শুষ্ক এবং এমনকি মৃদু শীত ঋতু না থাকার কারণে বনানীগুলো চিরসবুজ অবস্থা, কোনো নির্দিষ্ট পাতা ঝরার সময় নেই, বনানীর অঙ্কুরোদ্গম, ক্রমবিকাশ, পুষ্প ও ফল ধারণ এবং মৃত্যু একই সময়ে চলতে থাকে। এই অরণ্য গাছ, গুল্ম, পর্ণাঙ্গ, উপগাছা ও পরগাছা দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমৃদ্ধ। বনানীর অব্যাহত (rampant) ক্রমবিকাশ অরণ্যটির বনানীর ঘন সমাবেশ দ্বারা অপ্রবেশ্য বৈশিষ্ট্য এবং বনানীর চূড়ার সাহায্যে প্রায় ৫টি ভিন্ন তল (storey) সৃষ্টি করেছে।

অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন চন্দ্রাতপ নদী, পরিষ্কারকরণ এলাকা বা স্যাভানা এলাকার সাহায্যে শুধু বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু সকল বনানী সমান উঁচু নয় সেহেতু অরণ্যের উর্ধতলের চন্দ্রাতপ বা ছাদ অনিয়মিত। অরণ্যের ছাদের পরিলেখ উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার দ্বারা প্রকাশিত প্রাধান্য বিস্তারকারী গাছের উচ্চতার ক্রম ২৫ মিটার হতে ৪০ মিটার (প্রায় ৮০ হতে ১২৫ যদিও কোনো কোনো গাছ ৪৫ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে) এর মধ্যে লক্ষণীয়। এই দীর্ঘাকৃতি গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা সরল কাণ্ডের উর্ধ্বাংশে প্রকাশ পায় এবং এই বৃহৎ কাণ্ড বৃহৎ আলম্ব শিকড় (buttress root) দিয়ে পতন বা হেলানো অবস্থা হতে রক্ষা পায়। এই উর্ধ্ব চন্দ্রাতপ স্তরের নিচে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতাবিশিষ্ট উর্ধ্বের উচ্চতা ১৮ মি. (৬০) বনানী অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবেশিত চন্দ্রাতপ সৃষ্টি করেছে। এর নিচে তৃতীয় চন্দ্রাতপ স্তর খর্বাকৃতিতর সরু বা কৃশ চূড়াসহ ৬ মি. হতে ১৫ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ দ্বারা সৃষ্ট। অরণ্য তলের বনানীর পরিমাণ অরণ্যের উন্মুক্ততার পরিমাপের সঙ্গে জড়িত।

অরণ্যের অভ্যন্তরে আলো, বাতাস, স্থান এবং পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্তির জন্য বনানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। অরণ্যের উর্ধ্বতল নিবিড় হলে অরণ্যের তলদেশে যথেষ্ট আলো পৌঁছে না। ফলে অরণ্যের তলদেশে কমই বনানী জন্মে থাকে, জন্মিলেও ছায়া সহ্যকারী বনানীর সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ভগ্নাকৃতি অরণ্যের উর্ধ্বতল যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোক অরণ্যতলে পৌঁছাতে সাহায্য করে, ফলে এসব স্থানে তলদেশীয় প্রচুর বনানীর সমাবেশের সৃষ্টি হয়। নদী প্রান্ত এলাকার দেয়ালসদৃশ সবুজ বনানীর সমাবেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। টিকে থাকার প্রতিযোগিতার বনানী হচ্ছে অসংখ্য উপগাছা (epiphytes), পরগাছা, স্যাপ্রোফাইট ও লায়ানা (parasite, saprophytes and lianas)। উপগাছা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার রাস্না গোত্রীয় গাছ/অর্কিড, পর্ণাঙ্গ এবং ব্রোমেলিয়াড (orchids, ferns and bromeliads)। এগুলো অন্য উদ্ভিদ বিশেষ করে উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার আশ্রয় গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো খাবার ও জলীয় পদার্থ সংগ্রহের জন্য বাতাসের মধ্যে শিকড় ঝুলিয়ে রাখে। আবার কিছু সংখ্যক এই শ্রেণীর উদ্ভিদ আশ্রিত বৃক্ষের শাখার সন্ধিস্থলের পচনশীল বারিশের (rotting debris) খাবার সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। পরগাছা শুধু আশ্রিত বৃক্ষকে স্ব-প্রয়োজনে ব্যবহার করে না বরং এগুলোকে মেরেও ফেলে। বৃষ্টিবহুল অরণ্যে অনেক সংখ্যক পরগাছা বিদ্যমান। সাপ্রোফাইট অরণ্যতলের মৃত জৈব বর্জ্য (organic trash) জন্মলাভ করে। প্রায় সকল স্যাপ্রোফাইট ছত্রাকের অন্তর্ভুক্ত যদিও কিছু অর্কিড সাপ্রোফাইটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। লায়ানা বা আরোহনকারী কাষ্ঠল লতা (woody climbers) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান। দৃষ্টি আকর্ষণীয় এই শ্রেণীর লতাগুলো অরণ্যের সকল স্থানে বৃক্ষকে জাল আকারে বিজড়িত করে রাখে এবং ফাঁস

আকারে ঝুলে থাকে। বনানী আকারে স্ট্যাঙ্গুলার যেমন ফুকাস *(Fueas)* ও ক্লুসিয়া *(Clusia)* প্রজাতি আশ্রয়দানকারী বৃক্ষকে মেরে ফেলে।

ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য সবসময় সবুজ বর্ণে শোভিত থাকে। একক বৃক্ষ প্রাকৃতিকভাবে পাতা পরিবর্তন করলেও কোনো বৃক্ষই কোনো সময়ে পাতাবিহীন অবস্থায় থাকে না। সাধারণভাবে এই বৃষ্টিবহুল অরণ্যটি সমৃদ্ধ ও প্রচুর সংখ্যায় উদ্ভিদের বংশের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করে। প্রজাতির প্রাচুর্য এবং মুকুলের-বর্ণসহ গাঢ় সবুজ বর্ণের বিভিন্ন ছায়াপাতের লীলাক্ষেত্র হিসেবে এই অরণ্য পরিগণিত।

ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যটি ভিন্নধর্মী বনানীর গাঠনিক কাঠামোর দ্বারা গঠিত। এই অরণ্যে নির্দিষ্ট একক উদ্ভিদ প্রজাতি লক্ষণীয় নয়। স্বল্প বিস্তৃত এলাকায় মাত্র ১ বর্গমাইলে শত শত প্রজাতির বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। বনানীর পাতা সাধারণত বৃহৎ ও উপবৃত্তাকার। পাতার পৃষ্ঠ মসৃণ ও চকচকে এবং প্রান্ত ভাগ অভগ্ন। অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ পরিত্যাগের বৈশিষ্ট্য, পৃষ্ঠনালী পাতার প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য প্রধানত ৩ অঞ্চলে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে—(১) আমাজান উপত্যকা, (২) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ভূমি ও কঙ্গো উপত্যকা এবং (৩) মালয় ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। আন্তঃক্রান্তীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকৃতি প্রান্তিক বৃষ্টিবহুল অরণ্যও (smaller outliers) লক্ষ্য করা যায়।

৪.৬.২. আমাজান উপত্যকা বৃষ্টিবহুল অরণ্য অঞ্চল : ব্যাপক এলাকাভিত্তিক ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য আমাজনিয়ায় বিকাশ লাভ করেছে। এই অরণ্য অতীতে হিলিয়া (hyllia) নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি সেলভা (selva) নামে পরিচিত। নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন এবং অপ্রবেশ্য ও শ্বাসরোধকারী (smothered) এই অরণ্য-পরিচিতি নদী পথের পরিব্রাজকদের অতীতের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নদী হতে দূরবর্তী অনেক স্থানের রন্ধ্রীয় মৃত্তিকার তৃণভূমি, প্লাবন সমভূমির রুক্ষ তৃণের জলাভূমি এবং বুননকৃত অসংখ্য নদীর দ্বারা সেলভা বনাঞ্চলের অবিচ্ছিন্নতা বিঘ্নিত হয়েছে। বহুতলের এই অরণ্যের গাছগুলো লায়ানা এবং ট্রিপারচার (treepercher) সাহায্যে আন্তঃলেস (interlaced) এর অনুরূপ সংযুক্ত এবং লেস আকারে এগুলো ঝুলে থাকে। অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতি এই অরণ্যে বিদ্যমান। প্যারা অঙ্গরাজ্যে ৪,০০০ এর বেশি এই উদ্ভিদ প্রজাতি বিদ্যমান। একক শ্রেণীর উদ্ভিদ জট পাকানো বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে (inextricably intermingled) ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভ করে রয়েছে। রাবার গাছ *(Hevea brasiliensis)*, গ্রিন হার্ট *(Nectandra rodiaei)*, লগ উড *(Haematoxyton campechianum)*, আকাপু *(Voucapona americana)* এবং কোকো গাছ *(Theobroma cacoa)* এই অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ। সেলভায় অসংখ্য তালজাতীয় গাছ বিদ্যমান। দক্ষিণ আমেরিকার সেলভা এবং অন্যান্য বৃষ্টিবহুল অরণ্যের গাছের শীর্ষদেশে প্রাণিকুল, বিশেষ করে পাখি ও পোকামাকড় বাস করে। কারণ এখানে এই শ্রেণীর জীবের প্রচুর খাবার বিদ্যমান। বৃক্ষবাসকারী আচরণের স্তন্যপায়ী জীবও এই অরণ্যের বৃক্ষের উপরে বাস করে। অরণ্য তলের আর্দ্রতার পরিবেশে প্রধানত পোকামাকড়, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণী লক্ষ্য করা যায়।

জলাভূমির অরণ্য প্রধানত প্রধান প্রধান নদী সংলগ্ন এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। নদী উপকূল সংলগ্ন পটভূমি এবং নদীর কর্তিত বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়মিত বন্যাকবলিত হওয়ার ফলে ব্যাপক এলাকা জুড়ে জলাভূমি ও হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো ক্যামপোজ ডি ভার্জি (Campos de Verge) নামে পরিচিত। এসব বন্যাকবলিত এলাকায় জলাভূমি অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাজিলবাসীগণ এগুলোকে অতি প্রবাহিত অরণ্য নামে প্রকাশ করেন।

আটলান্টিক উপকূলীয় অরণ্য রিও গ্রান্ডি ডো নরটে (Rio grande Do Norte) হতে ২৮° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত ব্রাজিলীয় উচ্চভূমিতে বিদ্যমান। বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সাথে এই অরণ্যের নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। ক্রান্তীয় আয়ন বায়ু প্রবাহিত এই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এই বৃষ্টিপাত এলাকাটির নিবিড় অরণ্যকে টিকে রেখেছে। অক্ষাংশীয় অধিক বিস্তৃতি অঞ্চলটির জলবায়ুর তারতম্য প্রকাশ করে। ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ সংঘ (plant association) বিকাশ লাভ করেছে। এই উপকূলীয় অরণ্য ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের ভিন্নরূপ বলে চিহ্নিত। এই অরণ্যের বনানী প্রজাতিগুলো হচ্ছে কলা-ঝাড়, কোকো-গাছ, আছাই, জাকারান্ডা, সিননামন, সেডার, আইপে এবং জাটোবা (Banana, cacao tree, assai, jacaronda, cinnamon, ceder, ipe and jatoba)। এই অরণ্যে অনেক তলজাতীয় বৃক্ষ বিদ্যমান।

৪.৬.৩. আফ্রিকার বৃষ্টিবহুল অরণ্য : এই অরণ্য দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টিবহুল অরণ্যের মতো উন্নত নয়। এই অরণ্য কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বলয় আকারে তিন এলাকায় বিদ্যমান। এলাকাগুলো হচ্ছে (ক) পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল এলাকা, (খ) কঙ্গোর উত্তর উপত্যকা/পর্যঙ্ক এবং (গ) সামঞ্জস্যহীন আকারে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর প্রায় ৩° দঃ হতে ১০° দঃ অক্ষাংশ ও মালাগাছির পূর্ব উপকূল এলাকা। আফ্রিকার আদি বৃষ্টিবহুল অরণ্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। হ্রাসকৃত এলাকা হচ্ছে বৃক্ষসহ আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চল। আফ্রিকার এই অরণ্যের সাথে দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের মিল থাকলেও আফ্রিকার বৃষ্টিবহুল অরণ্যে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো হচ্ছে আফ্রিকার মেহগনি *(Khaya genus)*, সটিন উড, সিল্ক কটন গাছ, ওয়েল পাম (*Elaeis guineensis*) এবং রাবারজাতীয় বৃক্ষ যেমন—ফুনটুনিয়া ইলাসটিকা *(Funtunia elastica)*।

আফ্রিকার বৃষ্টিবহুল অরণ্যের অনেক অংশে যেমন উপগাছা ও লায়ানাসহ *(Liana)* অতিরিক্ত গাছের সমাবেশের চন্দাতপের বিভিন্ন তল লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অনেক অংশে আবার তলদেশের ঘন লতা এবং বনানীসহ মোটামুটি উন্মুক্ত অরণ্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য আমাজানের বৃষ্টিবহুল অরণ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় নয়। এই অরণ্যে প্রথম আদিম অরণ্য অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রজন্মের অরণ্যের আয়তন বেশি। অরণ্যটির আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, অরণ্যটির উত্তরাংশ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর বৃষ্টিবহুল অরণ্যের আয়তন অত্যন্ত কম, শুধু নদী উপত্যকায় এই অরণ্য "গ্যালারি" বনের সৃষ্টি করেছে। ম লাগাছি দ্বীপের উত্তর পশ্চিম অংশ এবং পূর্ব উপকূল বরাবর বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সমাবেশ লক্ষণীয়। কেনিয়ার লামু নদী ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের লেগুন ও খাড়িসমূহের জোয়ারের পানি প্লাবিত ব্যাপক এলাকায় গরান বৃক্ষের বন বিদ্যমান।

৪.৬.৪. মালয়-ইন্দোনেশিয়ার বৃষ্টিবহুল অরণ্য অঞ্চল : এই এলাকার স্থলভাগগুলো দ্বীপাকারে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। বৃষ্টিবহুল অরণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই এলাকা দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। এই অঞ্চলের অরণ্যের উদ্ভিদ ফরমেশন আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ ফরমেশনের অনুরূপ হলেও অরণ্যগুলোর ব্যাপক অনুষঙ্গী (subsidiary) অংশ অঞ্চলটির বন্ধুরতা, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে বিকাশ লাভ করেছে। নিচু এলাকা বা সমভূমির বৃষ্টিবহুল অরণ্য ছাড়াও পার্বত্য-পাহাড়ীয় এলাকাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন বন গড়ে উঠেছে। গরান বৃক্ষের বন ছাড়াও মিঠাপানির ব্যাপক এলাকার বন মালয়, সমুত্রা ও বর্নিও দ্বীপে লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চল প্রাচ্য জগৎ (oriental) বা এশিয়া এবং অস্ট্রেলীয় জীবজগৎ এর মধ্যে অবস্থিত। এই কারণে অঞ্চলটি উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে বেশ সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান বৃক্ষ Diptercarpaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে এই গোত্রের ৩০০ প্রজাতি বিদ্যমান।

এখানকার নিম্নাঞ্চলের ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের ব্যাপক অংশ দ্বিতীয় প্রজন্মের অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের বসবাস অরণ্যটির অনেক অংশ প্রাচীন পদ্ধতির চাষের মাধ্যমে সাময়িকভাবে পরিষ্কারকরণের আওতায় পড়ে। অরণ্যের এই ক্ষত অংশ (scar) তাড়াতাড়ি বনানীর দ্বারা পূর্ণ হলে (heal over) উদ্ভিদের চরম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা লাভ অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন। ডবির মতে চরম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইশত বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। পরিষ্করণ এলাকায় প্রথমে ক্রান্তীয় তৃণ ও গুল্ম গড়ে উঠে। এই বনানীগুলো সহজে আগুনের সাহায্যে ধ্বংস হওয়ার কারণে দ্বিতীয় প্রজন্মের বন গড়ে উঠার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। ব্যাপক এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বন এলাকা প্রায়ই পুনরায় বনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় না। সীমিত এলাকার বন সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্টি করা হলে দ্বিতীয় প্রজন্মের বন এবং প্রথম প্রজন্মের বনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় প্রজন্মে বনের তলদেশে অপেক্ষাকৃত ঘন বনানীর সমাবেশ ঘটে।

মালয়-ইন্দোনেশীয় উপকূলীয় অনেক অরণ্য প্রান্তের জলাভূমির গরান বন ছাড়াও স্পষ্ট ফালি আকারের "সৈকত বন" (strip of beach forest) বিদ্যমান। খ্যাতনামা ভূগোলবিদ ডবি এই অরণ্যের বিবরণ দিয়েছেন। সুগঠিত সৈকত বন সমুদ্র তীর হতে ২০০ ফুট বা তার চেয়ে কম অভ্যন্তর এলাকা নিয়ে ফিতা আকারে গঠিত। এই বনে যেসব গাছ দেখা যায় সেগুলো অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না এবং গাছগুলো কদাচিৎ ৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছে। কাছুরিনা *(Equisetifolia, rhu rutjemara)* গাছ দেখতে কনিফার গাছের অনুরূপ। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্ত এলাকায় স্ক্রু পাইন *(Pandanus)*, চর্মসদৃশ্য পাতার ক্যালেফাইলাম, ইনোফাইলাম এবং ব্যারিংটোনিয়া (Calophyllum, Inophyllum and Baringtonia) বিদ্যমান। বীজ হিসেবে নারিকেল সমুদ্রস্রোতে ব্যাপক এলাকায় পরিবাহিত হয়। ফলে সৈকত বনের সর্বত্র এই নারিকেল গাছ বিস্তার লাভ করেছে। মনে হতে পারে যে, গাছগুলো ফসল হিসেবে চাষকৃত। কিন্তু এই গাছগুলো বিভিন্ন দ্বীপের সর্বত্র প্রাকৃতিকভাবে বিস্তার লাভ করে রয়েছে।

নিপা পাম *(Nipa fructians)* উপকূলের এক অতি সাধারণ গাছ। গাছগুলোর পাতা দীর্ঘ পালকসদৃশ। এই গাছগুলো নদীর মোহনায় ও খাড়ির ঈষৎ লোনা পানি (blackish water) বরাবর রেখাকারে সজ্জিত। জোয়ার সংঘটিত অনেক উপকূলে লোনা গরান বন বিদ্যমান। নিম্ন ও মধ্যম উচ্চতাবিশিষ্ট প্রায় ৩০ প্রকার গরান গাছ লক্ষ্য করা যায়। গাছগুলোর বিভিন্ন

শিকড় কাঠামো বিদ্যমান ; যেমন—পলল শিকড় ও আনুভূমিক শিকড় (silt roots and horizontal roots)। শিকড়গুলো বাঁকানো হাঁটুর অনুরূপ। এই প্রকার শিকড় নরম কর্দম মৃত্তিকায় গাছগুলোকে ঠেস আকারে খাড়া করে রাখে এবং দৈনন্দিনের লোনা পানির বন্যা হতে রক্ষা করে।

৪.৭. মৌসুমী অরণ্য

আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক এলাকায় শুষ্ক ঋতু সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ক্রান্তীয় নিরক্ষীয় বা বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল হতে এই অঞ্চলের পার্থক্য হচ্ছে যে, এখানে কয়েক মাসব্যাপী শুষ্ক অবস্থা বিদ্যমান থাকে। এই পৃথক বৈশিষ্ট্যের অঞ্চল মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল নামে পরিচিত। এই মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে এলাকাভেদে বছরে গড়ে প্রায় ১,০০০ মি.মি. হতে ২,৫৫০ মি.মি. এর মধ্যে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যদিও অনেক এলাকায় আরো অধিক বৃষ্টিপাত লক্ষণীয়। এই অঞ্চলের জলবায়ুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, ঋতুভেদে দিনের দৈর্ঘ্য ও সূর্য রশ্মির পরিমাপ এবং দৈনিক ও বাৎসরিক তাপের ব্যাপক তারতম্য প্রকাশ পায়। অনেক এলাকায় কোনো কোনো সময় তীব্র গতিসম্পন্ন বায়ুও প্রবাহিত হয়। জলবায়ুর এই বৈশিষ্টগুলো একক বা যৌথভাবে বনানীর ক্রমবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও প্রধানত শুষ্ক ঋতু সঙ্কটপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত। কারণ এটি বনানীর ছন্দপূর্ণ (rhythm) ক্রমের বিকাশ ঘটায়।

মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ুর বিভিন্নতা বনানীর আঞ্চলিক সমাবেশের পার্থক্য প্রকাশ করে। আর্দ্রতর ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প শুষ্ক ঋতুবিশিষ্ট এলাকায় সমৃদ্ধ বন, শুষ্কতর ঋতুভিত্তিক এলাকায় পাতাঝরা বন এবং বৃষ্টিপাতের হ্রস্ব ঋতুসহ ব্যাপক পরিবর্তনশীল বাৎসরিক স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত সংঘটিত এলাকায় বৃক্ষসহ তৃণভূমি অর্থাৎ স্যাভানা উদ্ভিদ ভূমি (Savanna woodland) গড়ে উঠেছে।

পৌরাণিক মতবাদভিত্তিক মৌসুমী অঞ্চল বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশ, মায়ানমার, এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অংশবিশেষে ক্রান্তীয় ঋতু বা উপ-চিরসবুজ বন (tropical seasonal or semi-evegreen forests) লক্ষ্য করা যায় (মানচিত্র ৪.ঈ)।

এসব এলাকা ছাড়াও ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের প্রান্তদেশ, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ, কেন্দ্রীয় আফ্রিকা এবং কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই বৈশিষ্ট্যের বন গড়ে উঠেছে। মৌসুমী অরণ্য ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের অনুরূপ অতি বর্ধনশীল (luxuriant) অরণ্য নয় বরং এটি অরণ্যের ক্ষীণকায় রূপ (impovershed)। মৌসুমী অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন চন্দ্রাতপ প্রকাশ পায় না। বৃষ্টিবহুল অরণ্যের অনুরূপ লতানো বনানীর প্রাচুর্য ও বৃক্ষের উচ্চতা এই অরণ্যে লক্ষ্য করা যায়। গাছের প্রজাতির সংখ্যা বৃষ্টিবহুল অরণ্যের অনুরূপ এবং এসব বৃক্ষের প্রজাতির সাহায্যে প্রধান তিন তলের চন্দ্রাতপ গড়ে উঠে। মৌসুমী অরণ্য যেহেতু অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত সেহেতু অরণ্যের নিম্ন ও ভূ-তলের চন্দ্রাতপ নিবিড় গুল্ম ও বাঁশ দিয়ে গঠিত। মৌসুমী অরণ্যের বৃক্ষসমূহের পাতা শুষ্ক ঋতুতে ঝড়ে পড়ে। কিন্তু পলিউনিন (Polunin) এর বক্তব্য হচ্ছে যে, সব বৃক্ষের পত্র বিচ্যুতি ঘটলেও অনেক বৃক্ষের কখনই সম্পূর্ণভাবে পাতা ঝরে পড়ে না। এজন্য এই ক্ষেত্রে এই অরণ্যের জন্য উপসবুজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

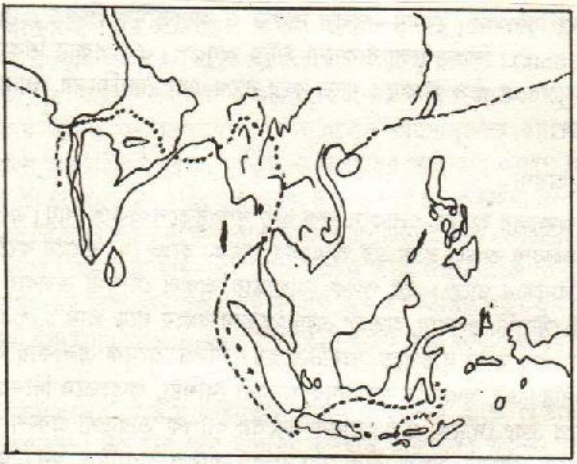

মানচিত্র ৪.৯ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অরণ্য (সেগুন বৃক্ষ)

৪.৭.১. এশীয় মৌসুমী অরণ্য : ক্রান্তীয় উপসবুজ (বা উপ-পাতাঝরা) অরণ্য অতীতে বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশ, মায়ানমার এবং সাবেক ইন্দোচীন উপদ্বীপের (peninsula) অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেছিল। বসবাসরত মানুষ সুদূর অতীতকাল হতে এই অরণ্য ক্রমাগত রূপান্তরিত করে ফেলেছে। অরণ্যটির কিছু অবশিষ্টাংশ (remnants) বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং সামগ্রিকভাবে কিছু বেশি এলাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। অরণ্যটির কোনো কোনো অংশ পরিষ্কার করার পর পরিত্যাক্ত অবস্থায় থাকার ফলে বাঁশ ঝাড় বা ঘন জটপাকানো জঙ্গলে পরিবর্তিত হয়েছে।

আদি এবং অপরিবর্তিত মৌসুমী অরণ্যের সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য বিস্তারণের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেয়। বিজ্ঞানী আয়ারের মতে, অরণ্যের যেসব অংশ সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব হয়েছে সেসব অংশে প্রকৃতিগত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের অনুরূপ পাতাঝরা প্রজাতির বৃক্ষের বন সৃষ্টি লাভ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মনে করেন যে, বর্তমানের মৌসুমী অরণ্য প্ল্যাজিওক্লাইমাক্স গোষ্ঠির (plagioclimax community) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই অরণ্য আগুন ও মানুষের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। অরণ্যটির এই বৈশিষ্ট্য সঠিক সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে।

মৌসুমী অরণ্য প্রাথমিক প্রজন্মের উদ্ভিদ দিয়ে সৃষ্ট অরণ্য নির্দেশ করে না। পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী ফসল চাষ, অধিবাসীদের অতি প্রাচীন পেশার ফলাফল এই অঞ্চলের অরণ্যের প্রাচীন বা আদিম বনানীর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেছে। এ ছাড়াও স্পষ্ট যে, শুষ্ক ঋতুতে বার বার এবং ব্যাপক এলাকায় আগুনের প্রভাব উদ্ভিদ প্রজাতির নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য যেমন—গভীরে প্রবেশের জন্য দীর্ঘ শিকড় এবং পুরু আবরণবিশিষ্ট বীজ নির্বাচিত করতে

প্রভাবিত করেছে। যুক্তি দেখানো হয় যে, টিক গাছ *(Tectona grandis)*-এর মোটা বল্কল এবং শক্ত আবরণের বীজ আগুন নিরোধক। মৌসুমী অরণ্যে তাই এই গাছের প্রাধান্য বিদ্যমান।

মৌসুমী অরণ্য উদ্ভিদ প্রজাতির দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্যমূলক বৃক্ষ হচ্ছে টিক, শাল (*Shorea robtusa*), পিনকাডো বা আইরোন উড *(Xylia xylocarpa)*, অশ্বত্থ বা বটগাছ *(Ficus benghalensis)* এবং স্যানডাল উড *(Santalum album)*। বাবলাজাতীয় গাছ এবং আলবিজিয়াস এই শ্রেণীর অরণ্যের অতি সাধারণ গাছ হিসেবে পরিচিত। বাঁশ হচ্ছে Gramineae বা ঘাস গোত্রের সদস্য বা বনানী। এশিয়ার মৌসুমী অরণ্যে প্রায় ৩০০ প্রকার বাঁশ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যের ব্যাপক এলাকা বা বনাংশভিত্তিক বাঁশের প্রাধান্য প্রকাশ পায় না বরং এগুলো বিচ্ছিন্ন ঝাড় বা ঝোপ (clumps or thickets) আকারে লক্ষ্য করা যায়।

গাঠনিক দিক দিয়ে এশিয়ার মৌসুমী অরণ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পশ্চিম ও দক্ষিণ মায়ানমারের অরণ্যে পিনকাডো ; উত্তর মায়ানমার ও টেনাসিরিম এলাকায় টিক ও পিনকাডো গোত্র এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিউগিনির অরণ্যে ইউক্যালিপটাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

এশীয় মৌসুমী অরণ্যের উপশ্রেণি হিসেবে গরান বনের গুরুত্ব বিশেষভাবে দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারতের সুন্দরবনের নাম (নবম অধ্যায়ে) উল্লেখ করা যায়। এই বন ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া-মালয় এলাকার উপকূলে গরান বন এবং সৈকত বন বিদ্যমান। সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করে এই বনের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন না হয়ে পড়ে তার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছে।

এই বনে সুন্দরী গাছের প্রাধান্য বিদ্যমান। গেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান গাছ। ধুন্দল, আমুর, পন্থর, গোলপাতা, পরশ পিপুল প্রভৃতি বৃক্ষ এই বনে বিদ্যমান। এই বনে কিছু কিছু তাল, নারকেল গাছ এবং বাঁশঝাড় লক্ষ্য করা যায়।

মালয়-ইন্দোনেশীয় উপকূল এলাকায় গড়ান বন এবং সৈকত বন বিদ্যমান। নিপাগাম এই এলাকার উপকূলীয় বনের অতি সাধারণ গাছ। জোয়ার সংঘটিত এলাকায় সাধারণত গরান বনের বৃক্ষ জন্মে থাকে। গাছ হতে বিচ্যুত হওয়ার পর নারকেল সমুদ্র স্রোত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে বিভিন্ন দ্বীপের সৈকত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে নারকেল গাছ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এই বর্ণগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। এই গাছগুলোকে কর্ষণকৃত গাছ মনে হলেও বাস্তবে বর্ণিত পদ্ধতিতে বৃক্ষগুলো মালয়-ইন্দোনেশীয় গড়ান ও সৈকত বনে বিস্তার লাভ করেছে। নিচু ও মধ্যম উচ্চতাবিশিষ্ট প্রায় ৩০ প্রকার গাছ এই এলাকায় গড়ান বনে বিদ্যমান।

এই বনগুলোর গাছের বিভিন্ন শিকড় কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। এগুলো পলল শিকড় ও আনুভূমিক শিকড় নামে পরিচিত। নরম কর্দম মৃত্তিকায় গাছগুলোকে খাড়া করে রাখা ও দৈনন্দিনের জোয়ারের লোনা পানি হতে রক্ষা করার জন্য শিকড়গুলো বাঁকানো হাটুর অনুরূপ।

৪.৮. অন্যান্য এলাকা

ক্রান্তীয় উপ-চিরসবুজ অরণ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় স্পষ্ট ও উত্তমরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এশিয়ার মৌসুমী অরণ্যের প্রায় অনুরূপ অরণ্য পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশে শুষ্ক চিরসবুজ অরণ্য নামে পরিচিত। এই অরণ্যের উর্ধ্বাংশের চন্দ্রাতপ প্রধানত পাতাঝরা বৃক্ষের দ্বারা সৃষ্ট কিন্তু অরণ্যের নিচু স্তর চিরসবুজ বনানী দিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকা বিশেষ করে কিউবার পূর্ব কেন্দ্রীয় অংশ ; ত্রিনিদাদ, কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলার অংশবিশেষ এবং আমাজানিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে উপ-চিরসবুজ বন বিদ্যমান। এই বনগুলো অস্পষ্টভাবে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের সাথে মিশ্রিত হয়েছে।

৪.৮.১. কাঁটাবন : এই শ্রেণীর বন একদিকে উপমেরু এবং অন্যদিকে স্যাভানা অঞ্চলের বনানীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। একদিকে ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঋতুভিত্তিক অরণ্যের পর এবং অন্যদিকে আবার অন্য ঋতুভিত্তিক অরণ্য-কাঁটাবনের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। শুষ্ক ঋতুর পরিসর বৃদ্ধি এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাসের ফলে বনানীর পাতাঝরা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বনানী খর্ব, ঝোপ এবং গুল্মিল আকার ধারণ করে এবং গুল্ম মরু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বহন করে। স্যাভানা উদ্ভিদ ভূমি (কাঁটাবনের অনুরূপ জলবায়ুতে জন্মলাভ করে) হতে কাঁটাবনের পার্থক্য হচ্ছে কাঁটাবনের বনানীর বৈশিষ্ট্য মরু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ এবং কাঁটাবন হচ্ছে তৃণবিহীন। কাঁটাবনের অনেক ঝোপের বনানীর পাতা ক্ষুদ্র ও বলিষ্ঠ (tough), আবার অনেকগুলোর ক্ষতি সাধনের কাঁটা এবং মেরুদণ্ড (wicked thorn and spines) লক্ষ্য করা যায়। অনেক গাছ পানি সংরক্ষিত করে রাখে। কাঁটা উদ্ভিদ ভূমি এবং কাঁটা ঝোপ কাঁটা অরণ্যের ব্যতিক্রমধর্মী নাম বিশেষ। এগুলো কখনো কখনো মাইক্রোফাইলাস (microphyllous) অরণ্য নামেও পরিচিত। এই বনগুলো বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র আকারে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় লক্ষ্য করা যায়।

৪.৮.২. কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকা : ব্রাজিলের উত্তর পূর্বের পার্বত্য স্কন্ধভূমির কাটিঙ্গা (caatinga) হচ্ছে কাঁটা অরণ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাংশের অভ্যন্তর এলাকায় বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অনিশ্চিত। ফলে সাময়িক শুষ্ক অবস্থা প্রকাশ পায়। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০০ মি.মি. হতে ১,৫০০ মি.মি. (প্রায় ৩০" হতে ৬০")। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মোটামুটি পর্যাপ্ত হলেও প্রধানত নিম্নলিখিত কারণে জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমে শুষ্ক অবস্থা প্রকাশ পায়। প্রথমত, বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অনিশ্চিত ও অস্থির প্রকৃতির এবং মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, অতি স্বল্প সময়ভিত্তিক মাত্র কয়েক বার ভারী বর্ষণের মাধ্যমে বর্ণিত মোট বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। তৃতীয়ত, অতি উচ্চমাত্রার তাপের প্রভাবে মোট বৃষ্টিপাতের বেশি অংশ বাষ্পীভূত হয়। চতুর্থত, বন্ধুরতার দ্বারা বৃষ্টিচ্ছায় এলাকার সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর হতে এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। ভারী বৃষ্টিপাতের পরই শুষ্ক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মে মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দীর্ঘকালীন শুষ্ক ঋতু বিদ্যমান থাকে এবং এসময় আকাশও পরিষ্কার থাকে। তাপ ২৭° সে. (৮০° ফা.) এর নিচে নামে না। ফলে বাষ্পীভবনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

কাটিঙ্গার বনানী সাধারণত কম উচ্চতাবিশিষ্ট ঝোপ আকারের গাছ, কাঁটাযুক্ত গুল্ম এবং অনেক রসালো বনানী মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এসব বনানী শুষ্ক অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা ধারণ করে। আর্দ্রতর এলাকায় মিশ্র অবস্থায় বনানীগুলো ঘন অনেক সময় অপ্রবেশ্য ঝোপের সৃষ্টি করে। শুষ্কতর এলাকায় মোচড়ানো বা পাকানো বৈশিষ্ট্যের গাছ অদৃশ্য হয়ে পড়ে এবং কাঁটাযুক্ত ঝোপ এবং ক্যাকটাস প্রাধান্য বিস্তার করে। কাটিঙ্গার বনানী বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বর্ষা ঋতুতে বনানী সবুজ আকার ধারণ করে এবং ঘাস জন্মলাভ করে। শুষ্ক ঋতু আরম্ভ হওয়ায় পর ঘাস শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং অরণ্যের সবুজ বর্ণ অদৃশ্য হয়। শুষ্ক ঋতুর শেষে কাটিঙ্গা নগ্ন দৃশ্য প্রকাশ করে। কাটিঙ্গার বৈশিষ্ট্যমূলক উদ্ভিদ প্রজাতি হচ্ছে কাঁটাযুক্ত লজ্জাবতী ব্রোমিলিয়াড *(Encholirom spectabile), (Cereus* spp. and *Opuntia* spp.), মরুজাতীয় তাল বৃক্ষ বিশেষ এবং ব্রাজিলিয়ান বটল গাছ (*Cavanillesia arborea*)। বটল বৃক্ষের প্রসারিত কাণ্ডে (swollen trunks) পানি সংরক্ষিত থাকে।

নদী উপত্যকার আর্দ্র পলল মৃত্তিকায় তালজাতীয় বৃক্ষ, যেমন—কারনৌবা *(Copernicia cerifera Mart),* বাবাসু (*Orbignia speciosa Barb.* rod.) এবং পিটিসিকা (*Licania rigida* Benth.) লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক সময় এগুলো বড় কুঞ্জবন আকারে (groves) প্রকাশ পায়। শৈলশিরার উর্ধ্বাংশে বা সেরা এর (serra) অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিবহুল এলাকায় সমৃদ্ধ (luxuriant) বনানীর সমাবেশ প্রকাশ পায়। তালজাতীয় বৃক্ষ, কাঁটাযুক্ত গাছ ও বাঁশসহ বনানী পার্বত্য-উপ-পাতাঝরা ক্রান্তীয় অরণ্যের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর বন প্রায় বিলুপ্তির পথে। কাটিঙ্গার পূর্ব প্রান্তে উপমরু বনানী সমাবেশের উদ্ভিদ ভূমি বিদ্যমান। এই উদ্ভিদ ভূমিতে তলদেশীয় অতি বর্ধনশীল উদ্ভিদসহ দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ ভূমি অ্যাগ্রেস্টি (agreste) নামে পরিচিত এবং এগুলো উপকূলীয় বন ও কাটিঙ্গার মধ্যবর্তী সংক্রমিত এলাকা (transition zone) সৃষ্টি করেছে।

উত্তর আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের ব্যাপক এলাকায় বাবলা, মিমোসা এবং তাল গাছ *(Acacia, Mimosa* ও Palm) এর সমাবেশের মাধ্যমে কাঁটাযুক্ত শুষ্ক গুল্ম ও গুল্মজাতীয় বনের সৃষ্টি হয়েছে। এসব বনের অংশ বিশেষে স্থূল স্যাভানা প্রকাশ পায়। ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়ার ক্যারাবিও উপকূল, দক্ষিণ পশ্চিম মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু এলাকা যেমন—কিউবার কেন্দ্র এবং পশ্চিম জামাইকার উদ্ভিদ আকারের প্রবেশ্য চুনাপাথর কাঁটাবন গড়ে উঠেছে।

৪.৮.৩. আফ্রিকা : আফ্রিকায় বৃহৎ অবিচ্ছিন্ন কাঁটাবন ও কাঁটা গুল্ম লক্ষ্য করা যায় না। দক্ষিণ মোজাম্বিক ও নাটালের কেন্দ্রীয় এলাকার উত্তরাংশে মোটামুটি বড় আকারের কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ ভূমি বিদ্যমান। তানজানিয়া ও সুদানে বিক্ষিপ্ত আকারে ক্ষুদ্র এলাকায় এই শ্রেণীর বন লক্ষণীয়। আফ্রিকার ইস্টার্ন হর্ন-এর জলাশয় প্রান্ত এলাকায় কাঁটা বন গড়ে উঠেছে। ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের বালি বা চুনযুক্ত প্রবেশ্য মৃত্তিকায় বিক্ষিপ্ত মাইক্রোফাইলাস গাছ এবং গুল্ম লক্ষ্য করা যায়।

৪.৮.৪. **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া :** দক্ষিণ আমেরিকার কাটিঙ্গার অনুরূপ বন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান। এই শ্রেণীর বন ভারতের থর মরুভূমির পূর্ব এবং দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্র এলাকার দক্ষিণের ব্যাপক অংশে প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর পূর্ব শ্রীলংকা, মায়ানমারের ইরাওয়াদি উপত্যকার শুষ্ক অঞ্চল, থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় এলাকা ও কোরাট মালভূমি এবং সাবেক ইন্দোচীনের এলাকা বিশেষে কাঁটা বন লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী অরণ্যের পরিবর্তিত উন্মুক্ত আকারের অরণ্যাংশই হচ্ছে এই শ্রেণীর বন। নিম্নমানের উর্বর ও পানিপ্রবেশ্য বৈশিষ্ট্যের মৃত্তিকা এলাকায় যেখানে বছরে গড়ে ১,০০০ মি.মি. বা এর কম পরিমাণ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়, সেসব এলাকায় এই শ্রেণীর বন গড়ে উঠেছে। বনানীগুলো পাতাঝরা বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই বনগুলোর স্থানীয় নাম হচ্ছে মায়ানমারে ইনড্যাইং (indaing) এবং থাইল্যান্ডের প্যাডঙ্গ (padeng)।

৪.৮.৫. **অস্ট্রেলিয়া :** অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরের ব্যাপক এলাকায় কাঁটাবনের অনুরূপ বন লক্ষ্য করা যায়। এইসব বনে অন্যান্য বনের অনুরূপ কাঁটাযুক্ত গাছ বিদ্যমান নয়। যেসব এলাকার মৃত্তিকা বালিজাতীয় বা নুড়িময় প্রকৃতির সেসব এলাকা শুষ্ক বৈশিষ্ট্য বহন করে। এসব এলাকায় শুষ্ক গুল্মজাতীয় বনানী বিশেষ করে বাবলা প্রজাতির বনানীর প্রাধান্য প্রকাশ পায়। এজাতীয় বনে স্বল্প উচ্চতা (৩ মি. হতে ৭.৫ মি.) মুলগাই হচ্ছে প্রধান বনানী। এই গাছগুলোর শাখা ভূমির সন্নিকটে গড়ে উঠে। মুলগা গুল্ম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জন্মে থাকে। কুইন্সল্যান্ডের অভ্যন্তরভাগে বিগালো গুল্ম *(Acacia harpophylla)* লক্ষ্য করা যায়। এগুলো সচরাচর স্যাভানা উদ্ভিদভূমির সাথে সংযুক্ত থাকে। কুইন্সল্যান্ডে অস্ট্রেলীয় বটল গাছ *(Sterculia* spp.) লক্ষণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃণ ভূমি পরিচয়

৫.০. তৃণ উদ্ভিদ

Gramineae গোত্রের অন্তর্গত এক ধরনের বীজপত্রী বনানীর সদস্য হচ্ছে তৃণ। অর্থাৎ বনানীর একটিমাত্র বীজপত্র বিদ্যমান থাকলে সেটি একবীজপত্রী বা তৃণ গোত্রে পরিচিত হবে। লতাজাতীয় বনানীর কাষ্ঠবিহীন দেহ কাঠামো এবং শিকড় তৃণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির তৃণ নির্ণীত হয়েছে। সবজিজাতীয় বনানীর মধ্যে তৃণের গোত্র কেবল বৃহৎই নয়, বরং তৃণের কিছু সদস্য বিশেষ করে চাষকৃত তৃণ বা দানা শস্য (domesticated grasses or cereals) মানুষের জন্য এককভাবে গুরুত্ব বহন করে। তৃণের কাণ্ড (culm) নলাকার। প্রতি কাণ্ড বা ডাঁটার অংশে স্পষ্ট গ্রন্থি বা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত কঠিন অংশ বিদ্যমান থাকে। কাণ্ডের উভয় পাশে পালাক্রমে পাতা সজ্জিত থাকে এবং পাতাগুলো সাধারণত রৈখিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। পাতার নিম্নাংশ ফাটল (split) আকারের পত্রাবরণ (sheath) কাণ্ডকে ঘিরে রাখে। সকল তৃণ হয় গমের অনুরূপ শস্য মঞ্জরিতে (spike), না হয় ওট আকারের প্যানিকলে (panicle) পুষ্প ধারণ করে।

তৃণ তিন প্রকার যথা—(ক) বর্ষজীবী (Annuals)—যেগুলো বছরে একবার জীবনচক্র শেষ করে ; (খ) দ্বিবর্ষজীবী (Biennials)— যেগুলো এক বছরের শেষে অঙ্কুরোদগম ঘটায় এবং পরের বছরে ফুল ও বীজ উৎপাদন করে ; এবং (গ) বহুবর্ষজীবী যেগুলো সবসময় ক্রমবিকাশ লাভ করে। অনেক বহুবর্ষজীবী ঘাস বংশবিস্তার সংঘটিত হয়। এই অভিক্ষিপ্ততা দুই প্রকার (ক) স্টোলন (stolons)–এই পদ্ধতির মাধ্যমে তৃণ ভূমিপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করে এবং (খ) রাইজোম (Rhizomes) দিয়ে তৃণ মৃত্তিকা তলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ভূমিতে তৃণের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় এবং যে কোনো পরিবেশীয় সেটের অবস্থায় (any set of environmental condition) তৃণ জন্মলাভ করে। যেসব স্থানে গাছ ও ঝোপ প্রচুর সংখ্যায় বিকশিত হতে পারে না, সেসব স্থানে তৃণের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মিঠা পানিতে কিছু সংখ্যক তৃণ জন্মলাভ করলেও সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যের (marine form) পানিতে কোনো তৃণ লক্ষ্য করা যায় না। তৃণের দৈর্ঘ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কয়েক ইঞ্চি হতে ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তৃণ লক্ষ্য করা যায়। বাঁশ তৃণ গোত্রের অন্তর্গত এবং এটি ১০০ (৩০ মি.) উচ্চতাও প্রকাশ করে। উচ্চ অক্ষাংশীয় মৃদু শীতল (cooler) এলাকার তৃণ অপেক্ষা ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ "সামাজিক" স্বভাবের ("social habit") দৃষ্টিকোণ থেকেও তৃণসমূহকে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে (ক) তৃণাচ্ছিদ (turf) অর্থাৎ ভূমির পৃষ্ঠ সম্পূর্ণভাবে তৃণের আবরণ দ্বারা পূর্ণ করে থাকে এবং এগুলো কেবল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় ; (খ) গুচ্ছাকৃত (tuft) অর্থাৎ যে প্রকার তৃণ গুচ্ছ আকারে প্রকাশ পায় এবং এগুলো সম্পূর্ণ ভূমি আচ্ছাদিত করে না, যেমন টাসক তৃণ (tussock grasses)। তৃণের

প্রধান প্রধান গণ হচ্ছে আগ্রোসটিস, আগ্রোপাইরোন, আনড্রোপোগোন, ফেসটুকা, প্যানিকাম, পোয়া এবং স্টিপা *(Agrostis, Agropyron, Andropogon, Festuca, Panicum, Poa* ও *Stipa)*।

পৃথিবীর বৃহৎ তৃণ অঞ্চলে তৃণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। কারণ এসব অঞ্চলে হয় বৃষ্টি ও বরফপাতের পরিমাণ অতি নগণ্য, নয় বৃষ্টি ও বরফপাত অত্যন্ত সাময়িক ও ঋতুভিত্তিক। ফলে এসব অঞ্চলে গাছ অথবা গুল্ম জন্মলাভ করে টিকে থাকতে পারে না। প্রায় সকল তৃণ সম্প্রদায় একের অধিক তৃণ সঙ্ঘের সাহায্যে গঠিত। বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ অপেক্ষা বহুবর্ষজীবী তৃণের সংখ্যা বেশি এবং শেষের তৃণ সম্প্রদায় তৃণভূমিতে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। একক তৃণ এমনকি একক তৃণ প্রজাতিও ব্যাপক এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। পালক সদৃশ-তৃণ প্রজাতি যেমন *stipa argention*-র পাতায় প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। হ্রস্বাকৃতি ও গুচ্ছবিশিষ্ট *(Themeda trianda)* দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ডের (veld) ব্যাপক এলাকা এবং মেষের খাদ্যের তৃণ (*Festuca ovina* or sheep's fescue) ক্যালিফোর্নিয়ার পেনাইনের চুনাপাথর তৃণ ভূমির প্রধান তৃণ।

পূর্বের মতবাদ পর্যায়ক্রমিক বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির উদ্ভব সম্বন্ধে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত হচ্ছে যে, তৃণভূমির উদ্ভব সত্যিকার অর্থে জলবায়ুর চরম পর্যায় নির্দেশ করে না। এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তৃণভূমি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে মানুষ দিয়ে সৃষ্ট। গাছ পরিষ্করণ, স্থান পরিবর্তন, চাষ এবং দীর্ঘকালভিত্তিক আগুন দিয়ে সাময়িক পোড়ানো কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

অতীতে বনানী পোড়ানো কার্যক্রম যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি বর্তমানেও প্রাচীন ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যে এই কার্যক্রম বিদ্যমান। বিভিন্ন কারণ যেমন ফসল চাষের জমি উদ্ধার বা বৃদ্ধি, উন্নত পর্যায়ের চারণভূমি সৃষ্টি, শিকারের জন্য প্রাণী তাড়ানো ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য এই পোড়ানো কাজ গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অরণ্যের আয়তন কমে তৃণভূমি ও মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। অরণ্য এলাকার এই হ্রাস বন্ধ করার জন্য হ্রাসকৃত এলাকায় বনায়ন করা অপরিহার্য। ধারণা করা হয় যে, মানুষের হস্তক্ষেপ বন্ধ হলে অরণ্যের প্রান্ত এলাকায় অরণ্যের গাছ বিস্তার লাভ করবে। তৃণভূমি এলাকায় এভাবে গাছ বিস্তার লাভ করবে কি-না তার উপর অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তৃণভূমি মানুষ দিয়ে সৃষ্ট বা পোড়ানো কার্যক্রম (প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যুৎ চমক হতে সৃষ্ট) দ্বারা রক্ষিত মতবাদের সমর্থক থাকলেও বর্ণিত নিয়ামকগুলো পৃথিবীর সকল তৃণভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি, ক্যামপোজের কিছু এলাকা বন পরিষ্কার ও পোড়ানো কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট হলেও এটা ধারণা করা কঠিন যে, তৃণভূমির যেসব এলাকায় অতীতে স্বল্প সংখ্যক বসতি ছিল এবং এখনও নগণ্য সংখ্যক বসতি বিদ্যমান সেসব এলাকা মানুষের প্রতিবন্ধকতারূপ কার্যক্রমের কারণে অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে তৃণভূমিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আফ্রিকার স্যাভানা তৃণভূমির সুদান এলাকার অংশবিশেষ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। কারণ সুদানে অতীতকাল হতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় মানুষের বসতি বিদ্যমান আছে।

অগ্নিজাত মতবাদ (Pyrogenic theory) ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানী তৃণভূমির উৎপত্তির ক্ষেত্রে মৃৎবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নিয়ামকের (pedological factors) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জলবায়ুর সম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলের বনানী জীবনের সমরূপতার আলোকে বিজ্ঞানী ট্রল (Troll) জলবায়ুর নিয়ামকের সাহায্যে তৃণভূমির উৎপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ব্রাজিলের তৃণভূমির উদ্ভূতির আলোকে বিজ্ঞানী কোল (Cole) দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানার উৎপত্তি ও বিস্তারণের ক্ষেত্রে মতবাদ উপস্থাপন করেছেন যে, বর্তমানের দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানার বিস্তারণ কেবল জলবায়ুগত, ভূমিজ এবং জীবজ নিয়ামকের প্রভাবের ভূমিকা এককভাবে বা যৌথভাবে পালন করেনি বরং ভূচিত্র বা ভূদৃশ্যের ক্রমবিকাশ (landscape evolution) এবং জলবায়ুর পরিবর্তনও এর সাথে জড়িত। তিনি বনানীর গতীয় বা যান্ত্রিক প্রকৃতি বিবেচনা করে উদ্ভিদকুলের এর বয়স এবং ভূদৃশ্যের ভূ-প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের সাহায্যে স্যাভানা অরণ্য-অঞ্চলের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে লক্ষণীয় যে, অতীতকাল হতে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা বা পরিবর্তন ঘটেনি। তাই ধারণা করা হয়, এই অরণ্য-অঞ্চল প্রধানত জলবায়ুর উপাদান, তাপ, বৃষ্টিপাত এবং বাষ্পীভবনের যৌথ প্রকাশ। নাতিশীতোষ্ণ বা ক্রান্তীয় অরণ্য যাই হোক না কেন, এগুলোর প্রাচীনতা ও ব্যাপক বিস্তৃতি প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। চারণশীল প্রাণীর ক্রমবিকাশকে তৃণভূমি সাহায্য করেছে।

তৃণভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে সহজ এবং সমাধানযোগ্য সঠিক উত্তর এখনো মিলেনি। বাস্তবে জলবায়ুজ, ভূমিজ, জীবজ, তাপজ, এবং নৃ-অথবা মানুষের কার্যকলাপের (anthropogenic) প্রভাব এককভাবে বা পৃথকভাবে পৃথিবীর তৃণভূমির উৎপত্তি এবং রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

৫.১. ক্রান্তীয় তৃণভূমি

ক্রান্তীয় বলয়ের ব্যাপক তৃণভূমি আমেরিন্ডিয়ান (Amerindian) শব্দ স্যাভানা (Savanna) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অরণ্যসহ ঘাস দিয়ে নয় বরং কেবল ঘাসের সাহায্যে আচ্ছাদিত বৃহৎ এলাকাগুলোকে পূর্বে এই শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে ঘাস ও গাছ দিয়ে আচ্ছাদিত অঞ্চলকেও স্যাভানা নামে প্রকাশ করা হয়। তাই এই শব্দ ব্যাপক বনানী সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন গাছবিহীন তৃণভূমি হতে বৃক্ষ মধ্যবর্তী ডট আকারে (dotted) বিস্তৃত তৃণ বা ঘাস, সাধারণত পার্কের স্টাইলে ঘাসসহ গাছ ও গুল্মের অবিচ্ছিন্ন আবরণ অঞ্চল বোঝায়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাসমূহে আর্দ্র ও শুষ্ক ক্রান্তীয় জলবায়ু প্রকাশ পায়। অঞ্চলটির পর্যায়ক্রমিক আর্দ্র ও শুষ্ক ঋতুর স্থায়িত্বকালের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বাৎসরিক গড় তাপ ২১° সে. (৭০° ফা.) এর কাছাকাছি হলেও গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপ ৩২° সে. (৯০° ফা.) প্রকাশ পায়। বাৎসরিক তাপের ব্যতিক্রম মাত্র ১১° সে. (২০° ফা.)। স্পষ্ট মৃদু শীতল শীত ঋতুর পর তাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে গ্রীষ্মকালে ভারি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এবং এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থানভেদে ৩০" হতে ৬০" (৭৬২-১,৫২৪ মি.মি.) লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর এই ঋতুভিত্তিক ছন্দ এবং শুষ্ক

বৃক্ষের পরিবর্ধনের প্রতিকূল অবস্থা বা সীমা নির্ধারণ করে থাকে। এই অবস্থা গতানুগতিক জলবায়ুভিত্তিক তৃণভূমির উৎপত্তির মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন গঠন-কাঠামোর স্যাভানা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ; নিরক্ষীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য প্রান্তের উত্তর ও দক্ষিণ এলাকা ; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক এলাকা এবং ক্রান্তীয় উত্তর অস্ট্রেলিয়ার এক বিস্তীর্ণ বলয়ে অবস্থিত (মানচিত্র ৫.অ)।

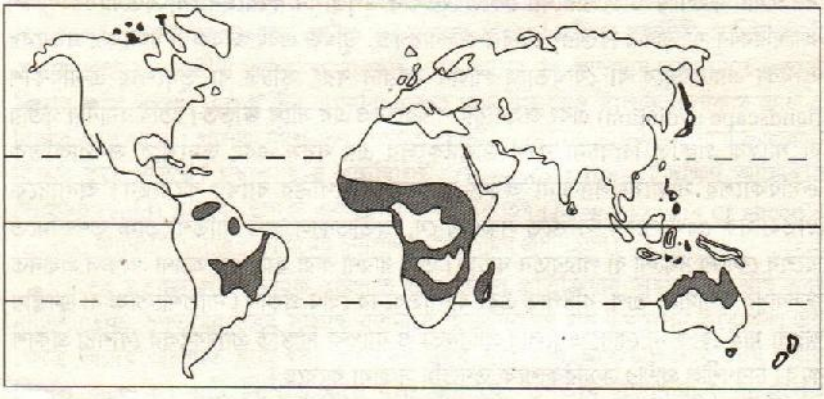

মানচিত্র ৫. অ. ▬ ক্রান্তীয় তৃণভূমি।

৫.১.১. দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : দক্ষিণ আমেরিকার মালভূমি এবং অরিনোকো উপত্যকার ব্যাপক এলাকায় স্যাভানা বিদ্যমান। দুটি শ্রেণী যথা—(১) প্রায় সকল উচ্চভূমির শুষ্ক স্যাভানা এবং (২) নিম্নসমভূমি এলাকার আর্দ্র স্যাভানা দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্যমান। উত্তর পানি নিষ্কাশিত ও শুষ্ক শীত ঋতুবিশিষ্ট এলাকায় শুষ্ক ও স্থূলজাতীয় তৃণ লক্ষ্য করা যায়। ঘাসের দৈর্ঘ্য ৩ হতে ৮ এর মধ্যে বিদ্যমান। মাঝে মধ্যে দীর্ঘ গাছ, গুল্ম ও ঘাসের গুচ্ছ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রধানত তৃণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। ওরিনোকো উপত্যকা, ব্রাজিলের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং প্যারাগুয়ের অংশবিশেষের স্বাভাবিক বন্যা কবলিত এলাকায় আর্দ্র স্যাভানা গড়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর তৃণভূমিতে সমৃদ্ধতর তৃণ জন্মলাভ করে এবং গাছের অনুপস্থিতি কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাজিল মালভূমির তৃণভূমি ক্যামপোস (campos) এবং অরিনোকো উপত্যকার তৃণভূমি ল্যানোস (Lanos) নামে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানার গঠন-কাঠামো নিরীক্ষা করলে কমপক্ষে পাঁচ প্রকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হচ্ছে সেররাডো, ক্যাম্পোসেররাডো, ক্যামপো, সুজো, ক্যামপো লিম্পো এবং প্যানটানাল (Cerradao, Campo, Cerrado, Campo Sujo, Campo Limpo ও Pantanal)। মোটামুটি ঘনসন্নিবিষ্ট ৯ মি. হতে ১১ মি. (প্রায় ৩০-৪০) উচ্চতাবিশিষ্ট উপ-চিরসবুজ গাছের সমাবেশ সেররাডোও শ্রেণীর স্যাভানায় লক্ষ্য করা যায়। এজন্য গাছগুলোর সাহায্যে সৃষ্ট প্রায় অবিচ্ছিন্ন চন্দ্রাতপ প্রকাশ পায়। তলদেশে মোটামুটি সমৃদ্ধশীল লতা ও ঘাস বিদ্যমান। ব্রাজিল মালভূমির পূর্ব-প্রান্তীয় উচ্চভূমি বরাবর এই শ্রেণীর স্যাভানা অবস্থিত। ক্যাম্পো সিররাডো

হচ্ছে গাছসদৃশ তৃণভূমি (treed grassland)। প্রায় ৩.৫ মিটার হতে ৭ মিটার (প্রায় ১২–২৪) দীর্ঘ জট পাকানো গাছসহ তৃণের সমাবেশ এই শ্রেণীর তৃণভূমিতে বিদ্যমান। বৃক্ষগুলো সাধারণত অপরিচ্ছিন্ন এবং লিকলিকে রোগা (untidy and scraggy) দৃশ্যের অবতারণা করে। বৃক্ষের বৃহৎ পাতা শাখার ডগায় গোলাপসদৃশ থোকা তৈরি করে এবং পাতাগুলো কখনও কখনও শক্ত ও চর্মসদৃশ ; আবার কখনও কখনও পাতার পৃষ্ঠের বুনন কর্কশ ও লোমসদৃশ চিত্র প্রকাশ করে। তৃণাঞ্চলটির অনেক গাছ শুঁটি গোত্রের অন্তর্গত। ক্যাম্পো সুজো প্রধানত তৃণাবৃত স্যাভানা। এখানে সেখানে ৬ হতে ৯ (১.৮–২.৭ মি.) উচ্চতাবিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গাছ লক্ষ্য করা যায়। ক্যাম্পো ও লিম্পো হচ্ছে গাছ ও লতাবিহীন তৃণভূমি।

মালভূমির উঁচু অভ্যন্তরভাগ বা মাটো গ্রাসো, গোয়িয়াজ এবং মিনাজ জেরায়িস-এর চাপাডোজে (Chapodoes of the Mato Grasso, Goias and Minas Gerais) স্যাভানার প্রধান তৃণ বলয় অবস্থিত। ক্যাম্পো তৃণভূমি লিম্পো মালভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত ; প্রান্ত এলাকার দিকে যথাক্রমে ক্যাম্পো সুজো এবং ক্যাম্পো সেররাডো গড়ে উঠেছে। তৃণ প্রাধান্য স্যাভানা হচ্ছে ক্যাম্পোজ সেররাডো বাহিয়া, সেরপাইপ অ্যালগোয়া এবং পারনা বুকোর এবং এগুলো উপকূলীয় ট্যাবুলিওরোগুলোতে বিদ্যমান। এগুলো ছাড়াও আমাজানের উত্তরের আমাপা এবং ক্যারিবিও এলাকায় এই শ্রেণীর স্যাভানার প্রকাশ লক্ষণীয়।

অরিনোকো সমভূমির ল্যানাসে তৃণের প্রাধান্য বিদ্যমান। এই তৃণভূমিতে বিক্ষিপ্ত গাছ এবং মাঝে মাঝে কুঞ্জবন (groves) লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত অপ্রবেশ্য ভারি মৃত্তিকা (heavy and not very permeable soils) বর্ষা ঋতুতে জলাবদ্ধ অবস্থা প্রকাশ করে। ফলে গাছ জন্মলাভ করে না। এই ঋতুতে নিচু এলাকাগুলোতে বন্যা দেখা দেয়। শুষ্ক ঋতুর শেষে গোচারণে নিযুক্ত লোকজন শুষ্ক ঘাস নিয়মিত পুড়িয়ে ফেলে। ফলে নতুন ঘাস জন্মলাভ করে। এই সকল তৃণভূমিতে আগুন সহ্যকারী জাতীয় *Caparnicia tectorum* তালগাছের উপস্থিতিও অতীতকালের আগুনের পোড়ানো কার্যক্রম নির্দেশ করে।

দক্ষিণ–পশ্চিমাংশের ম্যাটো গ্রাছো (Mato Grasso) হচ্ছে নিম্ন সমভূমি এলাকা। প্যারাগুয়ে এবং এর উপনদী ও শাখানদীসমূহের বন্যার পানি উপকূল উপচিয়ে নিম্নভূমিতে পতিত হয়ে সাময়িক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে—এটি পানটানাল (Pantanal) নামে পরিচিত। ঋতুভিত্তিক এই বন্যা ৬ মাস (ডিসেম্বর হতে মে) ব্যাপী বিদ্যমান থাকে। ছয় মাস পর বন্যা মুক্ত এলাকায় সমৃদ্ধ ঘাস জন্মে এবং ঘাসগুলো গো পালনের (cattle rearing) জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নিম্ন এলাকাসমূহে ঘাস এবং সংলগ্ন বন্যাকবলিত এলাকার ঊর্ধ্বে অবস্থিত এলাকায় গাছের সমাবেশের বিক্ষিপ্ত অবস্থান এবং শেষে অধিক উঁচু এলাকায় বনানীসহ ক্যাম্পো সেররাডো এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং এই শ্রেণীর তৃণভূমি উঁচু পানটানাল নামে পরিচিত।

৫.১.২. আফ্রিকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : আফ্রিকার স্যাভানা অন্য যে কোনো মহাদেশ অপেক্ষা ব্যাপক এলাকায় বিদ্যমান। নিরক্ষীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যকে ঘিরে অশ্বক্ষুরাকৃতি বলয় আকারে এই তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। এটি প্রায় ১৫° উত্তর এবং দক্ষিণে প্রায় ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্যাভানা মালাগাছির পশ্চিমাংশেও লক্ষ্য করা যায়। তৃণ আবরণের ভিত্তিতে সান্তজ ও মারবাট (Shantz and Marbut) আফ্রিকার তৃণভূমিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে "দীর্ঘ ঘাস হ্রস্ব বৃক্ষের স্যাভানা" ("High grass low tree

savanna"), দ্বিতীয়টি "বাবলা–দীর্ঘতৃণের স্যাভানা" (Acacia tall grass savanna) এবং তৃতীয়টি হচ্ছে "বাবলা–মরুতৃণের স্যাভানা" ("Acacia desert grass savanna")। এই তিন শ্রেণী সাধারণভাবে যথাক্রমে স্যাভানা উদ্ভিদ ভূমি, স্যাভানা পার্ক ভূমি এবং গুল্ম স্যাভানা নামে পরিচিত। এই তিন শ্রেণীতে গাছের বিস্তারণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান এবং কাঠামো ও প্রজাতিগত তারতম্য স্পষ্ট নয়। এই শ্রেণীগুলো অস্পষ্টভাবে একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। তিন থেকে ছয় মাস স্থায়িত্বকালের শুষ্কতা এই তিন শ্রেণীর বনানী এলাকায় প্রতিফলিত হয়।

স্যাভানা উদ্ভিদভূমি বা "দীর্ঘ ঘাস হ্রস্ব বৃক্ষের স্যাভানা" পর্তুগীজ গিনি হতে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় নাইজেরিয়ার মধ্য দিয়ে উগান্ডা, পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দোলায়মান (swings) আকারে দক্ষিণ পশ্চিম জায়ারের মধ্য দিয়ে উত্তর আঙ্গোলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। যে সকল এলাকায় অরণ্যের অব্যবহিত অংশে স্যাভানা বিদ্যমান সেই সকল অংশে আন্তঃঅঙ্গুলিসদৃশ অরণ্যাংশের অনুপ্রবেশ স্যাভানা তৃণভূমিতে লক্ষণীয়। তৃণের দৈর্ঘ্য ১.৫ মি. হতে ৩ মি. (৫–১০) এবং তৃণগুলো দ্রুত বর্ধনশীল কর্কশ, শক্ত ও কঠিন। এখানে প্রবেশ করা অতি কষ্টকর। এই শ্রেণীর তৃণ "হস্তিঘাস" (elephant grass) নামে পরিচিত এবং এই অরণ্যে এই ঘাস বা তৃণ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই তৃণভূমিতে নগণ্য সংখ্যক চিরসবুজ বৃক্ষসহ বহু সংখ্যায় পাতাঝরা বৃক্ষ বিদ্যমান এবং বৃক্ষের উচ্চতা ৯ মি. হতে ১৩.৫ মিটারের (৩০–৪৫) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বাবলাজাতীয় বৃক্ষই হচ্ছে এই তৃণভূমির প্রধান গাছ। তদুপরি Leguminosae–এর কিছু সদস্য এবং বোতল আকারে কাণ্ডবিশিষ্ট বাওবাব *(Adansonia digitata)* লক্ষ্য করা যায়।

"বাবলা–দীর্ঘ তৃণের স্যাভানা" বা স্যাভানা পার্কভূমি উচ্চ তৃণ–নিম্ন বৃক্ষ স্যাভানাকে দীর্ঘ বৃত্তের পরিধির (great arc) আকারে বেষ্টন করে রয়েছে। এই অরণ্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং দীর্ঘতর শুষ্ক ঋতু বিদ্যমান। প্রায় ২ হতে ৫ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট টাসক তৃণের প্রাধান্য এই তৃণভূমিতে লক্ষণীয় এবং টাসক এই তৃণভূমির পৃষ্ঠকে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবৃত করে রেখেছে। পাতাঝরা বৈশিষ্ট্যের বাবলা ও কমব্রেটাম *(Combretum)* বৃক্ষ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই তৃণভূমিতে বিদ্যমান। পশ্চিম তানজানিয়া, জাম্বিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব আঙ্গোলার মিয়োম্বো উদ্ভিদভূমি (Miombo woodland) ব্যাপক এলাকা দখল করে রয়েছে। এই উদ্ভিদভূমি ৮ মি. হতে ১৩.৫ মি. (৩০–৪৫) উচ্চতাবিশিষ্ট গাছসহ *Brachysteiai soberlinia* বিদ্যমান। এর ভূমি আবরণ হচ্ছে হ্রস্বাকৃতি টাসক তৃণ।

স্যাভানা পার্কভূমি ক্রমান্বয়ে "বাবলা–মরু তৃণের স্যাভানায়" মিশ্রিত হয়েছে। উপমেরু এলাকা, যেখানে ৩০° (৭৬২ মি.মি.) বৃষ্টিপাত প্রকাশ পায় এবং যেখানে ৬ মাস হতে ৭ মাস শুষ্ক ঋতু বিদ্যমান থাকে সেসব এলাকায় এই শ্রেণীর তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। এই তৃণভূমিতে *Aristida* প্রজাতির মরুতৃণ বিচ্ছিন্ন আবরণ সৃষ্টি করেছে এবং ক্ষুদ্রাকৃতি পাতাঝরা বাবলা গাছ ও কাঁটাযুক্ত ঝোপও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। শুষ্ক ঋতুতে গাছ পাতাবিহীন এবং ঘাস ঈষৎ দগ্ধ অবস্থা প্রকাশ করে।

আফ্রিকার ক্রান্তীয় তৃণভূমির উৎপত্তির সঠিক তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। বিজ্ঞানী সান্টজ ও মারবাট (১৯২৩), স্টেবিং (১৯৩৭) এবং বেনেট (১৯৫৬) এর বনাঞ্চলের তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক মন্তব্য হচ্ছে যে, আফ্রিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চল সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে এবং

এলাকাগুলো তৃণভূমিতে পরিণত হচ্ছে। কারণ হচ্ছে পুরাযুগীয় চাষ পদ্ধতি, আগুন দিয়ে পোড়ানো এবং পশু চারণ। অন্যদিকে আবার সমালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, অরণ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট তৃণভূমিতে বিদ্যমান প্রাণিকুলের উদ্ভবের ব্যাখ্যা নিয়ামকগুলোর সাহায্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নি।

৫.১.৩. অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : দক্ষিণ পশ্চিম কুইন্সল্যান্ড হতে বার্কলি টেবল্‌ল্যান্ডের মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ব্যাপক বলয়ের স্যাভানা অরণ্য ক্রান্তীয় অস্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান। অন্যান্য মহাদেশের অনুরূপ স্যাভানার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও প্রধানত দুটি শ্রেণীতে এখানকার স্যাভানাকে (তৃণভূমি) বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্যাভানা উদ্ভিদভূমি (Savanna woodland) এবং স্যাভানা তৃণভূমি (Savanna grassland)। শেষেরটি ক্রান্তীয় টাসক তৃণভূমি (tropical tussock grass land) নামেও পরিচিত এবং এই শ্রেণীর তৃণভূমি বৃক্ষশূন্য। যেসব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫" হতে ৩০" (৩৮১–৭৬২ মি.মি.) সেসব এলাকায় এই তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার তৃণ এখানে বিদ্যমান। হালকা হরিদ্রাভ মিচের তৃণ (*Astrebla* spp.), লোহিত ফ্লিন্ডারস তৃণ (*Iseilema* spp.) এবং ক্যাঙ্গারু তৃণ (*Thomeda australis*) হচ্ছে প্রধান। যেসব তৃণভূমিতে গাছ লক্ষণীয় সেই সকল গাছ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। বাবলা হচ্ছে প্রধান গাছ। কিন্তু কিছু ইউক্যালিপটাসও লক্ষ্য করা যায়। ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ৩০" হতে ৫০" (৭৬২–১,২৭০ মি.মি.) বৃষ্টিপাত সংঘটিত এলাকায় স্যাভানা উদ্ভিদভূমি গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কুইন্সল্যান্ড এবং বার্কলি টেবল ল্যান্ডে এই শ্রেণীর তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালীন মোটামুটি ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে দীর্ঘাকৃতি (২.৫ মি. বা ৮ ফুটের কাছাকাছি) তৃণের ক্রমবিকাশ ঘটে। কিন্তু স্যাভানা তৃণভূমির ঘাসের দৈর্ঘ্য ০.৫ মি. হতে ১ মিটারের মধ্যে প্রকাশ পায়। নীল ঘাস আর্দ্রতর এলাকায় জন্মে। স্যাভানা উদ্ভিদ ভূমিতে ব্লাড উড (*Eucalyptus gummifera*), ব্ল্যাক বাট (*E. pilularis*) এবং স্ক্রিবলি গাম (*E. haemostoms*) বৃক্ষ প্রধান।

৫.১.৪. এশিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : বাস্তবে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক এলাকায় স্যাভানা তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায় না। ক্ষুদ্রাকৃতি ইনক্লেভ (enclaves) আকারে মধ্যম দৈর্ঘ্যের ঘাসবিশিষ্ট এই শ্রেণীর তৃণভূমি–বনাঞ্চল বা প্রগাঢ় কর্ষিত এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ–পাক ভারত–উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম অংশ এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাংশের তৃণভূমিগুলোকে স্যাভানা নামে চিহ্নিত করা যায়। ভূগোলবিদ ডবি এশিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন—

> মায়ানমার (সাবেক বার্মা), সিয়াম, ইন্দোচীন এবং পূর্ব–ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (eastern indies) ব্যাপক এলাকায় মৌসুমী অরণ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রজন্মের স্যাভানার বিকাশ ঘটেছে। দীর্ঘ, কর্কশ (rough) ঘাসের সাথে বিক্ষিপ্ত বাঁশঝাড় বা স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ দ্বারা উন্মুক্ত প্রান্তর শ্রেণীর তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। এই উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকালীন শুষ্কতা ও নিম্নমান বা পানিপ্রবেশ্য মৃত্তিকার কারণে ঘটেছে। স্যাভানা মৌসুমী–শুষ্ক অরণ্যের সাথে ক্রমান্বয়ে মিশে গেছে। এই সকল অরণ্যের বনানী হচ্ছে কাঁটাযুক্ত নাশপাতি গাছ (prickly pears), কন্টকবহুল নাগফনীসদৃশ গাছ এবং অনুরূপ কাঁটাযুক্ত গাছ।[১]

১. Robinson, H. (1972) : Biogeography, p. 289.

এলাকাগুলো তৃণভূমিতে পরিণত হচ্ছে। কারণ হচ্ছে পুরাযুগীয় চাষ পদ্ধতি, আগুন দিয়ে পোড়ানো এবং পশু চারণ। অন্যদিকে আবার সমালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, অরণ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট তৃণভূমিতে বিদ্যমান প্রাণিকুলের উদ্ভবের ব্যাখ্যা নিয়ামকগুলোর সাহায্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নি।

৫.১.৩. অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : দক্ষিণ পশ্চিম কুইন্সল্যান্ড হতে বার্কলি টেবল্‌ল্যান্ডের মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ব্যাপক বলয়ের স্যাভানা অরণ্য ক্রান্তীয় অস্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান। অন্যান্য মহাদেশের অনুরূপ স্যাভানার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও প্রধানত দুটি শ্রেণীতে এখানকার স্যাভানাকে (তৃণভূমি) বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্যাভানা উদ্ভিদভূমি (Savanna woodland) এবং স্যাভানা তৃণভূমি (Savanna grassland)। শেষেরটি ক্রান্তীয় টাসক তৃণভূমি (tropical tussock grass land) নামেও পরিচিত এবং এই শ্রেণীর তৃণভূমি বৃক্ষশূন্য। যেসব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫" হতে ৩০" (৩৮১–৭৬২ মি.মি.) সেসব এলাকায় এই তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার তৃণ এখানে বিদ্যমান। হালকা হরিদ্রাভ মিচের তৃণ (*Astrebia* spp.), লোহিত ফ্লিন্ডারস তৃণ (*Iseilema* spp.) এবং ক্যাঙ্গারু তৃণ (*Thomeda australis*) হচ্ছে প্রধান। যেসব তৃণভূমিতে গাছ লক্ষণীয় সেই সকল গাছ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। বাবলা হচ্ছে প্রধান গাছ। কিন্তু কিছু ইউক্যালিপটাসও লক্ষ্য করা যায়। ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ৩০" হতে ৫০" (৭৬২–১,২৭০ মি.মি.) বৃষ্টিপাত সংঘটিত এলাকায় স্যাভানা উদ্ভিদভূমি গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কুইন্সল্যান্ড এবং বার্কলি টেবল ল্যান্ডে এই শ্রেণীর তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালীন মোটামুটি ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে দীর্ঘাকৃতি (২.৫ মি. বা ৮ ফুটের কাছাকাছি) তৃণের ক্রমবিকাশ ঘটে। কিন্তু স্যাভানা তৃণভূমির ঘাসের দৈর্ঘ্য ০.৫ মি. হতে ১ মিটারের মধ্যে প্রকাশ পায়। নীল ঘাস আর্দ্রতর এলাকায় জন্মে। স্যাভানা উদ্ভিদ ভূমিতে ব্লাড উড (*Eucalyptus gummifera*), ব্ল্যাক বাট (*E. pilularis*) এবং স্ক্রিবলি গাম (*E. haemostoms*) বৃক্ষ প্রধান।

৫.১.৪. এশিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি : বাস্তবে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক এলাকায় স্যাভানা তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায় না। ক্ষুদ্রাকৃতি ইনক্লেভ (enclaves) আকারে মধ্যম দৈর্ঘ্যের ঘাসবিশিষ্ট এই শ্রেণীর তৃণভূমি–বনাঞ্চল বা প্রগাঢ় কর্ষিত এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ–পাক ভারত–উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম অংশ এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাংশের তৃণভূমিগুলোকে স্যাভানা নামে চিহ্নিত করা যায়। ভূগোলবিদ ডবি এশিয়ার ক্রান্তীয় তৃণভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন—

> মায়ানমার (সাবেক বার্মা), সিয়াম, ইন্দোচীন এবং পূর্ব–ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (eastern indies) ব্যাপক এলাকায় মৌসুমী অরণ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রজন্মের স্যাভানার বিকাশ ঘটেছে। দীর্ঘ, কর্কশ (rough) ঘাসের সাথে বিক্ষিপ্ত বাঁশঝাড় বা স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ দ্বারা উন্মুক্ত প্রান্তর শ্রেণীর তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। এই উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকালীন শুষ্কতা ও নিম্নমান বা পানিপ্রবেশ্য মৃত্তিকার কারণে ঘটেছে। স্যাভানা মৌসুমী–শুষ্ক অরণ্যের সাথে ক্রমান্বয়ে মিশে গেছে। এই সকল অরণ্যের বনানী হচ্ছে কাঁটাযুক্ত নাশপাতি গাছ (prickly pears), কন্টকবহুল নাগফনীসদৃশ গাছ এবং অনুরূপ কাঁটাযুক্ত গাছ।[১]

১. Robinson, H. (1972) : Biogeography, p. 289.

৫.২. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি

মহাদেশীয় অভ্যন্তরভাগের মধ্য অক্ষাংশ এলাকার যেসব স্থানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ মি.মি. এবং ৭৫০ মি.মি. (প্রায় ১০°–৩০°) এর মধ্যে সংঘটিত হয় সেসব ব্যাপক এলাকায় প্রাকৃতিক তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। এই সকল তৃণভূমিতে বৃক্ষ অপেক্ষা তৃণের প্রাধান্য বিদ্যমান। শুধু পানি প্রবাহিত এলাকায় বৃক্ষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমির তুলনায় এসব তৃণভূমির তৃণের প্রজাতি অপেক্ষাকৃত কম হলেও অক্ষাংশভিত্তিক তৃণভূমিগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে জলবায়ু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতার কারণে তৃণের সম্প্রদায়, বর্গ এবং প্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (মানচিত্র ৫.আ)।

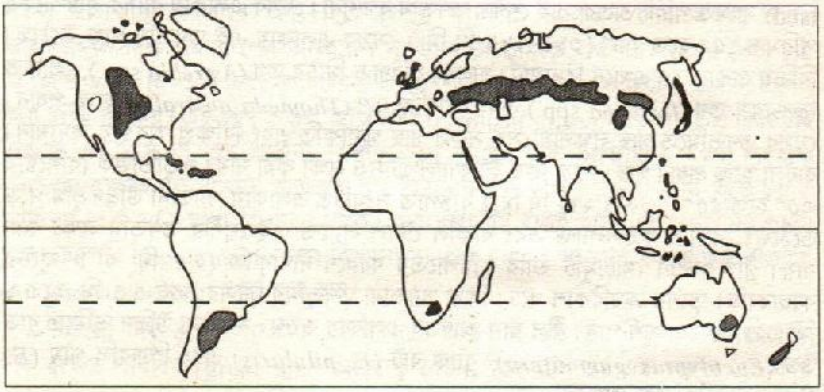

মানচিত্র ৫. আ. ■ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি।

৫.২.১. উত্তর আমেরিকা তৃণভূমি : উত্তর আমেরিকার কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমাংশের তৃণভূমি ৩২° উত্তর অক্ষাংশ, টেক্সাস হতে ৫২° উত্তর অক্ষাংশ, কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তৃণভূমি মহাদেশটির অভ্যন্তরভাগে ত্রিভুজ আকারে প্রকাশিত। উত্তর আমেরিকার এই তৃণভূমি, প্রেইরির ব্যাপক বিস্তৃতি, তৃণের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য সৃষ্টি করেছে। এই তারতম্য তাপ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ঋতুভিত্তিক বিস্তারণের তারতম্যের সাথে জড়িত। প্রেইরির বনানী ফরমেশনে মাত্র একটি হলেও এই ফরমেশনে কয়েকটি স্পষ্ট বনানী সম্প্রদায় বিদ্যমান। আবার ফরেমশনটিকে তিনটি সাধারণ সম্প্রদায় মূল প্রেইরি, মিশ্র প্রেইরি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও পেলোউজ প্রেইরিতে বিভক্ত করেছেন। আমেরিকাবাসীগণ মূল প্রেইরিকে তৃণের উচ্চতার ভিত্তিতে দীর্ঘ, মধ্যম এবং হ্রস্ব শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন। এই বিভক্তি পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের ক্রমান্বয়িক হ্রাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দীর্ঘ তৃণের প্রেইরি আদিতে দক্ষিণ আলবার্টা ও সাসকেচওয়ান হতে উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে কেন্দ্রীয় টেক্সাস এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে এই অরণ্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে কৃষি ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তৃণের দৈর্ঘ্য ১.৫ মি. হতে ২.৪ মি. (৫–৮) পর্যন্ত দাঁড়ায়। বৃহৎ ব্লুস্টেম *(Andropogon gerarde)* এবং সুইচ তৃণ *(Panicum virgatum)* এই শ্রেণীর

অন্তর্গত। কিছু কিছু তৃণ চাপড়া (sward or sod) সৃষ্টি করে বিস্তার লাভ করে রয়েছে। অন্যদিকে গুচ্ছজাতীয় তৃণ (bunch grasses) ঝাড় সৃষ্টি করে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। এই তৃণগুলো অবিচ্ছিন্ন ভূমি-আবরণ সৃষ্টি করে। দীর্ঘ তৃণের প্রেইরির পশ্চিম দিকে ২ হতে ৪ (০.৬–১.২ মি.) মধ্যম উঁচু তৃণের বলয় প্রকাশ পেয়েছে। এই তৃণভূমির প্রধান প্রধান প্রজাতি হচ্ছে ক্ষুদ্র সবুজ স্টেম *(Andropogon scoparius)*, সুঁচাকার তৃণ *(Stipa spartea)*, গম তৃণ *Agropyron smithii* এবং জুনতৃণ *(Koeleria cristata)*। এই তৃণ বলয় মিশ্র প্রেইরি নামেও পরিচিত। কারণ মধ্যম উচ্চতার তৃণ ও খর্বাকৃতি তৃণের মিশ্রণের সাহায্যে এই তৃণ বলয় গঠিত। প্রধান খর্বাকৃতি তৃণ হচ্ছে চাপড়া সৃষ্টিকারী মহিষ তৃণ *(Buchle dactyloids)* এবং নীল গ্রামা তৃণ *(Bouatelona gracilis)*। আরও পশ্চিমে মোন্টানার অংশবিশেষ উয়োমিং, কলোরেডো, মিউ মেক্সিকো এবং টেক্সাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এসব এলাকায় খর্বাকৃতি তৃণের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। খর্বাকৃতি *Boutelona* ও *Aristida* প্রজাতির সাথে প্রবর্তিত নীল ঘাস পোয়া, প্রেইরির এই অংশে বিদ্যমান। এই তৃণগুলো মরু বনানী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর উচ্চতা ৬ ইঞ্চি হতে ১.২ ফুট পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে। তৃণগুলো বিক্ষিপ্ত গুচ্ছে বিকাশ লাভ করে।

উত্তর আমেরিকার পশ্চিমের শেষ প্রান্ত এলাকার তৃণভূমি হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার অভ্যন্তরভাগের প্রশান্ত প্রেইরি (pacific prairie) এবং উত্তর পশ্চিমের মালভূমিসমূহের (ওয়াশিংটন, অরিগন, ইডাহো) পেলোউজ প্রেইরি। এসব তৃণভূমির প্রায় সকল তৃণই গুচ্ছাকারে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল এবং আছে যদিও অনেক এলাকায় অতি পশুচারণের ফলে তৃণ এলাকা পরিবর্তিত হয়েছে না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে।

৫.২.২. ইউরোপীয় স্টেপভূমি : ইউরোপীয় দক্ষিণ সি.আই.এস (সাবেক রাশিয়া) এবং কাজাখস্তানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৃণভূমি বিদ্যমান ছিল। এই তৃণভূমির সাথে উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির বেশ সাদৃশ্যও বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে কৃষিভূমি এবং চারণভূমি হিসেবে এই তৃণভূমির অনেকাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির তৃণের বৈশিষ্ট্য দ্রাঘিমাভিত্তিক বলয়ে প্রকাশ পেলেও ইউরোপীয় স্টেপভূমির বলয় অক্ষাংশভিত্তিক। বাহ্যত সকল স্টেপভূমি এক মনে হলেও উদ্ভিদবর্গ এবং এমনকি বনানীর প্রজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপের প্রশস্ত পাতাবহুল অরণ্য এবং সি.আই.এস এর উত্তরাংশের পর্ণমোচী অরণ্য ক্রমান্বয়ে এক প্রশস্ত বক্ষসহ স্টেপভূমির ইকোটন আকারে উন্মুক্ত তৃণভূমির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। এই চিত্র এশিয়ার অংশে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "কুঞ্জবন" হিসেবে পরিচিত এই এলাকার দক্ষিণে গাছবিহীন তৃণভূমিকে কেলার (Keller) তৃণবহুল স্টেপ (meadow steppe) নামে অভিহিত করেছেন। এই তৃণভূমি উত্তর আমেরিকার দীর্ঘ তৃণের প্রেইরির সাথে বহুলাংশে সাদৃশ্য বহন করে। তৃণভূমিগুলোতে ভূমি আচ্ছাদনযুক্ত তৃণ, টাসক অন্য শ্রেণীর তৃণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। মধ্যম ১.২ মি. (৪) এর অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট তৃণের সাথে অসংখ্য উপ প্রাধান্য বিস্তারকারী ফর্ব (forbs) বা প্রশস্ত পাতাবহুল লতা এই তৃণভূমিতে লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলোর গ্রীষ্মকালীন প্রস্ফুটিত ফুল আকর্ষণীয় দৃশ্য প্রকাশ করে। দক্ষিণ দিকে তৃণবহুল স্টেপ টাসক তৃণভূমি, বৃহৎ গুচ্ছাকার

BANDOG Library
Accession No. 20900

স্টিপা স্টেপ ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং এটি উত্তর আমেরিকার মিশ্র তৃণের প্রেইরির সাথে সাদৃশ্য বহন করে। এই এলাকার তৃণ দীর্ঘাকৃতি হলেও মরু বনানীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং একক তৃণসমূহ গুচ্ছাকারে উন্মুক্ত ভূমিসহ বিস্তার লাভ করে রয়েছে। স্টিপা তৃণের আঁশবিশিষ্ট শিকড়ের ঘনবিন্যস্ত আকারে বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। আরও দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এক অপ্রশস্ত শুষ্ক স্টেপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই এলাকায় সংযুক্ত ফর্ব যেমন ফেসকু *(Festuca sulcata)*, পালকঘাস *(Stipa pennata)* এবং ওয়ার্মউডসহ *(Antemisia maritima)* শুষ্কতা সহ্যকারী ঈষৎ বেটে শ্রেণীর গুচ্ছাকার তৃণ (Dwarfish truf forming graces) বিদ্যমান। ইউরোপীয় অংশের স্টেপের অধিকাংশ এলাকা ফসলের ভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অতি অল্প এলাকা, বিশেষ করে শুষ্কতর অংশে আদিত তৃণভূমি বিদ্যমান রয়েছে। হাঙ্গেরীর পূর্বদিকের প্রায় সকল পর্যঙ্ক এলাকায় (পান্নোনিয়ান তীরবর্তী অঞ্চল) পাজটাস (Pusztas) সমতল তৃণভূমি গড়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরীর পূর্বদিকের বৃহৎ সমভূমি বা আলফোল্ড (Alfold) এলাকায় অতীতে ব্যাপক তৃণভূমি বিদ্যমান ছিল। দানিয়ুর ও টিসজা (Tisza) এর মধ্যবর্তী নিচু বালি পাহাড়গুলোতে বিক্ষিপ্ত টাসক তৃণ বিকাশ লাভ করেছে। টিসজা এর পূর্বদিকে হ্রদীয় ও লোয়েসীয় মৃত্তিকায় পাজটা (Puzta) বিকাশ লাভ করেছিল। বর্তমানে এসব এলাকা ফসলের ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

৫.৩. মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার তৃণভূমি

ইউরোপীয় স্টেপের অনুরূপ একশত বছর পূর্বেও মাঞ্চুরিয়ার নিম্ন সমভূমি এলাকায় তরঙ্গায়িত তৃণভূমি (rolling grassland) বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে আদি (virgin) প্রেইরি কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। শুধু উত্তরের শীতল এবং পশ্চিমের শুষ্ক এলাকায় পূর্ববর্তী বৃহৎ চারণ তৃণভূমির কিছু অবশিষ্টাংশে এরূপ তৃণভূমি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠা নতুন বসতি অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনদের কৃষিকাজ বাস্তবক্ষেত্রে সকল প্রাকৃতিক বনানীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। পূর্বাংশে দীর্ঘ তৃণের প্রাধান্য বজায় ছিল। পশ্চিম দিকে ক্রমান্বয়ে তৃণের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে এবং গোবি মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে হালকা হ্রস্ব তৃণের আবরণ বিদ্যমান রয়েছে। মধ্য মঙ্গোলিয়ার পূর্ব প্রান্ত এলাকায় হ্রস্ব তৃণের স্টেপ গড়ে উঠেছে। ব্যাপক ভিন্নধর্মী চারণশীল তৃণভূমি দেশটির উত্তর ও পূর্বাংশে লক্ষ্য করা যায়।

৫.৩.১. দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক তৃণভূমি : দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক তৃণভূমি বা পাম্পা বুয়েনোস আয়ারস এর উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণে ৫৬০ কি.মি. হতে ৬৪০ কি.মি. (৩৫০–৪০০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (৫লক্ষ বর্গ মাইল) এলাকা দখল করে রয়েছে। এই আয়তনের প্রায় অর্ধেক আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ারস প্রদেশ এবং অন্য অংশ উরুগুয়েসহ ব্রাজিলিয়ান রিও গ্রান্ডি ডোসুল প্রদেশের অতি নগণ্য এলাকায় উপরিপাত আকারে বিদ্যমান। পাম্পার প্রায় সকল অংশ সমতল পৃষ্ঠের বৈচিত্র্যহীন (monotonous) দৃশ্য প্রকাশ করে। অতি অল্প এলাকায় তরঙ্গাকার ভূমি পৃষ্ঠ বিদ্যমান। উত্তর উরুগুয়ে এলাকায় নিচু পাহাড়ীয় বৈশিষ্ট্যের শৈলশিরা লক্ষ্য করা যায়। এগুলো কুচিলাস (cuchillas) নামে পরিচিত। লোয়েস অবক্ষেপণের উপর গঠিত পাম্পার দোঁআশ মৃত্তিকা

খর্বাকৃতি গাছ ও লতাসহ তৃণের সমাবেশের তৃণভূমি স্যাভানার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। ইহা "বুশ ভেল্ড" (Bush veld) নামে পরিচিত।

তৃণভূমির চরম পর্যায়ের প্রাকৃতিক বনানী কোলের মতে, আফ্রিকার মালভূমির ৪,৫০০ (১,৩৫০ মি.) অপেক্ষা উঁচু এলাকার "উচ্চ ভেল্ড"-এ লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্ট ঋতুভিত্তিক শুষ্কতা, রাত্রিকালীন প্রগাঢ় তুষার (keen night frost) এবং দৈনিক ব্যাপক তাপ ব্যতিক্রম হচ্ছে এই এলাকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য যা গাছ ক্রমাবিকাশের সহায়ক নয়। তিন শ্রেণীর তৃণভূমি হচ্ছে মিষ্টি তৃণের ভেল্ড বা খর্বাকৃতি তৃণের ভেল্ড, মিশ্র তৃণের ভেল্ড এবং অম্ল তৃণের ভেল্ড। প্রথম দুই শ্রেণী বনানীর চরম পর্যায় নির্দেশ করে।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, মৃত্তিকা এবং পশু চারণ ও অগ্নির প্রতিবন্ধকতার তারতম্যের ভিত্তিতে তৃণভূমির বৈশিষ্ট্য ও গঠনের মধ্যে তারতম্য প্রকাশ পায়। মালভূমির পূর্ব প্রান্তের ১,৫০০ মি. হতে ১,৮০০ মিটার (৫,০০০-৬,০০০) উচ্চতাবিশিষ্ট তৃণভূমি উচ্চ ভেল্ড নামে পরিচিত। এখানে পুষ্টিকর লাল ঘাস বা থেমেডা ট্রিয়ান্ডা *(Cymbopogon plurinodis)* প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এটিই মিষ্টি তৃণ ভেল্ড। সূক্ষ্ম কণাবিশিষ্ট যেমন ডোলেরাইটের আবহ বিকারীর মৃত্তিকায় এই তৃণ অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বিখ্যাত শৈলশিরা (the great Escarpment) প্রান্তের আর্দ্রতর জলবায়ু এবং বালিময় কম উর্বর মৃত্তিকাবিশিষ্ট এলাকায় *Tristachya hispida* লাল ঘাসের সাথে সহপ্রাধান্য বিস্তারে অবস্থান করে রয়েছে। এজন্য এই শ্রেণীর তৃণভূমি উন্নতমানের চারণভূমি হিসাবে পরিগণিত নয়। অভ্যন্তরভাগের দিকে শুষ্কতর এলাকায় মিশ্র তৃণের ভেল্ড অবস্থিত। এই তৃণ ক্ষেত্রও নিম্নমানের চারণভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই তৃণভূমির শুষ্কতর বৈশিষ্ট্যের জন্য মরু বনানী যেমন রজ্জুসদৃশ তৃণ *(Aristida junciformis)* লতাইয়া উঠে এবং কখনও কখনও এগুলো এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে এগুলোর সাহায্যে অতি নিম্নমানের চারণভূমি সৃষ্টি লাভ করে। আনুমানিক ২৬° পূ. দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমাংশে গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৩৮০ মি.মি. (প্রায় ১৫") অপেক্ষা কম। তাই এই এলাকার শুষ্কতা বৃদ্ধির কারণে ভেল্ড তৃণভূমির তৃণের গুণাগুণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে তৃণভূমিটি উত্তরে কন্টকাকীর্ণ ভেল্ড এবং দক্ষিণে ঝোপবিশিষ্ট ভেল্ডের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। মালভূমির উচ্চতর ও আর্দ্রতর অংশের অম্লতৃণের ভেল্ডে দীর্ঘ তৃণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত পোড়ানো কার্যক্রমের কারণে এই এলাকার ভেল্ড তৃণভূমি হিসেবে পরিগণিত বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং মিষ্টি তৃণের ভেল্ড ও মিশ্র তৃণের ভেল্ড জলবায়ুর শীর্ষ পর্যায় এবং অম্ল তৃণের ভেল্ড প্ল্যাগিও ক্লাইমাক্স (Plagio climax) তৃণভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৫.৪. অস্ট্রেলীয় তৃণভূমি

পূর্ব-অস্ট্রেলিয়ার উচ্চভূমির পশ্চিমে এবং মকরক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত ম্যারে ডারলিং পর্যন্ত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপক তৃণভূমি অঞ্চল। এই এলাকার ভূমিরূপের উচ্চতার পার্থক্য এবং জলবায়ুর উপাদানের অতি ধীরগতির পরিবর্তনের কারণে তৃণভূমির শ্রেণিবিন্যাস করা অত্যন্ত কষ্টকর এবং শ্রেণীর সীমারেখায় অস্পষ্টতা প্রকাশ পায়। সত্যিকার অর্থে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি শুধু ভিক্টোরিয়া ও তাসমানিয়ায় লক্ষ্য করা যায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের অংশ বিশেষে নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদভূমির সাথে তৃণভূমি সংযুক্ত হয়েছে। এই

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দক্ষিণ কুইন্সল্যান্ডে ক্রান্তীয় টাসক তৃণভূমি বা স্যাভানা এবং পশ্চিম দিকে লতাবিশিষ্ট স্টেপ বা ম্যালি গুল্ম ভূমি ও ঋতুভিত্তিক তৃণভূমির সাথে মিশ্রিত হয়েছে।

ধূসর ও বাদামি মৃত্তিকা বা ভারি মৃত্তিকা অঞ্চলের যেসব স্থানে বাৎসরিক ৩৮০ মি.মি. হতে ৬৩৫ মি.মি. বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় সেসব এলাকায় নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। টাসক তৃণ পূর্ণমাত্রায় ভূমি আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। সাধারণত তৃণ ক্ষুদ্রাকৃতি লতার সাথে মিশ্র অবস্থায় বিরাজ করে। উত্তরের অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতর এলাকায় যেখানে প্রায় ৬০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায় সেসব এলাকায় ঘাসের উচ্চতা ০.৫ মি. হতে ১ মিটারের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৫ মি.মি. এ। তাই শুষ্কতা প্রকাশ পায় এবং তৃণ খর্বাকৃতিতে পরিণত হয়। অঞ্চলভেদে তৃণের প্রজাতির পার্থক্য প্রকাশ পায়। উত্তরে মিচেল তৃণ *(Astrebla* spp.), ফ্লিন্ডার্স তৃণ (*Iscilema* spp.) এবং দক্ষিণে ক্যাঙ্গারু তৃণ *(Themeda austratis)*, ওয়ালাবি তৃণ (*Danthonia* spp.) ও কর্কস্ক্রু তৃণ *(Strip* spp.) প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

অভ্যন্তরভাগের নিম্নভূমির দক্ষিণাংশের ডানথোনিয়া তৃণভূমিতে অন্য যে কোনো চারণ ক্ষেত্র অপেক্ষা বেশি সংখ্যায় মেষ ধারণ করে থাকে। এখানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী যেমন ক্যাঙ্গারু ও স্পিয়ার ঘাস ওয়ালাবি ঘাসের সাথে মিশ্র অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। মেষ চারণ খর্বাকৃতি তৃণের এই মিশ্রণকে ব্যাহত করে। ব্যাপকভাবে মেষ চারণের পরও ডানথোনিয়া এবং স্টিপা টিকে থাকে কিন্তু ক্যাঙ্গারু তৃণ সত্তর অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক তৃণভূমিতে আমদানিকৃত ঘাস যেমন—বহুবর্ষজীবী রাই ঘাস *(Lolium perenne)* এবং রোডস তৃণ *(Chloris gayana)* এর প্রবর্তনও তৃণভূমির পরিবর্তন সাধন করেছে।

৫.৫. নিউজিল্যান্ডের তৃণভূমি

নিউজিল্যান্ডে বিস্তীর্ণ এলাকায় তৃণভূমি বিদ্যমান। দক্ষিণ দ্বীপের ক্যানটারবেরি সমভূমি হতে পাহাড় পর্যন্ত ব্যাপক এলাকা জুড়ে তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায়। এখানে ১৮৪০ সালে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর (৬৮ লক্ষ হেক্টর) বা সাউথ আইল্যান্ডের অর্ধেকের বেশি এলাকা তৃণভূমি দখল করে ছিল। বর্তমানে ক্যানটারবেরি প্রদেশের সমতল এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ একর (২০ লক্ষ হেক্টর) এলাকা কর্ষিত ভূমি বা তৃণের চাষ প্রবর্তনের সাহায্যে পর্যায়ভিত্তিক চারণভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যত্র প্রাকৃতিক তৃণভূমি পরিবর্তিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস করা হয়েছে। নর্থ আইল্যান্ডের টউপো হ্রদ সংলগ্ন কিছু এলাকায় প্রাকৃতিক তৃণ লক্ষ্য করা যায়। আদিতে নর্থ আইল্যান্ডের প্রায় অধিকাংশ এলাকা অরণ্য ও গুল্মভূমি দিয়ে আবৃত ছিল। কিন্তু নিউজিল্যান্ড উপনিবেশে পরিণত হওয়ার সময় থেকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অরণ্য পরিষ্কার করে নিম্ন উচ্চতাবিশিষ্ট তরঙ্গায়িত পাহাড় ও তৎসংলগ্ন সমভূমি যা মোট আয়তনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে আছে, সেসব এলাকায় তৃণ বপন করে তৃণভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে।

মার্লবরো, ক্যানটারবেরি এবং ওটাগো প্রদেশের ব্যাপক এলাকায় এখনও প্রাকৃতিক গুচ্ছাকৃতি টাসক তৃণ বিদ্যমান এবং এগুলো টাসক তৃণভূমি নামে পরিচিত। দুটি প্রধান তৃণগোষ্ঠী হচ্ছে—(ক) নিচু বা খর্বাকৃতি টাসক স্টেপ এবং (খ) দীর্ঘাকৃতি টাসক ঘাসের

তৃণভূমি। প্রথমটিতে ফেসটুকা পোয়া এবং বিশেষ করে ফেসটুকা নোভে জেলান্ডিয়ে ও পোয়া কেপিটোসা (Festuca novae Zelandiae and Poa caepitosa) প্রধানত ওটাগো প্রদেশে বিদ্যমান। ক্যানটারবেরি সমভূমি অঞ্চলে ৬০০ মি. উচ্চতার নিচু এলাকার পূর্বে তৃণের এই প্রজাতিগুলোর প্রাধান্য ছিল। দীর্ঘাকৃতি ঘাসের তৃণভূমিতে লাল টাসক ঘাস (*Danthonia raoulii* var. *rubra*) এবং তুষার তৃণের (*D. raoulii* var. *flavescens*) প্রাধান্য উচ্চতর আর্দ্র এলাকায় লক্ষণীয়। বর্তমানে প্রায় সকল টাসক তৃণভূমি কখনও কখনও দ্রুত গতিতে এবং অন্য সময়ে ধীরগতিতে মেষ ও শশকের অতি চারণ কার্যক্রমের সাহায্যে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী ঘাসের প্রবর্তনও এই ক্ষেত্রে জড়িত।

যুক্তি উপস্থাপন করা হয় যে, অতীতের আগত মানুষ চারণশীল মোয়াস পাখি (grazing bird moas) উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল ছিল। তাই ধারণা করা হয় পূর্বের ব্যাপক সংখ্যার মোয়াস উপস্থিতি তৃণভূমির ব্যাপকতা ও অস্তিত্ব টারসিয়ারি যুগেও বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে সাক্ষ্য প্রমাণাদি হতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্যানটারবেরি সমভূমির অংশ বিশেষে অরণ্য গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মতদ্বৈততা প্রকাশ পায়। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে মোয়া শিকারিগণ আগুন জ্বালিয়ে মোয়া পাখিদের তাড়া করতো। এজন্য সচরাচর আগুনের পোড়ানো কার্যক্রম উদ্ভিদ ভূমিকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে ফেলে এবং এলাকাগুলো পরবর্তীকালে তৃণভূমিতে পরিণত হয়। কাম্বারল্যান্ডের মতে নবম শতকে প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর তৃণভূমির আয়তন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরু অঞ্চলের বনানী

৬.০. উপ-মরু অঞ্চলের বনানী

উষ্ণ মরু ও নাতিশীতোষ্ণ মরু এবং উপ-মরুভূমির জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আর এই পার্থক্য তাপের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মরু বনানীর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে শুধু তাপমাত্রা নয়, বৃষ্টিপাতই হচ্ছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। যেসব এলাকার গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ মি.মি. এর কম সেসব এলাকা শুষ্ক মরু অঞ্চল আর যেসব এলাকায় ৩৮০ মি.মি.(১৫") এর কম বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় (মানচিত্র ৬.অ) সেসব অঞ্চলকে উপমরু অঞ্চল বলা হয়। বর্ণিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে এই ক্ষেত্রে আনুমানিক বৃষ্টিপাত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ বনানীর জন্য কার্যকরী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাষ্পীভবনের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। মরু ও উপমরু অঞ্চলদ্বয়ে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এবং বছরভেদে বৃষ্টিপাতের অতি উচ্চহারে পরিবর্তন-শীলতাও প্রকাশ পায়। উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ কোষ এলাকায় নিমজ্জনশীল বায়ুর স্রোত এবং বহির্গামী বায়ু প্রবাহের ফলে অতি উচ্চতাপ এবং নিম্নমানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রকাশ পায়। আর এসব এলাকা হচ্ছে পৃথিবীর ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় মরু অঞ্চল। নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি মহাদেশের অভ্যন্তরে শীতকালীন উচ্চচাপ কোষ এলাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে আন্তঃপার্বত্য তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এসব এলাকার শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াকে উচ্চ পর্যায়ে রাখে।

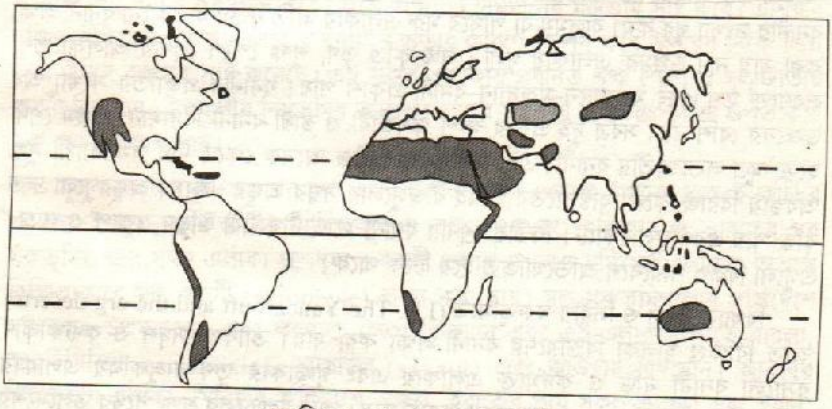

মানচিত্র ৬. অ. ▬ মরুভূমি।

৬.১. মরু অঞ্চলের বনানী

মরু অঞ্চলে প্রথমত সার্বিকভাবে বনানীর অপ্রতুলতা প্রকাশ পায়। উদ্ভিদগুলো খর্বাকৃতি এবং অতি দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। দ্বিতীয়ত বনানীর বিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। এদিক থেকে তিন প্রধান (ক) ক্ষণজীবী বাৎসরিক বনানী (ephimeral annuals) (খ) রসালো বাৎসরিক এবং (গ) শুষ্কতা সহনশীল বা শুষ্কতা সহ্যকারী বাৎসরিক বনানী এই অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান। প্রায় ৫০% হতে ৬০% বনানী থেরোফাইট (Therophytes) শ্রেণী অর্থাৎ অতি ক্ষণজীবী লতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত মরু বনানী হচ্ছে জেরোফাইটিক (Xerophytic) অর্থাৎ বনানীগুলো সেগুলোর শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গসংস্থানীয় বৈশিষ্ট্যে শুষ্ক অবস্থা হতে রক্ষা পায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের অত্যধিক শিকড় পদ্ধতি ঘন সন্নিবেশিতভাবে বর্ধন ও অবস্থান পুরু ছাল মোমসদৃশ ও লাক্ষিক পৃষ্ঠ (waxy and resinous surfaces), লোমসদৃশ আবরণ এবং নির্জীব পত্ররন্ধ্র প্রভৃতি।

৬.১.১. সাহারা-আরব মরুভূমি : সাহারা ও এর অবিচ্ছিন্ন অংশ আরব মরুভূমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি। সাহারা আরবি শব্দ, *sahra* হতে উদ্ভব হয়েছে। শব্দটির অর্থ "উষর ও নির্জন প্রান্তর" ("wilderness")। এই মরু অঞ্চলের আয়তন ৭৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৩০ লক্ষ বর্গমাইল)। অঞ্চলটির উত্তরের সীমা ২৫০ মি.মি. এবং দক্ষিণের ৩৮০ মি.মি. সমবর্ষণ রেখার সাহায্যে মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল মরুভূমি এই বৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত এবং গড় বাৎসরিক ১০০ মি.মি. (৪") এর কম বৃষ্টিপাত সংঘটন এলাকা নিয়ে এটি গঠিত।

এই মরু অঞ্চলের সমগ্র এলাকা সমভূমি বা প্রায় সমভূমির মধ্যে অন্তর্গত। ভূমি পৃষ্ঠের স্থানীয় তারতম্য বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক এলাকা বালি বা বর্গ (sand or carg), নুড়ি বা রেগ (pebble or reg) এবং উন্মুক্ত শিলা বা হামাডা (bare rocks or hamada) নামে পরিচিত।

বনানী আবরণের পরিমাণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও সকল এলাকার বনানীর সংখ্যা খুব কম। বালুময় বা পাথুরে মরু এলাকায় অতি নগণ্য বা কোনো বনানী লক্ষ্য করা যায় না। উপমরু এলাকায় গুল্ম ; গুচ্ছাকৃতি তৃণ, শুষ্ক স্টেপ শ্রেণীর আলফা তৃণ, লবণাক্ত তৃণ এবং মরুদ্যানে মরুদ্যান-বনানী প্রকাশ পায়। বনানীর প্রজাতির সংখ্যা অর্ধ ডজনের বেশি নয়। সর্বত্র দুই প্রকার স্বল্প ক্ষণজীবী ও স্থায়ী বনানী বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ক্ষুদ্র লতাজাতীয় বনানী। এই বনানীগুলোর বীজ অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। বৃষ্টিপাতের পরেই বীজগুলোর সত্বর অঙ্কুর গজায়। অঙ্কুরগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফুল ফোটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বনানী হচ্ছে দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ, ঝোপ ও লতা। এগুলো বিরূপ পরিবেশে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকে।

বিখ্যাত এরগ ও লিবীয় মরুভূমিতে (I.E. The Yanezrouft and the erg deserts) অতি বিক্ষিপ্ত হালকা বিস্তারণের বনানী লক্ষ্য করা যায়। তাকিয়া সদৃশ ও কণ্টকাকীর্ণ রসালো বনানী নুড়ি ও কর্দমাক্ত এলাকায় এবং গুচ্ছাকার তৃণ বালুকাময় এলাকার বালিয়াড়ীতে বিন্দু আকারে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। পানি চলাচলের শুষ্ক পথের তলদেশের বালি ও নুড়িময় মৃত্তিকায় বৃক্ষ এবং বহুবর্ষজীবী গুল্ম, ঝাউগাছ (*Tamarix* spp.) এবং বদরী

কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম (*Ziziphus* spp.) জন্মে থাকে। লবণাক্ত অবভূমি বা চেটাল লবণ হ্রদ, যেমন ছোট্স্ মালভূমিতে খর্বাকায় লবণাক্ত গুল্ম যেমন ধান তৃণ সমুদ্র ল্যাভেন্ডা বা সুগন্ধি বৃক্ষবিশেষ (sea lavender) এবং সামুদ্রিক নলখাগড়া (sea rushes) লক্ষ্য করা যায়। সাহারার উত্তর দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব এলাকায় শুষ্ক স্টেপ শ্রেণীর বনানী, যেমন বহুবর্ষজীবী আলফা ঘাস গুচ্ছাকারে জন্মে থাকে। আহাগাড়, ইর এবং টিরে উচ্চভূমি সন্নিবেশিত স্তূপ পর্বতসদৃশ এলাকায় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বনানীর প্রজাতির ব্যাপক বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। এই উচ্চভূমি এলাকার নিচের ঢালে বাবলা গাছসহ প্যানিকাম ঘাস এবং উঁচু এলাকার ঢালে গুল্ম এবং জলপাই ও সামাক গাছসহ অন্যান্য বৃক্ষ লক্ষ্য করা যায়। মরুদ্যান ও স্থায়ী নদী যেমন—নীল নদ এলাকায় বাবলা গাছ, ঝাউ গাছ, খেজুর গাছ (*Phoenix dactylifera*), ডোমজাতীয় তাল গাছ, এবং মিশর দেশীয় নল-খাগড়াসহ (*Cyperus papyrus*) সমৃদ্ধশালী বনানীর সমাবেশ প্রকাশ পেয়েছে।

৬.১.২. এশীয় মরুভূমি : আরবীয়-সিরীয়, পারস্য, থর, তুর্কিস্থানীয়, টাকলামাকান এবং গোবি মরুভূমি এশিয়া মহাদেশের মরু ও উপ-মরুভূমির অন্তর্গত এবং এগুলোকে সাহারা মরুভূমির বর্ধিত অংশ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই ব্যাপক অনুপ্রস্থ বলয়ে তীব্র সৌরশক্তি, ব্যাপক পরিসরের পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা, ক্ষণস্থায়ী ও কম পরিমাণ বৃষ্টি-বরফপাত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এগুলো ছাড়াও উচ্চতা, ভূ-সংস্থান এবং মৃত্তিকার ব্যাপক তারতম্য সমগ্র এলাকার বনানীর পরিমাণ, বর্ধন এবং ভূ-আবরণের বিভিন্নতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এলাকাগুলোর সকল বনানী শুষ্কতার সাক্ষ্য বহন করে। মরু অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা, যেমন—দক্ষিণ আরবের রুবা-এল খালি, তারিম পর্যঙ্কের তাকলা মাকান বা কিসিলকুম ও রাশিয়ায় তুর্কিস্তানের কারাকুম এবং এগুলোর সংলগ্ন উপমরু অঞ্চলের বনানীর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। মরু এলাকা প্রায় প্রাণশূন্য এবং বনানীবিহীন, কিন্তু উপমরু অঞ্চলে কিছু বনানী জন্মলাভ করে। ফলে অঞ্চলটি নিম্নমানের মরুভূমি সৃষ্টি করে। এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমের পার্বত্য এলাকার বনানী উচ্চতার কারণে বিশেষ করে উপরের দিকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বলয়ের সৃষ্টি করেছে। এই সকল এলাকায় প্রধানত শুষ্ক স্টেপ ও গুল্মজাতীয় বনানী বিদ্যমান। উপকূলীয় নিম্নভূমির অভ্যন্তরভাগের সমভূমি বা আন্তঃপার্বত্য উপত্যকায় মরু বনানী প্রকাশ পায়।

মূল মরুভূমিসমূহ-আরবের রুবা এল খালি ও নেফুদ এলাকা, ইরানের দাস্ত-ই-কাভির ও দাস্ত-ই-লুত, তুর্কিস্তানের কিসিলকুম ও কারাকুম এবং পাকিস্তান ও ভারতের থর মরুভূমির প্রায় সমগ্র এলাকা প্রাণশূন্য ; বনানী প্রকাশ পেলেও মুষ্ঠিমেয় এলাকায় অত্যন্ত বিক্ষিপ্তাকারে মরু বনানী (xerophyte) লক্ষ্য করা যায়। মূল মরুভূমিগুলোর প্রান্তদেশে সাধারণত উপমরুভূমি এবং লবণাক্ত স্টেপ বিদ্যমান এবং এই এলাকাগুলোতে বাবলা, আরটিমিসিয়া (artemisia), স্যাক্সাউল (saxaul) এবং ঝাউগাছ বিদ্যমান। আরবের প্রান্তদেশীয় এলাকা, সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল, ইরাকের প্রায় সকল এলাকা এবং ইরান, পাকিস্তান ও কাজাখস্তানের দক্ষিণাংশে কন্টকাকীর্ণ লতাজাতীয় বনানীসহ শুষ্ক স্টেপভূমি গড়ে উঠেছে। এই এলাকাগুলো গাছবিহীন। অঞ্চলটিতে বিভিন্ন প্রজাতির তৃণ শুষ্ক অবস্থার সাথে অভিযোজিত হয়ে কেবল শীত ঋতুতে ক্রমবিকাশ লাভ করে। শেষ শীত ঋতু ও

বসন্তকালের প্রথমার্ধে এলাকাগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করে। পুষ্প ফোটার ফলে ভূমির প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাবে লতাজাতীয় বনানী মৃত্যুবরণ করে। তৃণ বিবর্ণ ও শুষ্ক হয়ে পড়ার ফলে এলাকাগুলো বাদামি বর্ণ প্রকাশ করে। শুধু কাঁটাজাতীয় ঝোপ টিকে থাকে।

এশিয়ার অভ্যন্তরে তাকলা মাকান এবং গোবি মরুভূমি অবস্থিত। মূল মরুপ্রান্তে তারিম উপত্যকার তাকলা মাকান সঞ্চরণ বালির সাহায্যে গঠিত। ক্ষুদ্র নদীর সবিরাম (intermittent) পানি সরবরাহের ফলে এই এলাকায় তৃণ ঝাড় ও বন্য পপলারসহ (popler) প্রধানত ঝাউগাছ গড়ে উঠেছে। গোবি এবং এশিয়ার অভ্যন্তরের অন্য মরুভূমিগুলো তাকলা মাকান মরুভূমি অপেক্ষা কম শুষ্ক। এসব এলাকার বনানী হচ্ছে আরটেমিসিয়া ক্যামেল সেজ (camel sage), খর্বাকৃতি কন্টকাকীর্ণ ঝোপ এবং কণ্ডুলাকৃতি (wiry) তৃণ। এই মরু অঞ্চলের উত্তর এবং পূর্ব প্রান্ত ক্রমান্বয়ে খর্বাকৃতি তৃণের উত্তর চারণভূমির সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে।

৬.১.৩. উত্তর আমেরিকার মরুভূমি : মেক্সিকো মালভূমির কিছু অংশসহ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ উপমরু গুল্ম ভূমি-বিদ্যমান (বিজ্ঞানী পোলিউনিন একে প্রায় মরুভূমি নামে চিহ্নিত করেছেন।

গ্রেটবেসিন ও উত্তরাংশের কলেরোডো মালভূমিতে প্রধানত সেজব্রাশ (*Artimisia tridentata*) বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র নদীর পর্যঙ্ক যেমন কার্সন সিঙ্ক (carson sink) এবং গ্রেট সল্ট লেকের (great salt lake) চতুস্পার্শ্বে লবণাক্ত লতাজাতীয় বনানীর (creese wood) ক্ষুদ্র স্থানভিত্তিক বিক্ষিপ্ত সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নাংশের কলোরোডা পর্যঙ্ক ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের প্রায় সকল অংশ এবং পেকোস (Pecos) এবং রিওগ্রান্ডি পর্যঙ্কে ক্রেসোসোটি ঝোপ (*Larrea mexicana*) হচ্ছে প্রাধান্য বিস্তারকারী বনানী। মেক্সিকো মালভূমিতে অ্যাগেভ, ক্যাকটাস এবং ইওক্কা (Agave, cactus and yucca) শ্রেণীর লতাজাতীয় বনানী বিদ্যমান। উত্তর ও কেন্দ্রীয় অংশে সহ-বনানী হিসেবে গ্রিজউজ (*Sacrobatus vermiculatus*) এবং সাড স্কেল (*Atriplex confertifolia*) লক্ষ্য করা যায়। উত্তর চিহুয়াহুয়া, মেক্সিকো এবং পশ্চিম টেক্সাসে শুষ্ক মেসকুইট (*Porsopis* spp.) তৃণভূমি বিদ্যমান।

আমেরিকার মরুভূমি ক্যাকটাস বিশেষ করে বৃহদাকৃতি ক্যাকটাসের জন্য বিখ্যাত। মরু এলাকার অসংখ্য প্রজাতির ক্যাকটাস লক্ষ্য করা না গেলেও এগুলোর উপস্থিতির প্রাধান্য প্রকাশ পায়। বৃহদাকৃতি সাগুয়ারো (*Carnegica gigantea*) যা সাধারণত অর্গান ক্যাকটাস (organ cactus) নামে পরিচিত এবং ছোলাচ (*Opurha* spp.) বা কাঁটাযুক্ত নাশপাতি গাছ বিশেষভাবে এই মরুভূমিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। ক্যাকটাসে প্রজাতির সংখ্যা হাজারের উর্ধ্বে নির্ধারণ করা হয়েছে। এককভাবে *Opuntia* সাথে প্রজাতির সংখ্যা ২০০ এর উর্ধ্বে। সহযোগী এবং কখনও কখনও প্রাধান্যসহ বনানী হিসেবে ক্যাকটাসের সাথে বিশেষ করে Lequminosae এবং Compositae গোত্রের কাঁটা ও লোমযুক্ত লতাও এখানে বিদ্যমান।

৬.১.৪. দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমি : দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অক্ষাংশ এলাকার স্থলভাগের সঙ্কীর্ণতা ও পর্বতশ্রেণীর বিন্যাসের কারণে এই মহাদেশের মরুভূমি আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির অনুরূপ বৃহদাকৃতির নয়। মূল মরুভূমি প্রশান্ত মহাসাগরের পেরু ও উত্তর চিলির উপকূল সংলগ্ন ৬° দক্ষিণ হতে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকা পূর্ণমাত্রার শুষ্কতা এবং প্রায় বনানী-শূন্য অবস্থা প্রকাশ করে রয়েছে। আটাকামা মরুভূমি প্রান্তে সমৃদ্ধ ক্যাকটাস প্রজাতিসহ উপ-মরু বনানী লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা, প্যাটাগনিয়া এবং ভেনেজুয়েলোর উপ কূল এলাকার উপ-মরু অঞ্চলে মরু বনানীর গুল্ম ও স্টেপের সৃষ্ট হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনায় খর্বাকৃতি, বর্ধনহীন ও নিম্নমানের গুল্ম যেগুলো মোনটে নামে পরিচিত সেই বনানীগুলো জন্মে থাকে। নুড়িময় মৃত্তিকা এবং মৃদু শীতল বায়ুপ্রবাহের ঝটিকাবহুল (wind swept) অবস্থা প্যাটাগনিয়াকে উপ-মরু ভূমিতে পরিণত করেছে। এই বৈশিষ্ট্যের একক বা গ্রুপ আকারে খর্বাকৃতি ঝোপসহ ব্যাপক এলাকায় মোটামুটি স্থূল বা অমসৃণ শ্রেণীর শুষ্ক টাসক তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। আন্দিজের উচ্চ আন্তঃপার্বত্য মালভূমিতে প্রায় উপ-মরু অবস্থা বিরাজ করে। এই উঁচু মৃদু শীতল ও ঝটিকাবহুল বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট সমতল মালভূমি এবং শীর্ষ ভূমিতে (table land and top land) বিক্ষিপ্ত ঘাসের চাপড়া ও লতাজাতীয় বনানী বিকাশ লাভ করেছে।

৬.১.৫. আফ্রিকার কালাহারি ও নামিব মরুভূমি : প্রায় ২০° দ. অক্ষাংশের দক্ষিণে, দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার উপকূল বরাবর নিরক্ষরেখার দিকে অভিক্ষেপিত অংশসহ দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম অর্ধাংশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে মরু ও উপ-মরুভূমি বিদ্যমান। বনানীর দৃষ্টিকোণ থেকে এলাকাটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (ক) রসালো বনানীর প্রায় অনুপস্থিতিসহ নামিব মরুভূমি (খ) বাবলাজাতীয় বনানী ও গুচ্ছ ঘাসসহ উপমরু এলাকা (গ) কালাহারির কাঁটার ঝোপ এবং বালির ভেল্ড (sand veld) (ঘ) কাররুর কাঁটার ঝোপ এবং (ঙ) বালুকা-মরু-গুল্ম এলাকা।

বিখ্যাত শৈলশিরা ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল মধ্যবর্তী নিম্ন অরেঞ্জ উপত্যকার বহির্দিকের অভিক্ষিপ্ত অংশসহ (salient up) এলাকাটি মূল মরুভূমি বলয় আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এর প্রস্থ ১৬ কি.মি. হতে ১২৮ কি.মি. (১০–৮০ মাইল) এবং এটি ১৬° দঃ হতে ৩২ দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি নগণ্য এবং এই বৃষ্টিপাত কয়েক বছর পর পর ঘটে থাকে। এই অবস্থায় কদাচিৎ রসালো লতাজাতীয় বনানীর উপস্থিতি প্রকাশ পায়।

মরুভূমিতে বনানী কম হলেও বর্ষণের পর সাময়িক হলেও সুন্দর ভূদৃশ্য ফুটে উঠে। নামাকুয়াল্যান্ডের (Namaqualand) সমভূমি বৃষ্টিপাতের পর লাল ও হলুদ ডেইজি এবং ম্যারিগোল্ডের কার্পেটে পরিণত হয়। কৌশলে শুষ্কতা পরিহার শ্রেণীর বনানী ছাড়াও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির বনানী যেমন অ্যালো (*Kokerboom*) এই এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্ভিদের হ্রস্ব মোটা কাণ্ড এবং এই কাণ্ডের স্থূল শাখায় বিক্ষিপ্ত মাংসল পাতা বিদ্যমান।

স্টেপে প্রধানত "মিচেল তৃণ" ঋতুভিত্তিক তৃণভূমি গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব, ভিক্টোরিয়ার উত্তর-পশ্চিম এবং কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সল্টবুশ এবং ব্লুবুশসহ টাসক তৃণের শুষ্ক স্টেপ এলাকা গড়ে উঠেছে এবং এটি আমেরিকার সেজব্রাশ এলাকার সাথে তুলনীয়। অঞ্চলটি মেষের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেষগুলো ক্ষণস্থায়ী লতাজাতীয় বনানী ভক্ষণ করে। কিন্তু শুষ্ক সময়ে মেষগুলোকে আকর্ষণহীন বহুবর্ষজীবী সল্টবুশ ও ব্লুবুশের লতা-পাতার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় ২৫০ মি.মি. সমবর্ষণ রেখার দক্ষিণ হতে নিম্ন মারে পর্যন্ত পর্যন্ত মালি ঝোপবিশিষ্ট এক বলয় এলাকা বিদ্যমান। এই বলয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা যেমন—নুল্লাবার সমভূমি এবং ফ্লিন্ডারস পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। এই বলয়ে ওয়াটল, ব্লুবুশ এবং সল্টবুশসহ মালি প্রজাতির (*Eucalyptus* spp.) বনানী প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এই বলয়ে স্বল্প পরিমাণ তৃণ বিদ্যমান। নুল্লাবার সমভূমির চুনমিশ্রিত মৃত্তিকা এলাকায় গাছবিহীন লতাজাতীয় বনানীর স্টেপ সৃষ্টি লাভ করেছে।

৬.১.৭. শীতল মরুভূমি : মেরু অঞ্চলের চিরস্থায়ী তুষার এবং ঋতুভিত্তিক বরফে আবৃত ভূমিপৃষ্ঠ এলাকাসমগ্র শীতল মরুভূমি নামে পরিচিত। সাধারণভাবে অঞ্চলটি তুন্দ্রা নামে পরিচিত হলেও তুন্দ্রা শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন গুঢ়ার্থ (connotation) প্রকাশ করে। উৎপত্তির দিক থেকে এটি ল্যাপিস শব্দ 'টুনডার' (Tundar) এর সাথে জড়িত এবং এর অর্থ সমতল জলাভূমি। শব্দটি আর্কটিক অঞ্চলের গাছবিহীন সমতল অথবা তরঙ্গাকার এলাকা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফিনল্যান্ডে শব্দটির সাহায্যে উত্তরাংশের পার্বত্য এলাকা ও মালভূমির উঁচু স্থানসহ অনুর্বর এবং প্রতিকূল (barren and hostile) এলাকাকে নির্দেশ করা হয় এবং এটি টুনটুরি (Tunturi) নামে পরিচিত। তদুপরি এক্ষেত্রে অঞ্চলটি বৃক্ষবিহীন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে না। অনেকে এলাকাটিকে আলাপাইন বনানীর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করে থাকেন। সাধারণভাবে তুন্দ্রা শব্দটি জলাভূমি বা পাথুরে বৈশিষ্ট্যের উপ-আর্কটিক অথবা আর্কটিক অঞ্চলের নিম্নমানের বর্ধনশীল বনানী এলাকাকে নির্দেশ করা যায় এবং এটি বন রেখা-অতিক্রান্ত অঞ্চল নির্দেশ করে।

উত্তর গোলার্ধের আর্কটিক সাগরের দক্ষিণাংশের অঙ্গুরি সদৃশ্য অবিচ্ছিন্ন স্থলভাগসমূহের এলাকা তুন্দ্রার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তুন্দ্রা বলয়ের প্রান্তের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সাইবেরিয়ায় এটি দক্ষিণে সুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু কানাডায় এটি দক্ষিণে ৫৩° উ. অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে রয়েছে। দক্ষিণ গোলার্ধে সত্যিকার অর্থে আর্কটিক তুন্দ্রার অনুরূপ কোনো এলাকা প্রকাশ পায়নি। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে অবস্থিত কোনো কোনো দ্বীপে বিক্ষিপ্ত তুন্দ্রাজাতীয় নিম্নমানের বনানীর উপস্থিতি লক্ষণীয়।

তুন্দ্রা অঞ্চলের সীমা নির্ধারণও জটিলতার সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানী ড্যানসেরুথ বক্তব্য হচ্ছে (ক) উষ্ণতম মাসের ১০° সে. সমতাপ রেখা (খ) নরডেনস্কিওল্ড রেখা এবং (গ) দক্ষিণের অবিচ্ছিন্ন চিরতুষার (permafrost) রেখা তুন্দ্রা এলাকার বিস্তারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (মানচিত্র ৬.আ)।

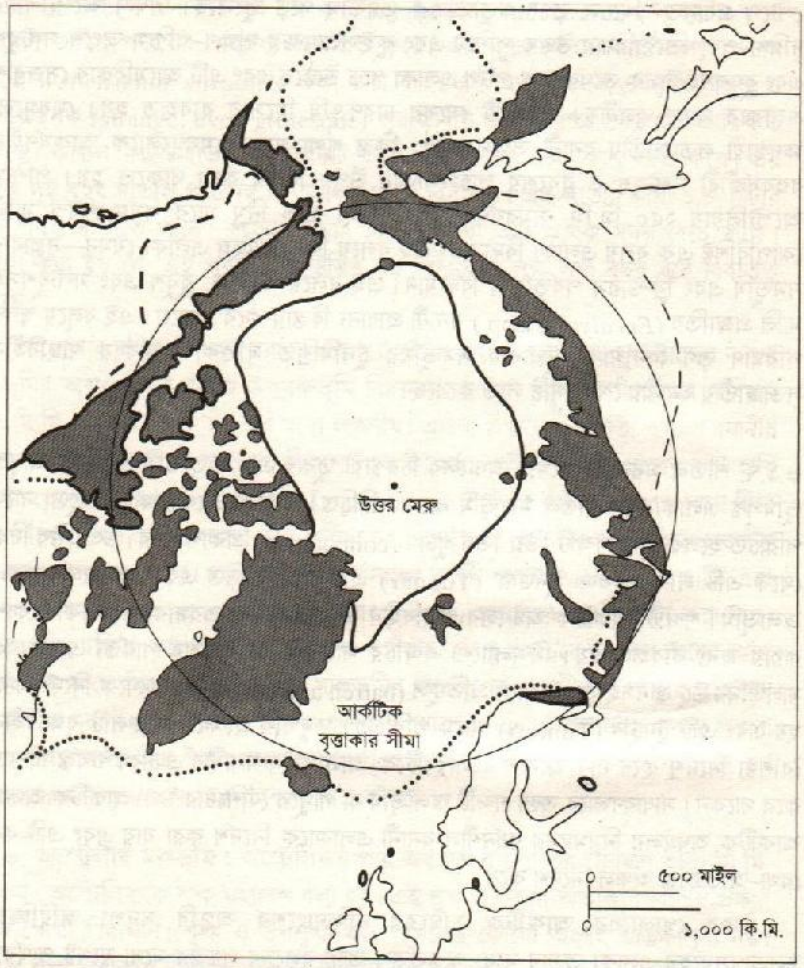

চিত্র ৬. আ. তুন্দ্রা অঞ্চল এবং অর্থবহ সীমারেখা

····· উষ্ণতম মাসের ১০°সে. সমতাপ রেখা; —— সমুদ্র স্থায়ীভাবে বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত;
--- চিরতুষারে দক্ষিণ সীমা; তুন্দ্রা অঞ্চল।

বর্ণিত নিয়ামকের সাহায্যে নির্ধারিত এলাকাই হচ্ছে মূল তুন্দ্রা অঞ্চল (true tundra)। অন্যভাবে বলা যায় যে তৃণ, হোগলা (sedge), পানা (moss), লাইকেন (lichen) এবং লতাপাতাজাতীয় (herbaceous) বনানী সহ কিন্তু বৃক্ষবিহীন পতিত এলাকাসমূহ তুন্দ্রা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। তুন্দ্রা ও বোরিল অরণ্যের মধ্যবর্তী এলাকার এই দুই উদ্ভিদ অঞ্চলের সীমারেখা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ অঞ্চল দুটি অস্পষ্টভাবে একটি অন্যটির সাথে মিশে গেছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনটনের ভাষায় বর্ণিত দুই উদ্ভিদ অঞ্চলের মধ্যে

আঙুলিসদৃশ শাখায় বিভক্ত এক প্রশস্ত এলাকা, যেখানে একক অঙ্গুলি আকারে উপত্যকা বরাবর অরণ্য উত্তর দিকে এবং তুন্দ্রা ভূমি উচ্চ শৈলশিরা বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। ফলে অরণ্য তুন্দ্রা এলাকার এক বলয় সৃষ্টি লাভ করেছে। রাশিয়ায় এটি টাইবোলা (Taibola) নামে পরিচিত। এটি বোরিলের দক্ষিণের অরণ্য স্টেপ অঞ্চলের অনুরূপ। রাশিয়ান বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে, বর্তমানে অরণ্যের সীমা হিমবাহ যুগোত্তর জলবায়ুর চরম পর্যায়ের মতো মেরুর দিকে অতি ধীরগতিতে পুনরায় বিস্তার লাভ করছে। পূর্বে বৃক্ষের শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতাকে তুন্দ্রার বৃক্ষ শূন্যতার একমাত্র কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো। বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণ হতে প্রতীয়মান যে, এসব এলাকায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও চারার বর্ধনের উপর অন্যান্য নিয়ামকের প্রতিবন্ধক যেমন কম পরিমাণে বীজ উৎপাদন, বীজের নিম্নমাত্রায় অঙ্কুরোদ্গম, পানি ও বায়ুর দ্বারা বীজের অন্যত্র পরিবহণ ও ধ্বংস সাধন এবং প্রতিকূল আবহাওয়া বা প্রাণীর দ্বারা চারার ধ্বংস সাধন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিনটনের মতে, এই নিয়ামকগুলো পারিসাংখিক কিন্তু জন্মগত বা স্বাভাবিক নয় (statistical rather than innate) এবং যদি পারিসাংখ্যিক বৈষম্য (statistical odds) কমানো হয়, তাহলে এক্ষেত্রে বনানীর বর্তমানের সাম্যাবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব। পারিসাংখ্যিক বৈষম্যের কিছু কিছু প্রভাব পরিবর্তনের ক্ষমতা মানুষের আওতাধীনে রয়েছে। যেমন সতর্কতার সাথে বীজ নির্বাচন ও বীজের অঙ্কুরোদ্গমের স্থান নির্বাচন এবং চারার রক্ষণাবেক্ষণ। এসব পদক্ষেপের সাহায্যে তুন্দ্রা অঞ্চলে অরণ্যের বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব যদিও এই কার্যক্রম অতি ধীরগতি সম্পন্ন ও অতি সীমিত স্থানে সম্ভব। স্থানীয় ভৌত নিয়ামকসমূহের নগণ্য তারতম্য তুন্দ্রা অঞ্চলের বনানীর প্রজাতির মান ও সংখ্যার উপর প্রতিফলিত হয়। নিয়ামকগুলো হচ্ছে ভূমিরূপের স্বল্প পরিমাণের তরঙ্গনা বৈশিষ্ট্য, উত্তম বা নিম্নমানের পানি নিষ্কাশন, পিটজাতীয় বালুকাময় বা নুড়িময় মৃত্তিকা, সূর্যের আলোপ্রাপ্তি এবং বায়ুপ্রবাহের ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা বা উন্মুক্ততার অবয়ব। ফলে অণুবাসস্থানের (micro-habitats) সৃষ্টি হয় এবং ইহার প্রভাব বনানীর উপর প্রতিফলিত হয়। বর্ণিত নিয়ামকসমূহ উদ্ভিদ গোষ্ঠীর উপর যেমন প্রভাব রাখে তেমনি বনানীর ভূমি আবরণেরও পার্থক্য সৃষ্টি করে। সমুদ্র উপকূল, বালিয়াড়ী, স্ক্রি (scree) খাড়া ঢালে অবস্থিত প্রস্তর স্তূপ, জলাভূমি, উচ্চপতিত ভূখণ্ড এবং উঁচু ভূমিতে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের ভিন্নজাতীয় বনানীর প্রজাতি বিদ্যমান। বিলিংস এর মতে, মৃত্তিকায় তুষারের কার্যক্রম, বরফের আবরণ এবং বায়ুপ্রবাহ এর ভিন্ন ভিন্ন সন্নিবিশনের প্রভাবের ফলাফল এসব বনানীর ভূমি আবরণের পার্থক্য প্রকাশ করে।

৬.১.৮. উত্তর আমেরিকার মরুভূমি : বেরিং প্রণালী হতে আলাস্কার অধিকাংশ এলাকা ও উত্তর কানাডার মধ্য দিয়ে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত এক প্রশস্ত বলয় আকারে উত্তর আমেরিকীয় তুন্দ্রা ফরমেশন প্রকাশ পেয়েছে। অঞ্চলটির শীত ঋতু দীর্ঘ ও তীব্র এবং এখানে চিরতুষার বিরাজ করে। অনুর্বর অম্লমৃত্তিকার উপরে এলাকাটির মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত স্বল্প সময়ের গ্রীষ্মকালে তুষার গলে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যের আওতায় পড়ে এবং এই সময়ে ব্যাপক এলাকা জলাবদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ুর এই কঠোর (harsh) অবস্থা অতি নিচু গঠন কাঠামোর বনানী টিকে থাকতে পারে। এগুলো হচ্ছে ভুঁইফোড়, শেওলা, হোগলা ও তৃণ। সেসব এলাকার জলবায়ুর অবস্থা উন্নততর যেমন পানি

প্রবাহ পথ সংলগ্ন এলাকার দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল ও গভীরতর মৃত্তিকা, সেসব এলাকায় খর্বাকৃতি উইলো ও বার্চ এবং গুল্ম জন্মে থাকে। প্রকৃত তুন্দ্রা বৃক্ষরেখার উত্তরে এবং বোরিল বনভূমি হতে পৃথক অবস্থানে বিক্ষিপ্ত ও খর্বাকৃতি গাছ এর উপ আর্কটিক বলয় অবস্থিত। বিক্ষিপ্ত ও খর্বাকৃতি গাছের এই আর্কটিক বলয় এর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র যষ্ঠির ভূমি নাম দেয়া হয়েছে। "পতিত ভূমি" (Barren lands) হিসেবে তুন্দ্রা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা আর্কটিক প্রেইরি নামে পরিচিত। এই প্রেইরি ভূমি তৃণ, হোগলা ও বিভিন্ন প্রকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল পুষ্পল লতাজাতীয় বনানী দিয়ে আবৃত। অঞ্চলটির শিলা আবৃত এবং ঝুরা অবস্থার শিলা পৃষ্ঠ এলাকায় (rock strewn areas) বিক্ষিপ্ত বিস্তারণের শৈবাল বা ভুঁইফোড়, সাক্সিফ্রেজ (saxifrage), ক্রোবেরি ও আর্কটিক পর্ণাঙ্গ, হিথভূমিতে (Heathland) বিলবেরি, ক্র্যানবেরি (bilberry, cranberry), আর্কটিক গুল্মবিশেষ (arctic heather) ও ভূমি বার্চ (ground birch) এবং অতি নিম্নমানের পানি নিষ্কাশিত বর্গভূমিতে শেওলা, তুলা তৃণ ও নলখাগড়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

আর্কটিক প্রেইরিতে বিভিন্ন প্রকার তৃণ এবং নলখাগড়ার *Carex* spp. প্রজাতি তুলা-ঘাস (*Eriophorum* spp.) ও কাষ্ঠল নলখাগড়াসহ (*Luzula* spp.) অনেক পুষ্পল বনানী যেমন—অ্যানেমন, ক্যাম্পিয়ন, বাটারকাপ, ম্যারিগোল্ড ও প্রিমরোজ (Anemones, Campions, buttercups, marigolds and primroses) লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ এলাকার আর্কটিক প্রেইরি ছাড়াও উচ্চ পতিত ভূখণ্ডের আলগা শিলা সমাবেশ ও নুঁড়িময় পৃষ্ঠে ভুঁইফোড়ের (*Cladonia* spp.) প্রাধান্য লক্ষণীয়। উত্তম পানি নিষ্কাশিত ও শুষ্ক হিথভূমিতে ধীর গতি বর্ধনের ঝোপ, প্রধানত ক্রোবেরী (*Empetrum nigram*) এবং অবভূমিতে লোমশ শেওলাসহ (*Rhacomitrium lanoginosum*) আর্কটিক গুল্ম (*Cassiope tetragona*) জন্মে থাকে। নিচু তলে অবস্থিত সমভূমি যেমন নিম্ন ম্যাকেঞ্জি উপত্যকা বা নিম্নমানের পানি নিষ্কাশিত আর্দ্র তুন্দ্রা এলাকা বা বর্গভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির শেওলা বিশেষ করে বগ শেওলা (*Sphagnum* spp.), ভুঁইফোড় ও তুলা তৃণের প্রজাতির (*Erophorum vaginatum*) প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

৬.২. ইউরেশিয়াটিক তুন্দ্রা (Eurasiatic Tundra)

ইউরেশিয়ার আর্কটিক তুন্দ্রা অঞ্চল উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া হতে শুধু শ্বেত সাগর (white sea) দিয়ে ভগ্ন অবস্থা ছাড়া অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে রয়েছে। এই অবিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সুমেরু সাগরের তীরাতিক্রান্ত কতগুলো দ্বীপও অন্তর্ভুক্ত। এই তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রস্থ প্রায় ৫০ কি.মি. হতে ৩২০ কি.মি. এর মধ্যে প্রকাশ পায়। অঞ্চলটির প্রস্থ পশ্চিম দিক অপেক্ষা পূর্বদিকে বেশি। ঢালু আর্কটিক সমভূমি চির তুষরাবরণে আবৃত। কিন্তু গ্রীষ্মের কয়েক মাস চিরস্থায়ী তুষারের উপরের স্তর জলমগ্ন অবস্থায় পরিণত হয়। এই জাতীয় এলাকার কিছু অংশ যেমন—নিম্ন ওব উপত্যকায় জলাভূমির বনানী বিকাশ লাভ করে। নিচু প্রায় সমতল এলাকায় শেওলা (*Polyrichum* spp.) এর প্রাধান্য বিদ্যমান এবং এই শেওলাজাতীয় বনানী কিছু কিছু স্থানে কয়েক ফুট গভীর আবরণ সৃষ্টি করেছে। শুষ্ক এলাকায় শেওলার পরিবর্তে লাইকেন (ছত্রাকবিশেষ) বিকাশ লাভ করে রয়েছে। এই বনানী অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় শেওলা ও লাইকেনের পরিবর্তে তৃণ, হোগলা এবং স্থায়ী গুল্ম

লক্ষ্য করা যায়। অরণ্য সীমার দূরে অবস্থিত হলেও অতি খর্বাকৃতি বার্চ উইলো বৃক্ষও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচরে আসে। এই গাছগুলোর উচ্চতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি এবং এগুলো আনুভূমিকভাবে বিস্তার লাভ করে থাকে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সর্বউত্তরে তুন্দ্রা অঞ্চলের ক্ষুদ্র অংশ বিদ্যমান। আলপাইন তুন্দার দীর্ঘাকৃতি অংশ উপদ্বীপটির শীর্ষ উচ্চভূমি (highland backbone) বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। নিম্নমানের পানি নিষ্কাশিত এলাকায় পিট বর্গের সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে সমৃদ্ধশীল ক্লাউড বেরি (cloud berries) বিকাশ লাভ করেছে। উত্তম পানি নিষ্কাশিত এলাকায় রেইনডিয়ার মসের *(Cladonia rangiferina)* প্রাধান্য লক্ষণীয়, কিছু কিছু অতি উত্তম স্থানে গ্রীষ্মকালীন তৃণভূমি (summer meadow) গড়ে উঠেছে। সাইবেরীয় তুন্দ্রা অঞ্চলকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। অঞ্চলটির পশ্চিমাংশে তৃণ, হোগলা ও স্থানীয় লতা এবং পশ্চিমাংশে শেওলা ও লাইকেনের প্রাধান্য বিদ্যমান।

৬.২.১. **দক্ষিণ গোলার্ধের তুন্দ্রা :** গ্রাহামল্যান্ড উপদ্বীপ ছাড়া সমগ্র আন্টার্কটিক মহাদেশে কোনো বনানী জন্ম লাভ করেনি। উপদ্বীপটিতে মাত্র দুই প্রজাতির পুষ্পল বনানী লক্ষ্য করা যায়। যেসব মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র এলাকায় কিছু সময় বরফ মুক্ত অবস্থা থাকে সেসব স্থানে শেওলা ও লাইকেন জন্মলাভ করে। উপ-কুমেরু দ্বীপসমূহ যেমন—কারগুয়েলেন ও ম্যাকাউরিতে উত্তর গোলার্ধের তুন্দ্রা অঞ্চলের অনুরূপ উদ্ভিজ্জ লক্ষ্য করা যায়। টেরাডোলফুয়োগোতে তুন্দ্রা প্রকৃতির হিথভূমির বনানী ও তৃণ বিদ্যমান।

৬.২.২. **হিথভূমি :** তুন্দ্রা এবং আলপাইন পরিবেশে হিথভূমি লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতি সীমিত আকারে হিথভূমি লক্ষ্য করা গেলেও হিথ বনানী পশ্চিম ইউরোপীয় ঈষৎ শীতবিশিষ্ট নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই হিথভূমি বর্ণিত পরিবেশের আটলান্টিক উপকূলীয় অঞ্চল এবং উত্তর ইউরোপীয় সমভূমিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

হিথ বনানী প্রধানত তিনটি শর্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শর্ত তিনটি হচ্ছে—(ক) উচ্চমাত্রার আপেক্ষিক আর্দ্রতা (খ) অতি উচ্চমাত্রার পানি নিষ্কাশিত অনুর্বর মৃত্তিকা (poverty stricken soils) এবং (গ) বৃক্ষের সাথে প্রতিযোগিতার মুক্ত অবস্থা। ইউরোপীয় হীদ বনানী পাতাঝরা অরণ্য এবং মিশ্র পাতাঝরা পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য মধ্যবর্তী এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। এলাকার উন্মুক্ততা বা অতি অনুর্বর মৃত্তিকা বৃক্ষের জন্মবিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বৃক্ষের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী আয়ার মৃত্তিকার ভূমিকাকে কম গুরুত্ব দিয়ে বায়ু প্রবাহের গতির প্রভাবের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হিথ বনানী বিকাশের ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহ একটি শক্তিশালী নিয়ামক। শক্তিশালী বায়ু প্রবাহিত উন্মুক্ত আর্দ্র কিন্তু উত্তম পানি নিষ্কাশিত পশ্চিম ইউরোপীয় আটলান্টিক মহাসাগরীয় সকল ঢাল এলাকায় হিথ বনানীর সমাবেশ বিদ্যমান। শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ এবং উচ্চতর এলাকার নিম্ন তাপমাত্রা বৃক্ষের জন্ম ও বিকাশকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু নিম্ন ভূমিতে হিথ বনানী বিদ্যমান এবং এক্ষেত্রে এলাকাটির অতি অনুর্বর মৃত্তিকা জড়িত। নিম্ন হিথভূমি দু'ভাগে বিভক্ত (ক) অম্ল সিলিকা মৃত্তিকার হিথ এবং (খ) চুনাপাথর এলাকার চুনো মৃত্তিকার হিথভূমি। উত্তর ইউরোপের সমভূমিতে শেষ বরফ যুগ, প্লিস্টোসিন বরফ শিটের

আগমন ও পরবর্তীকালে অপসারণের ফলে হিমান্তের মোটা বালি ও নুড়ি মিশ্রণের মৃত্তিকার আবরণ দিয়ে বিস্তীর্ণ নিচু মালভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণীর বুননের সঞ্চরণীয় অবক্ষেপণ অতি পানি প্রবেশ্যতার বৈশিষ্ট্য বহন করে। আবহবিকারের মাধ্যমে এই অবক্ষেপণ মৃত্তিকাতে পরিণত হওয়ার সময় পডজলিকরণ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে উচ্চমানের অম্লের বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকায় প্রকাশ পায়। অতি প্রবেশ্যতা ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে মৃত্তিকা সত্বর শুষ্ক হয়ে পড়ে। এই প্রকারের সবিরাম শুষ্কতা বৃক্ষের জন্ম ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তাই এসব এলাকায় হিথ বনানী হিথার বা লিঙ *(Calluna vulgaris)*, বেল হিথার *(Erica cinarea)*, ক্রশাকারের পাতার হিথ *(E. tetralix)*, গর্স *(Ulex spp.)*, বক্রতৃণ *(Agrosti spp.)* এবং তরঙ্গণ-চুল-ঘাস *(Descharnepsia flexuosa)* জন্মলাভ করে। পূর্ব নেদারল্যান্ডের গিস্টেল্যান্ড ও উত্তর জার্মানির লুনেবার্গ হিথ ভূমি বর্ণিত হিথভূমির উদাহরণ। পূর্ব আংলিয়ার টারসিয়ারি যুগের বালি ও নুড়ি মিশ্রিত অবক্ষেপণের সাহায্যে সৃষ্ট মৃত্তিকা এলাকায় এবং লন্ডন ও হ্যাম্পশায়ারের পর্যঙ্কে অনুরূপ হিথভূমি গড়ে উঠেছে। পূর্বের ব্যাপক হিথভূমিতে কিছু বৃক্ষ যেমন বার্চ এবং ইউ (birch and yew) এর সমাবেশ গড়ে উঠেছিল। তাই নিম্নভূমির হিথকে চরম পর্যায়ের বনানীর হিথভূমি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অতি অনুর্বর, সিলিকা ও অম্ল মৃত্তিকার প্রাকৃতিক শীর্ষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা গেলেও এই শ্রেণীর হিথভূমিকে প্ল্যাগিওক্লাইমাক্স হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ অবিরত চারণ ও পোড়ানো কার্যক্রমের ফলে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

চুনো হিথ চুনাপাথর দিয়ে সৃষ্ট মৃত্তিকায় গড়ে উঠে। এই শ্রেণীর হিথভূমি ক্ষুদ্রাকৃতির। ইংল্যান্ডের চক এবং কার্বনিফেরাস যুগের চুনাপাথর এলাকায় হিথভূমি গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় সুদীর্ঘ কালব্যাপী মানুষ বসবাস করে আসছে।

৬.৩. বনানীর উল্লম্ব বলয়

পার্বত্য এলাকায় জলবায়ুর সাহায্যে পৃথক পৃথক অনুঅঞ্চল উচ্চতার ফল যেমন—তাপের তারতম্যের দ্বারা উদ্ভব হয় তেমনি জলবায়ুর এই পরিবর্তন বনানীরও পরিবর্তন আনে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, উচ্চতা অক্ষাংশের অনুরূপ তাপের হ্রাসবৃদ্ধির উপর প্রভাব রাখে। এর ফল বনানীর উপরও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় কেবল তাপ দিয়ে নয় অন্যান্য নিয়ামক যেমন সৌরশক্তি, ভূমির ঢাল অবয়ব উন্মুক্ততা, মেঘ, বায়ুপ্রবাহ ও ভূমিরূপের ফলাফলের (orographic effects) দ্বারা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং শুধু উচ্চতার তারতম্যের ফলে পার্বত্য এলাকায় অক্ষাংশভিত্তিক ক্রান্তীয়, নাতিশীতোষ্ণ এবং মেরুদেশীয় বনানী গড়ে ওঠেনি যদিও বিস্তারণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্রমপর্যায়ের বনানীর সমাবেশের ক্ষেত্রে উচ্চতার কিছু প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অক্ষাংশভিত্তিক সমান্তরাল পর্যায়ের বনানীর সমাবেশ পার্বত্য এলাকায় প্রকাশ না পাওয়ার কারণগুলো বর্ণিত জলবায়ুর তারতম্যের সাথে জড়িত। তদুপরি পর্বত, উদ্ভিদ প্রজাতির স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পার্বত্য এলাকায় উল্লম্বভাবে সজ্জিত অসংখ্য অণু জলবায়ু বিদ্যমান। পার্বত্য বনানীর বৃহৎ বলয়ে ইহার প্রতিফলন স্থানীয় কারণে মোজেইকসদৃশ ভিন্ন ভিন্ন বনানী গোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে। সাধারণভাবে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তাপ কমতে থাকে এবং বৃষ্টি, বরফপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পার্বত্য এলাকায় তাপের সাহায্যে, জলীয় পদার্থের

সাহায্যে নয়, বনানী নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের অপর্যাপ্ততা বৃক্ষ বা ঘাস জন্মানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা না পেলেও মেঘের কণার অতিরিক্ত জলীয় পদার্থের অবক্ষেপণ হতে বনানীর জলীয় পদার্থ সংগৃহীত হয়। যেমন পেরুর পর্বতের ঢালে লোমাস (Lomas) সমুদ্র কুয়াশার সাহায্যে বিকাশ লাভ করেছে। বনানীর ক্রমবিকাশ ও বিস্তারণের ক্ষেত্রে বৃষ্টিচ্ছায়া এলাকা এবং ঢাল ও অবয়বের কারণে সৌরশক্তি ও আলোর পরিমাণের তারতম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তদুপরি মধ্য অক্ষাংশ ও উচ্চ অক্ষাংশের পার্বত্য এলাকার অনুরূপ নিম্ন অক্ষাংশের পার্বত্য এলাকার জলবায়ু ঋতুভিত্তিক তারতম্যের ছন্দ প্রকাশ করে না। ফলস্বরূপ বিভিন্ন অক্ষাংশ অঞ্চলের পার্বত্য এলাকার উদ্ভিদকুলের মধ্যে তারতম্যের প্রতিফলন ঘটে।

ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের উল্লম্ব বনানী অঞ্চল উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে তাপ ও বৃষ্টি বরফপাতের তারতম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "উষ্ণ দেশ" বা টিয়েরা কালিয়েন্টি ("Hot country" or tierra caliente) হচ্ছে নিচু অঞ্চল। এই এলাকার উচ্চতা হচ্ছে ৯০০ মিটারের কম। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। ফলে ক্রান্তীয় অরণ্য এই এলাকায় গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের উর্ধ্বে "ক্রান্তীয় দেশ" বা টিয়েরা টেমপ্লেড়া ("temperate country" or tierra templada) অবস্থিত। অঞ্চলটি ৯০০–১,৮০০ মিটার উঁচু এলাকা নিয়ে গঠিত। এখানকার তাপমাত্রা ২৪° সে. এবং ১৮.৫° সে. এর মধ্যে উঠানামা করে। এখানে ক্রান্তীয় অরণ্যের পরিবর্তিত রূপের বনানী বিদ্যমান। এই অঞ্চলের উর্ধ্বে "শীতল দেশ" বা টিয়েরা ফ্রায়া ("Cold country" or trierfria) অবস্থিত। এর উর্ধ্বসীমা ৩,৩০০ মিটার (১১,০০০) এবং এই সীমা গড় বাৎসরিক ১২° সে. (৫৪° ফা.) সমতাপ রেখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই বলয়ে অরণ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে স্থূল তৃণে পরিণতি লাভ করেছে। এর উর্ধ্বে বরফ দেশ (tierra nevad) বা তুষারভূমি (helade) অবস্থিত এবং অঞ্চলটি ৪,৫০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে আলপাইন চারণভূমি, প্যারামোস (paramos) গড়ে উঠেছে। ক্রান্তীয় আফ্রিকার ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির বনানী অঞ্চলগুলো হচ্ছে :

১) কোল্লা (Kolla) নিম্নাঞ্চল–এর উচ্চতা ১,৮০০ মি. (৬,০০০)। এটি ক্রান্তীয় অরণ্য অঞ্চল।

২) ভয়না ডেগা (Voina dega)–এর উচ্চতা ১,৮০০ মি. হতে ২,৪০০ মিটার (৬,০০০–৮,০০০)। অরণ্য পাতলা হতে আরম্ভ করে কাষ্ঠল লতাসহ বৃক্ষ, বাঁশঝাড় এবং ঘাসের কিছু এলাকা অঞ্চলটিতে প্রকাশ পায়।

৩) শেষ অঞ্চল হচ্ছে ডেগা বা মূল উচ্চভূমি (Dega or true highlands)। এ অঞ্চলটি ২,৪০০ মিটার (৮,০০০) অপেক্ষা উঁচু উন্মুক্ত তৃণ এলাকা নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিন্দু আকারের ঝোপ ও ঘাসসহ ঊর্ধ্বে ৪,০৫০ মিটার (১৩,৫০০) উচ্চতায় অ্যালপাইন উদ্ভিদকুলের সাথে মিশ্রিত হয়েছে।

মধ্য অক্ষাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অনুরূপ বনানী এলাকা গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ামক বনানীর প্যাটার্ন গড়ে তুলেছে। এখানকার উচ্চতা সীমা কম এবং বনানীর উচ্চতাও কম। উষ্ণ আর্দ্র অরণ্য লক্ষণীয় নয়। ঋতুভিত্তিক আবহাওয়ার উপাদানের তারতম্য যেমন সূর্যের আলোর স্থায়িত্বকাল ও তীক্ষ্ণতা এবং ঋতুভেদে তাপের তারতম্য বনানীর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে (চিত্র ৬.১)। মধ্য অক্ষাংশের আর্দ্র নিম্নভূমি অঞ্চল ও শুষ্ক সমতলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকায় বনানী মডেল প্রকাশ করেছে।

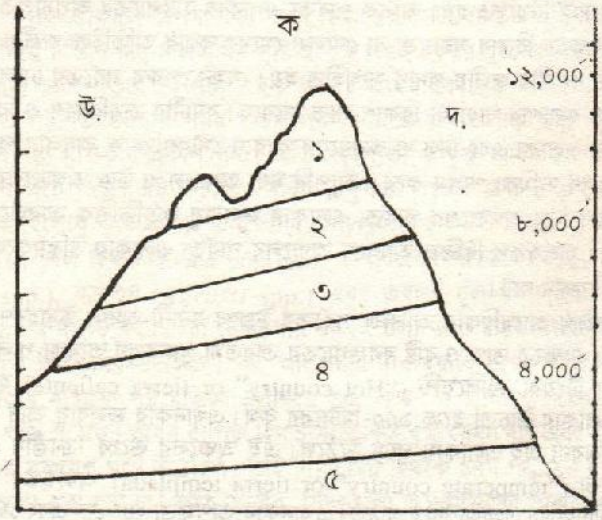

আল্পস (ইউরোপ) ৪৫° উ.

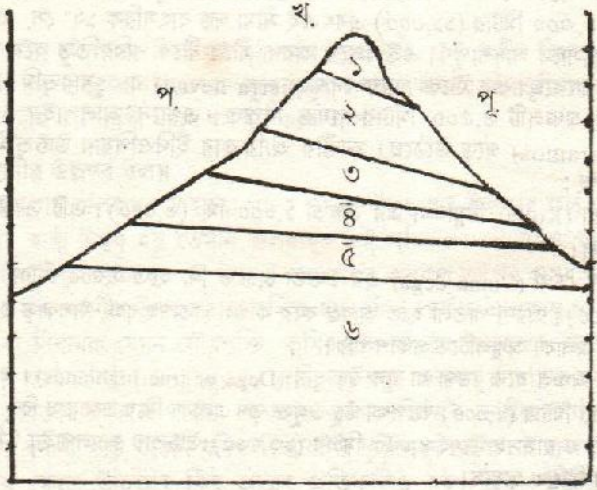

সানফ্রানসিসকো সিসকো শৃঙ্গ (আরিজোনা)

চিত্র ৬.১. উচ্চতাভিত্তিক বনানী অঞ্চল।

(ক) ১. আলপাইন তুষার, ২. আলপাইন ও গুল্ম অরণ্য, ৩. সরলবর্গীয় অরণ্য, ৪. পর্ণমোচী (পাতাঝরা) অরণ্য, ৫. ভূমধ্যসাগরীয় চিরসবুজ অরণ্য

(খ) ১. আলপাইন অঞ্চল ২. স্প্রুস অরণ্য ৩. ডগলাস ফার, ৪. পোনডারোনা পাইন ৫. পিনিয়ন পাইন, ৬. মরু গুল্ম

সপ্তম অধ্যায়

প্রাণী : ভূ-পরিবেশগত প্রেক্ষাপট

৭.০. জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখা : প্রাণিভূগোল

জীববিদ্যার এক প্রধান শাখা হচ্ছে প্রাণিবিদ্যা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ ও প্রাণিকুলের তুলনামূলক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রাণিবিদ্যা আলোচনা করে। এই বিষয়ের অনেক শাখা বিদ্যমান। প্রধান প্রধান শাখাগুলো হচ্ছে ভ্রূণবিদ্যা, জীব-দেহতন্ত্রবিন্যাসবিদ্যা, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, বাস্তব্যবিদ্যা প্রভৃতি। এসব শাখার প্রপঞ্চের ভৌগোলিক বিস্তারণের জ্ঞানের সমন্বয় চিত্র প্রাণী এবং পরিবেশের মধ্যের সম্বন্ধের মূল্যায়ন ও বোধগোম্যতার স্বচ্ছতা গড়ে তোলে।

প্রাণিভূগোল হচ্ছে প্রাণিবিদ্যা ও ভূগোল উভয় বিষয়ের মিলিত এক শাখা। দুই বিষয়—ভূগোলবিদগণের প্রাণিভূগোল এবং প্রাণিবিজ্ঞানীদের প্রাণিভূগোলের বিষয়বস্তু স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়। প্রাণিভূগোল পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণীর বিস্তারণ বিশেষ করে পরিবেশের প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাণীর গুরুত্বও এর সাথে জড়িত।

ভূগোলের শাখা হিসেবে জীবভূগোল গুরুত্ব পেলেও এর দুই অংশ উদ্ভিদভূগোল ও জীবভূগোলের মধ্যে উদ্ভিদভূগোল বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। অথচ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই উপশাখার বিষয়বস্তু যেমন প্রাণীর বিস্তারণ ছাড়াও পুরাজীবীর প্রাণীর বাস্তব্যবিদ্যা, রোগবালাইয়ের বিষয়বস্তু, মানুষের খাদ্য হিসেবে প্রাণিজগতে নতুন উৎসের সন্ধান, প্রাণীর মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য প্রভৃতি ক্ষেত্র অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত।

অতীতে প্রাণীর প্রতি মানুষের এক আশ্চর্যজনক মোহ ছিল। তাই রূপকথার প্রাণী, ইউনিকর্ন (প্রাচীন গ্রিক ও রোমান লেখকদের ভারতের অশ্বতুল্য দেহযুক্ত প্রাণী বিশেষ), বর্তমানে হিমালয়ের ইয়াটি (Yati), ক্রাকেন (Kraken) এবং রক (Roc) রূপকথার বৃহৎ পাখি ছোঁ মেরে হাতিকেও নিতে পারে—এর উদ্ধৃতি বিভিন্ন লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। আনুমানিক ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাদেশগুলোর অভ্যন্তরভাগের আবিষ্কারের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু নতুন ধরনের প্রাণীর আবিষ্কার প্রাণিভূগোলের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। ফলে আঞ্চলিক প্রাণিগ্রুপের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অঞ্চল নির্দিষ্টকরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে এবং পৃথিবীভিত্তিক এক গুরুত্বপূর্ণ জীব ভূ-প্রাণি অঞ্চল বিজ্ঞানী স্ক্ল্যাটারের (১৮৫৮) মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

ডারউইন এবং ওয়ালেসের জীবের ক্রমবিকাশের ধারণা এবং জীবাশ্মবিজ্ঞানের (Paleontology) জীবাশ্মভিত্তিক প্রাণীর ক্রমবিকাশের জ্ঞান ঐতিহাসিক প্রাণিভূগোল গড়ে

তুলতে সাহায্য করেছে (চিত্র ৭.১)। বিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে ঐতিহাসিক প্রাণিভূগোলের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্তমানে এই শাখার উপর আবার গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অন্যদিকে নতুন জ্ঞানের শাখা, বাস্তব্যবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের জ্ঞানের কৌশল পরিবেশীয় নিয়ামক অতীতের আঞ্চলিক প্রাণিভূগোলকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। বিজ্ঞানী জে.এল. ডেভিস এর মতে, অতীতের আঞ্চলিক প্রাণিভূগোল এবং নতুন বাস্তব্যবিষয়ক প্রাণিভূগোল (old regional zoogeography and ecological zoogeography) বাস্তব ক্ষেত্রে একই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য স্কেলের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পায়। তাঁর মতে, প্রাণীর বাস্তব্যবিষয়ক এবং ভৌগোলিক বিস্তারণের পার্থক্য কৃত্রিম এবং দুঃখজনক উভয়ই নির্দেশ করে। প্রাণিভূগোলের আওতাক্ষেত্রের গুরুত্ব হেস, অ্যালি এবং স্পিডত–এর বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, ঐতিহাসিক প্রাণিভূগোলের প্রায় সকল ক্ষেত্রে দূরকল্পী (speculative) প্রকৃতি প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তব্য জীবভূগোল সত্যিকার অর্থে নিয়ামকভিত্তিক বিজ্ঞানের বীজ বহন করে (Hesse, Allee and Smidth, who say—"In contrast with the speculative nature of much of historical zoogeography, ecological zoogeography bears the germs of a more truely casual science)।"[১]

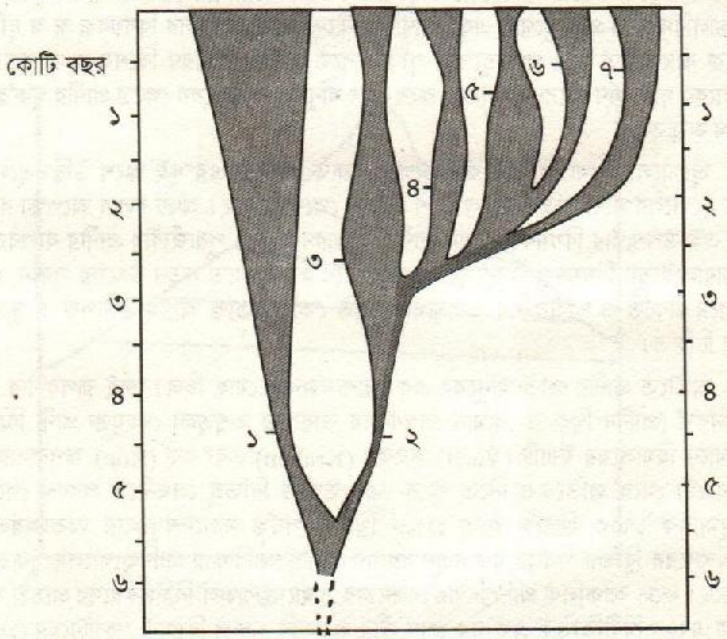

চিত্র ৭.১. নাতিশীতোষ্ণ প্রাণীর ক্রমবিকাশ
১ - অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ২ - মেরুদণ্ডী প্রাণী, ৩ - মাছ,
৪ - উভচর প্রাণী, ৫ - সরীসৃপ, ৬ - পাখি, ৭ - স্তন্যপায়ী প্রাণী।

১. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 35.

৭.১. প্রাণীর প্রকৃতি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রাণীকে প্রধানত (ক) মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং (খ) অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী প্রাণী মেরুদণ্ডীবিহীন। প্রাণিবিজ্ঞানীগণ প্রাণীকে (ক) প্রোটোজোয়া (Protozoa) (খ) প্যারাজোয়া (Parazoa) এবং (গ) মেটাজোয়া (Metazoa)—এই তিন উপরাজ্যে (sub-kingdom) বিভক্ত করেছেন। প্রোটোজোয়া হচ্ছে এককোষী জীব। ক্ষুদ্রাকৃতি এসব জীবের দেহ একক অভগ্ন সমন্বয়ের জৈব পদার্থের সাহায্যে তৈরি। প্যারাজোয়া হচ্ছে বহুকোষী নিম্ন পর্যায়ের জীব এবং এগুলো একক গোত্রবিশিষ্ট যেমন পোরিফেরা বা স্পঞ্জ। মেটাজোয়া হচ্ছে বহুকোষী জীব। এই প্রাণীগুলোর দেহকোষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী। এই অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো কিছু বিশেষ কার্যক্রম সমাধা করে। এই উপসর্গে বহু সংখ্যক প্রাণী অন্তর্ভুক্ত এবং উপসর্গটির অনেক পর্ব (Phyla) বিদ্যমান।

প্রোটোজোয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অণুবীক্ষণিক এককোষী জীব। অন্য জীব হতে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে যে, এগুলোর দেহের পদার্থ কোষে বিভক্ত নয়। ফোরামিনিফারা ও রেডিওলারিয়া প্রোটোজোয়ার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অতি প্রাচীন জীব এবং এদের একক প্রোটোপ্লাজমের দেহ চুনা কাঠামোর দ্বারা আবৃত থাকে। এই সামুদ্রিক জীবগুলো অবাধ জীবনযাপন করে এবং মৃত্যুর পর এদের দেহ সমুদ্রের সিন্ধুমল (যেমন গ্লোবিজারিনা সিন্ধুমল) সৃষ্টি করে।

প্যারাজোয়া হচ্ছে একক স্পঞ্জের বর্গ (single phylum of sponges)। এগুলো সহজ বৈশিষ্ট্যের বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী (simple multicellular aquatic animals)। এগুলোর স্পঞ্জের দেহের বহিরাবরণে ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান। এই ছিদ্রগুলোর সাহায্যে পানি মুক্তভাবে এগুলোর দেহের কোষীয় কাঠামোতে প্রবেশ করে। পানি হতে স্পঞ্জ খাবার ও অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এগুলো মুক্ত সাঁতারু (free swimming) জীব নয়। তাই এগুলো স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজমান।

মেটাজোয়া বর্ণিত দুই উপসর্গের জীব হতে পৃথক। এগুলো বহু বর্গে বিভক্ত এবং জীবগুলোর বিভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দেহকোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিশেষ বিশেষ কাজ সমাধা করে। জীবগুলো কমপক্ষে ২০টি প্রধান বর্গে বিভক্ত। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্ব (Phylum), করডাটা (Chordata) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বর্গের মধ্যে মাছ, উভচর প্রাণী (Amphibia), সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। করডেট প্রাণিবর্গের (Chordates) অনমনীয় মেরুদণ্ড বা মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি রেখাসহ অস্থি সজ্জিত দেহকাঠামো বিদ্যমান।

মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অনুযায়ী এই বর্গ (ক) অনমনীয় মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অনুযায়ী তিনটি উপপর্ব এবং (খ) অস্থিসন্ধি মেরুদণ্ডী প্রাণী একক উপবর্গে বিভক্ত। মেরুদণ্ডী প্রাণী ছয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে—

১. সাইক্লোসটোমাটা (Cyclostomata) প্রায় ১০ প্রজাতি।
২. পিসকেস (Pisces) বা প্রকৃত মাছ প্রায় ২০,০০০ প্রজাতি।
৩. উভচর (Amphibia) প্রায় ২,৮০০ প্রজাতি।
৪. রেপটালিয়া (Reptalia) প্রায় ৭,০০০ প্রজাতি।

৫. অ্যাভিস বা পাখি (Aves) প্রায় ৮,৬০০ প্রজাতি এবং
৬. স্তন্যপায়ী (Mammalia) পাখি প্রায় ৫,০০০ প্রজাতি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর শক্তি এবং নমনীয়তা প্রাণিজগতে এগুলোর ব্যাপক সফলতা বয়ে এনেছে। প্রাণীগুলো উন্নতমানের পরিপাক শক্তি, শ্বসন সংক্রান্ত এবং নার্ভযুক্ত পদ্ধতির দেহ-কাঠামোর অধিকারী। ফলে অনেক প্রাণী দ্রুত চলাচল করে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর উপবর্গের সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০।

৭.২. প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানী ডি মারটন (De Martone) লিখেছেন যে "প্রাণী উদ্ভিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হ্রাস হারে বাহ্যিক প্রভাবের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে বশ্যতা মেনে নেয় এবং এরা অত্যন্ত প্রবলভাবে এদের অস্তিত্বের বিপক্ষে যে কোনো বাধার উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে" ("Animals are even less than plants, not passively obedient to external influences and they react vigorously against anything that threatens their existence")।[২] প্রাণী ও বনানীর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা ও চলাচলের ক্ষমতা বিদ্যমান। কিন্তু বনানীর এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় নেই। বনানীর অনুভূতির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও বনানী চিন্তা করতে পারে না। কারণ বনানীর মস্তিষ্ক নেই। যেহেতু উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা রয়েছে সেহেতু প্রাণী বাধা বিপত্তি হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। আক্রমণকারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন আগুন বা বন্যার সাহায্যে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে প্রাণী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বা পলায়ন করতে পারে এবং বেঁচে থাকে। কিন্তু বনানী এই প্রকার কোনো কাজ করতে না পারার কারণে মারা যায়।

প্রাণীর স্থানান্তরে চলাচলের ক্ষমতা রয়েছে। উচ্চতর প্রাণীর এই ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। অনেক প্রাণীর ঋতুভিত্তিক স্থানান্তরে যাওয়ার অভ্যাসও বিদ্যমান। বর্ণিত দুই ক্ষমতা ; বুদ্ধিমত্তা ও চলাচলের বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাণীর বসবাসের স্থান অতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এজন্য প্রাণীর রাজ্য বনানীর রাজ্য অপেক্ষা অধিক এলাকা দখল করে থাকে। প্রাণিজগতের একক প্রাণীর জীবনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বনানী জগতের একক শ্রেণীর পার্থক্য অপেক্ষা বেশি লক্ষণীয়। উদ্ভিদ জগতের মাশরুম (mushroom), নল-খাগড়া (reed), রোডোডেনড্রন (Rhododendron), তালগাছ এবং দৈত্যানুরূপ রেড উড (giant redwood) এর মধ্যে যে পার্থক্য তারচেয়ে বেশি পার্থক্য বাগদা চিংড়ি ও তিমি, অপ্রিচ প্রজাতি এবং বাঘের মধ্যে বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কিছু উপরিপাতভিত্তিক (overlapping) মিল থাকলেও সামুদ্রিক প্রাণী, স্থল প্রাণী এবং ডানাবিশিষ্ট প্রাণীর প্রধান গ্রুপের মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। অতি নগণ্য সংখ্যক বনানী যেমন গুহার অভ্যন্তরীণ ও পানি বনানী ছাড়া সকল বনানীর জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। অন্যদিকে প্রাণী আলোর অতি প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল নয়। অনেক জীব ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং অন্যগুলো সমুদ্রের গভীরতম নির্জন স্থানে (recesses) বাস করে। নগণ্য সংখ্যক বনানীর (মানুষ দ্বারা বিস্তারণের ব্যাপন ছাড়া) পৃথিবীব্যাপী বিস্তারণ লক্ষণীয়। অন্যদিকে প্রায় সকল প্রাণী বৃহৎ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। জলবায়ুর নিয়ামক

২. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 35.

প্রাণীর বিস্তারণ অপেক্ষা বনানীর বিস্তারণের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়াও বনানীর বিস্তারণ অপেক্ষা প্রাণীর বিস্তারণ অত্যন্ত জটিল।

৭.৩. প্রাণীর পরিবেশীয় অভিযোজন

বনানী যেমন পরিবেশীয় বিশেষ করে জলবায়ু বিষয়ক অবস্থায় অভিযোজিত হয় তেমনি প্রাণীর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য। বিশেষ বিশেষ প্রজাতির প্রাণী নির্দিষ্ট বাসভূমির পরিবেশ পছন্দ করে। যেমন কিছু সংখ্যক জীব মৃত্তিকায় বাস করে। আবার অন্যগুলো পানি সংলগ্ন এলাকা, জলাভূমির পরিবেশ এবং কিছু জীব সারা জীবন গাছের উপর বসবাস করে থাকে।

মৃত্তিকায় বাসকারী জীব টেরিকোলে (Terricolae) নামে পরিচিত। কেঁচো, বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়, তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট প্রাণী (Rodents) এবং ছুঁচা (Moles) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গর্তে বসবাসকারী জীব নৈশ অভ্যাসের অধিকারী এবং বন্ধ্যা শীত ঋতুতে এই জীবগুলো মাটির অভ্যন্তরভাগকে দীর্ঘকালীন আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে। অনেক টেরিকোলাস জীব বিশেষ ধরনের অভিযোজনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই শ্রেণীর অনেক জীব মাটি খোঁড়ার জন্য শক্ত নখরবিশিষ্ট সম্মুখ পা, মাটি নিক্ষেপের জন্য পশ্চাৎ পায়ের থাবা (spatulate hindpaws), চ্যাপটা চামচ আকারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ সূচালো মাথা, মুখের বর্হিপ্রান্তে প্রক্ষিপ্ত শক্ত দাঁত এবং ক্ষুদ্র বা অবলুপ্ত প্রায় (rudimentary) লেজের অধিকারী। মাটির অভ্যন্তরে আলোর অভাবের (dispenses with) কারণে টেরিকোলাস জীবের দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ বা অন্ধত্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। অ্যাকুইকোলে (Aquicolae) জাতীয় জীব আর্দ্র পরিবেশে আকৃষ্ট হয়। বিভার (Beaver) এবং উদ্বিড়াল বা ভোঁদড় (otter) উপ-জলজ (semi aquatic) জীবনযাপনে অভ্যস্ত। খাদ্যের উৎসস্থল জলাশয়, নদী, হ্রদ প্রভৃতির পার্শ্ববর্তী পরিবেশ অনেক পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবকে আকর্ষণ করে। পাখি ব্যতিক্রমধর্মী চঞ্চু, লিপ্ত পদাঙ্গুলিবিশিষ্ট পা (webbed feet) এবং অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ পায়ের অধিকারী হয় যেমন বক, মরাল (Elamingo—a tropical bird)। উপ-জলজ স্তন্য পায়ী-জীব যেমন বিবর ও ভোঁদড় নমনীয় ও তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্যানুরূপ দেহ (lithe and stream lined bodies), লুপ্ত পদাঙ্গুলিবিশিষ্ট পা এবং মোটা লোমবিশিষ্ট দেহের অধিকারী হয়। জলহস্তীর (উপ-জলজ প্রাণী হিসেবে) কান, চোখ এবং নাক মাথার খুলির উর্ধ্বাংশে অবস্থিত যেন কাদা ও পানির পরিবেশে এগুলো উর্ধ্বে অবস্থান করে।

গাছে বসবাসকারী প্রাণীর যেগুলো আরবোরিকোলে (Arboricolae) নামে পরিচিত সেগুলোর গাছে উঠা, লাফ দেয়া ও সহজে চলাচলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান। গাছে বাস করার জন্য উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ দীর্ঘ সম্মুখ বাহু, ভারসাম্য রক্ষার বৃদ্ধাঙ্গুলি (opposable thumb), দীর্ঘ পদাঙ্গুলি এবং আঁকড়িয়ে ধরতে সক্ষম (Prehensile), লেজ বিদ্যমান। উড়ন্ত লেমুর (flying lemur) এবং উড়ন্ত কাঠবিড়ালের (flying squirrel) দেহ এবং পূর্ব পা বা হাত সংলগ্ন স্থানে ঝিল্লির (membranes between the limbs and body) বিকাশ লাভ গাছের শাখা হতে শাখায় চলাচলে সাহায্য করে। প্রায় সকল আরবোরিকোল প্রাণী বনানীভোজী।

মাধ্যম। ভূ-পৃষ্ঠই প্রাণীর (terrestrial animals) বেশি বা কম পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। অনেক প্রাণী যেমন যথেষ্ট জলীয় পদার্থের উপর নির্ভরশীল এবং এই জীবগুলো অতি আর্দ্র অবস্থায় বাস করে, তেমনি অনেকগুলো আবার শুষ্ক অবস্থা সহ্য করতে পারে এবং শুষ্ক বাসভূমি পছন্দ করে। উচ্চমাত্রা এবং অতি কম পরিসরের পরিবর্তনশীল বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পের পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণী স্টেনোহিগ্রিক (stenohygric) নামে পরিচিত। উভচর জীব, পোকামাকড়, প্রায় সকল শ্রেণীর শামুক, জলহস্তি এবং জলচর মহিষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যদিকে যেসব জীব বায়ুমণ্ডলের ব্যাপক পরিবর্তনশীল জলীয় বাষ্পের অবস্থা সহ্য করতে পারে সেগুলো ইউরিহিগ্রিক (euryhygric) শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর জীব সাধারণত কীট, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রাণীর উপর বৃষ্টিপাতের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট নয়। পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত বনানী প্রাণীর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

উপাদান হিসেবে তাপ প্রাণীকে প্রভাবান্বিত করে। অনেক প্রজাতির প্রাণী যেমন উচ্চ তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে তেমনি অনেকগুলো আবার নিম্নমানের তাপ সহ্য করতে পারে। প্রাণীর সহ্য সীমার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পরিসর হচ্ছে হিমাঙ্ক সীমার কিছু নিচের তাপ হতে ৫০° সে.। অনেক প্রাণী সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখে শীতের নিম্নতাপের ফলাফলকে সহ্য করে থাকে। সাধারণত একক প্রজাতির প্রাণী কম পরিসরের তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। যেসব প্রাণী ব্যাপক পরিসরের তাপ সহ্য করতে পারে সেগুলো ইউরিথারমাল (eurythermal) নামে পরিচিত যেমন স্পার্ম তিমি (sperm-whale) এবং কিছু সংখ্যক শিকারী বিড়াল (predatory cats)। অন্যদিকে যেসব প্রাণী কম পরিসরের তাপ সহ্য করতে পারে সেগুলো হচ্ছে স্টেনোথারমাল (stenothermal) যেমন কুমির ও পেঙ্গুইন।

প্রাণী বনানীর মতো আলোর উপর ততো নির্ভরশীল নয়। মৃত্তিকা, গুহা এবং গভীর পানিতে বসবাসকারী প্রাণী তাদের সম্পূর্ণ জীবন অন্ধকারে কাটায়। যদিও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা সহ্য করতে বা অনেক উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বেশকিছু সময়ের জন্য আলো পরিহার করে চলতে পারে তবুও প্রায় সকল প্রাণীর আলোর প্রয়োজন পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আলো প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে থাকে। মরুভূমি এবং অতি উঁচু এলাকায় তীক্ষ্ণ সূর্যকিরণের কারণে প্রাণী গাঢ় বর্ণে অভিযোজিত হয়ে পড়ে। সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের স্পোর এবং অনেক আণুবীক্ষণিক জীব যথেষ্ট সূর্যালোক সম্পাতের (sufficient exposure) অতি বেগুনি রশ্মির বিকিরণের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করে।

অতি উঁচু স্থান ছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্য জীবের বসবাসের পরিবেশের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। উচ্চ স্থানে কম পরিমাণের চাপের প্রভাব অপেক্ষা অক্সিজেনের স্বল্পতার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের অত্যন্ত গভীরে বসবাসকারী মাছ শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্যের সাহায্যে অধিক চাপ সহ্য করে থাকে।

৭.৪.১.২. বনানী : ব্যাপকভাবে প্রাণী জীবনকে বনানী দুই পদ্ধতি (ক) নির্দিষ্ট শ্রেণীর বাসস্থান এবং (খ) খাদ্য সরবরাহের সাহায্যে প্রভাবিত করে। অনেক প্রাণী বাসভূমির প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত হয়ে পড়ে যেমন বনাঞ্চল বা তৃণভূমির প্রাণী। প্রায় ক্ষেত্রেই বনানীর প্রকারের উপর প্রাণীর শ্রেণীর বিস্তারণের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। বৃক্ষচারী প্রাণী

কদাচিৎ তৃণভূমিতে এবং তৃণভক্ষণকারী খুরবিশিষ্ট প্রাণী (eating ungulates) কদাচিৎ ঘন বনাঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যাভ্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক প্রাণী সম্পূর্ণরূপে তৃণভোজী। এগুলো তৃণের উপর নির্ভরশীল, যেমন—কৃষ্ণসার মৃগ (antilope) ও ঘোড়া। আবার অনেক প্রাণী সম্পূর্ণরূপে মাংশাসী (carnevores)। এগুলো অন্য জীব শিকার করে জীবনধারণ করে যেমন—বিড়াল গোত্রের প্রাণী। এই দুই শ্রেণী ছাড়াও যে প্রাণীগুলো বনানী ও প্রাণী উভয়ই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলো সর্বভুক (omnivorous) নামে পরিচিত, যেমন—কাক এবং ভল্লুক। সর্বভুক প্রাণী ইউরিফেগাস *(Euryphagous)* নামে পরিচিত। যেসব প্রাণী বনানী ভোজী ও মাংশাসী উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেগুলো স্টেনোফেগাস নামে পরিচিত। মাংশাসী প্রাণী ও তৃণভোজী প্রাণী উভয়ই সীমিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা ব্যাপক পরিসর স্কেলের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় যেমন ইউরিফেগাস স্টেনোফেগাস মাংসাশী এবং ইউরিফেগাস স্টেনোফেগাস তৃণভোজী প্রাণী। মাংসাশী প্রাণী অধিকাংশই ইউরিফেগি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং এই প্রাণীগুলো ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভ করে রয়েছে। স্টেনোফ্যাগির বিস্তারণ এই দৃষ্টিকোণ থেকে সীমিত।

প্রাণিবিদ্যাবিদগণ বনানীর অনুরূপ প্রাণীর পার্থক্যসূচক গ্রুপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। কারণ প্রায় সকল উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ব্যাপক জলবায়ু-পরিসর অঞ্চলে বিদ্যমান। এই ব্যাপকভিত্তিক বিস্তারণ প্রাণীর চলাচলের ক্ষমতার সাথে বুদ্ধিমত্তা জড়িত যা বনানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বনানীর অনুরূপ প্রাণী পরিবেশের সাহায্যে প্রভাবান্বিত হলেও এই প্রভাবের মাত্রা এক নয়। বনানীর প্রকার যা প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা প্রাণীকে গ্রুপ আকারে সমাবেশ করতে সাহায্য করে। এই সম্বন্ধ তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এবং মাংসাশী প্রাণীর (যদি প্রাণীগুলো তৃণভোজী প্রাণীকে শিকার করে) ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বিস্তারণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণীর আঙ্গিক গঠনের অভিযোজন এক নির্দিষ্ট বনানী শ্রেণীর খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীর এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিবানোর জন্য নিপুণ দাঁত, দীর্ঘ জিহ্বা এবং বৃহৎ পাকস্থলী বিদ্যমান। অন্যদিকে অনেক প্রাণী বনানীর বৈশিষ্ট্যের কারণে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অভিযোজন প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ক্রান্তীয় অরণ্যের বৃক্ষবাসী প্রাণীর (arboreal denigens) উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। প্রাণী এবং বনানী অঞ্চলের অতি ব্যাপক এই সহসম্বন্ধ (broad correlation) বিজ্ঞানী ফিলব্রিকের (Philbrick) কথায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, সাধারণত অখণ্ডনীয় প্রাণীর গোত্রসমূহকে অরণ্য, সাভানা, তৃণ ভূমি এবং মরু বাসভূমির সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। এতদসত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন বনানী অঞ্চলের প্রাণী জীবনের অস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রাণী অঞ্চল গঠন করতে সাহায্য করে না। তদুপরি দেখা গেছে যে, একই প্রজাতির প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে বাস করে।

সাধারণত সকল জীবন্ত জীবাণুর পুনরুৎপাদন বিস্ময়করভাবে দ্রুত গতিসম্পন্ন (astonishing rapidity)। কেননা প্রকৃতিগতভাবে এই জীবাণুগুলোর ব্যাপক এলাকায় বিস্তার লাভের পন্থা বিদ্যমান। কিন্তু এই বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা জৈবিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা এলাকার সকল জীবন বিলুপ্তির পর অতি দ্রুতগতিতে এসব এলাকায় পুনরায় জীবাণুর কলোনি গড়ে উঠেছে। এইক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ ক্রাকাটোয়ার উদ্ধৃতি দেয়া যায়। এই দ্বীপে ১৮৮৩

সালে এক অতি সর্বনাশা এবং ব্যাপক আকারের অগ্নুৎপাত সংঘটিত হয়। এই ব্যাপক আকারের সর্বনাশা অগ্নুৎপাতের ফলে দ্বীপটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ উড়ে যায় এবং আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত ভগ্নস্তুপ অধঃক্ষেপিত হওয়ার ফলে সমগ্র দ্বীপটি ছাই ভস্মের পুরু স্তরে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। ফলে দ্বীপটির সকল বনানী এবং সম্ভবত বিশেষ এক প্রজাতির কেঁচো ছাড়া সকল প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। সত্তর এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের দ্বীপটিতে জীবন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। তিন বছরের মধ্যে শৈবাল, ফার্নের কিছু প্রজাতি এবং বারটিরও বেশি পুষ্পোদ্গম উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচরে আসে, ছয় বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণী, মাকড়সা, কাঁচপোকা, প্রজাপতি এবং এক প্রজাতির টিকটিকি বা গিরগিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পঁচিশ বছর পর ২৬৩ প্রজাতির প্রাণী নির্ণয় করা হয় এবং ৫০ বছর পর একটি কুমির ও একটি পাইথন (*Python*)সহ প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০তে। ক্রাকাটোয়া দ্বীপের নিকটবর্তী স্থলভাগের দূরত্ব মাত্র ১১.৫ মাইল এবং যেহেতু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে এই স্থলভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি সেহেতু ক্রাকাটোয়া দ্বীপের নতুন বাসিন্দা (inhabitants) নিশ্চয়ই বায়ু অথবা পানি বা অন্য কোনো "দৈবক্রমে সংঘটিত বিস্তার মাধ্যম" ("fartuitous dispersal") দ্বারা দ্বীপটিতে অর্থাৎ ক্রাকাটোয়ায় পৌঁছেছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ অসীম নয়, বিস্তারণ কিছু সংখ্যক নিয়ামক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এগুলো হচ্ছে :

ক) বিভিন্ন জীবাণুর বিস্তার লাভের ক্ষমতা অত্যন্ত অসম।

খ) বিস্তার লাভ সকল দিকে সফলভাবে সংঘটিত হয় না।

গ) জীবাণুর দেহ কাঠামো জীবাণুর চলাচল বা গতিকে সীমিত করে রাখে।

ঘ) প্রাকৃতিক অবস্থা জীবের চলাচলের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বাঁধার সৃষ্টি করে।

ঙ) জৈব পরিবেশও বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

বিজ্ঞানী Allee এবং Smidth উল্লেখ করেন, (জীব) প্রজাতির সম্ভাব্য বিস্তারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে। বিস্তার লাভের জন্য জীবাণুর কৌশলের বৈশিষ্ট্য এবং জীবাণুর জীবনী ও অভিযোজন শক্তি কাজ করে। তাই এক নির্দিষ্ট প্যাটার্নের বিস্তারণ প্রকাশ পায়। ফলে স্পষ্ট পথের সৃষ্টি হয় এবং সেই পথ দিয়ে জীবাণু বিস্তার লাভ করে। এই পথগুলো সকল প্রাণীর বিস্তারণের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। প্রাণীর বাস্তব্য মিশ্রণ ক্ষমতা (ecological valence) বিস্তারণ লাভের পন্থার কৌশল, শ্রেণী ও বর্গ এমনকি প্রাণীর গণ ও প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের শর্তের উপর নির্ভরশীল। জলজ ও স্থলচর প্রাণীর ক্ষেত্রে মৌলিক ভিন্নধর্মী প্রতিবন্ধকতা এবং এই প্রতিবন্ধকগুলো অতিক্রম করে বিস্তার লাভের ভিন্নধর্মী কৌশল বিদ্যমান। পানিচর প্রাণী-সামুদ্রিক ও মিঠাপানির প্রাণী প্রজাতির ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য।[৩]

তাই প্রাণীর যে কোনো প্রজাতির বিস্তারণ প্রধানত (ক) এর ছড়িয়ে পড়ার পন্থা ও পদ্ধতি এবং (খ) প্রাকৃতিক ও জৈবিক প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে নির্ধারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী গ্রুপের ছড়িয়ে পড়ার পন্থা ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন প্রাণী গ্রুপের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে। যেমন কিছু সংখ্যক প্রাণী সাঁতার কাটতে পারলেও

৩. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 35.

এই প্রাণীগুলোর বিস্তার জলাশয়ের অতি বিস্তৃতির সাহায্যে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে পানিচর প্রাণী স্থলভাগের অবস্থানের প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাঁধা পায়। স্থলচর প্রাণীর চলাচল উঁচু পর্বত সাহায্যে বাঁধাপ্রাপ্ত হলেও উড়ন্ত প্রাণী বন্ধুরতাজনিত বাঁধা অতি সহজে অতিক্রম করতে পারে। বস্তুতপক্ষে চলাচলের ক্ষেত্রে পাখি যে কোনো প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে সবচেয়ে কম বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। প্রতিকূল জলবায়ুর অবস্থা যেমন শীতলতা, উষ্ণতা ও জলীয় পদার্থের অভাব উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শিকারী প্রাণী বা অতি উপযুক্ত প্রতিযোগী প্রাণীর উপস্থিতি কোনো নির্দিষ্ট প্রাণী গ্রুপের চলাচল ও বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে।

ভূতাত্ত্বিক সময় অনুযায়ী প্রাণীর বিস্তারণের পথ এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার অবস্থানের পরিবর্তন ধীর গতিতে ঘটে। স্থল পৃষ্ঠের নিমজ্জন ও সমুদ্রের বিস্তার লাভ (transgressions), নতুন পর্বত শ্রেণীর উত্থান, বরফ শিটের বৃদ্ধি ও পশ্চাদপসারণ এবং এমনকি নদী পথ পরিবর্তন প্রাণীর বিস্তারকে প্রভাবিত করে। বর্তমানের স্থলভাগ ও সমুদ্রের বিন্যাস ১০ লক্ষ, ৫০ লক্ষ বা ১০ কোটি বৎসর পূর্বের বিন্যাসের অনুরূপ নয়।

৭.৫. সামুদ্রিক প্রাণিজীবন

মহাদেশ দিয়ে ভাগ করা থাকলেও সমুদ্র অবিচ্ছিন্ন পানির সাহায্যে সংযুক্ত। এই অবিচ্ছিন্ন পানিরাশির বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন নাম দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে এলাকাগুলোর স্পষ্ট সীমারেখা নেই। যেমন দক্ষিণ প্রশান্ত, দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরত্রয়ের উত্তর দিকে স্পষ্ট সীমারেখা ছাড়াই দক্ষিণাংশকে দক্ষিণ মহাসাগর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রান্তীয় সাগরগুলো পার্শ্ববর্তী মহাসাগরের অনেক বৈশিষ্ট্য বহন করলেও মহাদেশীয় সাগর যেমন ভূমধ্য, লোহিত, কৃষ্ণ এবং বাল্টিক সাগরগুলো নির্দিষ্ট সীমানার সাহায্যে বেষ্টিত এবং এই সাগরগুলোর পানির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে পৃথক। এতদসত্ত্বেও সমুদ্র পৃষ্ঠগুলোর অধিকাংশ অংশ কম-বেশি সহজে সুগম্য। তাই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁতারু প্রাণীর সমুদ্রে কোনো প্রতিবন্ধক থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সমুদ্রের পানির তাপ, লবণাক্ততার অবস্থা এবং গভীরতা ও তলদেশের চাপ সমুদ্র প্রাণীর বিস্তারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। আবার সামুদ্রিক অসাঁতারু প্রাণীর চলাচল অতি সীমিত।

সকল সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকলেও মহাদেশীয় স্থলভাগের অবস্থান সামুদ্রিক প্রাণীর চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ফলে বিভিন্ন সমুদ্রে প্রাণীর অবাধ বিস্তারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রশান্ত মহাসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর কেবল অবিচ্ছিন্ন স্থলভাগ, আমেরিকা মহাদেশদ্বয় দিয়ে পৃথক নয়, টেরা ডেল ফুয়েগো এবং গ্রাহামল্যান্ডের মধ্যবর্তী শীতল পানিসহ ড্রেক পথ দিয়েও এই দুটি মহাসাগর বিচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থিত। তাই এই মহাসমুদ্রদ্বয়ের প্রাণিকুলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের প্রাণিকূলের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ এই মহাসাগরদ্বয় ক্রান্তীয় অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়ার সাগর দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। তাই এই ক্রান্তীয় সমুদ্র এলাকা, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশের প্রাণিকুলের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। এই দুই সমুদ্রের বর্ণিত অংশের কিছু কিছু প্রান্তীয় অংশ এবং মহাদেশীয় সাগরের (marginal and continental seas) পানি ছাড়া

লবণাক্ততার তারতম্য এমন বেশি পর্যায়ে প্রকাশ পায় না যা সামুদ্রিক প্রাণীর বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে এক প্রধান বাধা হচ্ছে মহাদেশের বৃহৎ নদীর ব্যাপক ঘন আয়তনের মিঠা পানি মিশ্রিত কম লবণাক্ত সমুদ্র এলাকা। উদাহরণস্বরূপ প্যাটাগনিয়ার উপকূলের সমুদ্র-সজারু (sea urchins) রিও ডি লা প্লাটার মোহনার উত্তরে লক্ষ্য করা যায় না।

বিজ্ঞানী অ্যালি এবং স্মিড্‌তের বক্তব্যে এটি ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

স্থলভাগের প্রাণীর বিস্তারণের পদ্ধতি অপেক্ষা সামুদ্রিক প্রাণীর অতি কম সংখ্যক বিস্তারণের পদ্ধতি বিদ্যমান। পদ্ধতি পানির অভ্যন্তরে চলাচল বা পানির স্বয়ং চলাচলের উপর নির্ভরশীল। পানিতেও অনেক প্রাণী সীমিত অবস্থানভিত্তিক হয় তলদেশে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় যেমন, প্রবাল (corals), ব্রায়োজোয়ান (bryozoans), ঝিনুক অথবা অতি ধীর গতি চলাচল সম্পন্ন প্রাণী যেমন সমুদ্র অ্যানিমন (sea anemones) এবং কিছু শ্রেণীর শামুক বিরাজ করে। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী যেমন পোকামাকড় বা শামুক হামাগুড়ি দিয়ে এবং কাঁকড়া যা হেঁটে মন্থর বা দৌড় দিয়ে দ্রুতগতিতে চলে, সেগুলো সমুদ্রের তলদেশে সীমিত অবস্থানে বিদ্যমান থাকে। এই প্রাণিগুলোর মুক্ত সাঁতারু শূক পর্যায় বিদ্যমান। যেসব প্রাণী সহজে পানিতে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে বা সাঁতার কাটার বৈশিষ্ট্য বহন করে সেসব প্রাণী চলাচলের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। সাঁতার কাটার অধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট প্রাণীর কার্যকর প্রতিবন্ধক কম। অন্যদিকে ঝুলন্ত অবস্থার জীব, প্লাঙ্কটন বা শৈবালের বিস্তার পরোক্ষভাবে সমুদ্র স্রোতের উপর নির্ভরশীল। চলনশীল বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়ে অনেক সামুদ্রিক জীব বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ভাসমান কাঠ, জাহাজের কাঠামো সংযুক্ত গুগলি শামুক (Barnacles) এবং তিমি, হাঙর প্রভৃতির দেহের সাথে সংযুক্ত শোষক মাছ অনেক দূরে পরিবাহিত হয়।[৪]

৭.৬. মিঠা পানির জীব

স্থলপৃষ্ঠের জলাশয়ে মিঠা পানির জীব (Fresh water life) সাধারণত পুকুর, জলাভূমি, হ্রদ ও নদীতে বাস করে। স্থলভাগের নদী ছাড়া সকল জলাশয় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত। স্থলভাগের অভ্যন্তর হতে নদী প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। যেসব মিঠা পানির প্রাণী নদীর সাহায্যে সমুদ্রে আগমন করে এবং লবণাক্ত পানির পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা বহন করতে পারে সেসব প্রাণী অন্যান্য মিঠা পানির প্রাণী অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তাই কিছু জলজ প্রাণী যেগুলো মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানির পরিবেশ সহ্য করতে পারে সেই সকল প্রাণী লবণাক্ত পানির প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে অন্য নদীতে বিস্তার লাভ করে। এই ক্ষেত্রে স্যামন, বাইম মাছ, স্ট্যারজন (salmon, eels, sturgeon) এর নাম উল্লেখ করা যায়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যারিয়াস (arius) যেগুলো অ্যানাড্রোমাস (anadromus) বৈশিষ্ট্য বহন করে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য মিঠা পানির মাছের গণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। একই মহাদেশে পাশাপাশি অবস্থিত দুই নদী যদি দুই ভিন্ন সাগর বা মহাসাগরে পতিত হয় তাহলে এই দুই নদীর জলজ প্রাণিকুলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাইন ও দানিয়ুব নদীদ্বয়ের শীর্ষভাগের পানি এলাকার দূরত্বের ব্যবধান মাত্র কয়েক

৪. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 35.

মাইল হলেও ইউরোপীয় মহাদেশের এই দুই নদীর মৎস্যকুলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাইন নদীর স্টিকলব্যাক (sticklebacks) ও বাইম মাছ দানিয়ুব নদীতে লক্ষ্য করা যায় না। অঞ্চলটির পূর্বাংশের মাছের প্রজাতি যেগুলো দানিয়ুব নদীতে বিদ্যমান সেগুলো রাইন নদীতে দেখা যায় না। স্যামন ও স্টারজন উভয় নদীতে লক্ষ্য করা গেলেও প্রজাতির দিক দিয়ে এগুলো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে।

জলপ্রপাত ও নদীপ্রপাত অনেক ক্ষেত্রে জলজ প্রাণীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। শক্তিশালী সাঁতারু মাছ যথা স্যামন এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখলেও প্রতিবন্ধকের মাত্রার উপর এই ক্ষমতা নির্ভরশীল। যেমন রাইন নদীর প্রপাত স্যামন অতিক্রম করতে না পারার কারণে কনস্ট্যানটাইন হ্রদে (lake constantine) সেটি লক্ষ্য করা যায় না।

স্থলভাগের অভ্যন্তরের জলাশয়গুলিতে প্রাণীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মাছ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পুকুরের মাছের শূক এবং নদীর ঝিনুকজাতীয় জীব মাছের ডানায় পরজীবী হিসেবে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করলে সেসব মাছ দিয়ে এগুলো অন্যত্র পরিবাহিত হয়।

মিঠাপানির প্রাণীর পরোক্ষ বিস্তারণের সাধারণ মাধ্যম হচ্ছে পাখি এবং উড়ন্ত কীটপতঙ্গ। ডিম ও শূক সাঁতারু বা পানি অতিক্রমকারী (wading) পাখির পালক এবং অন্যান্য অঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অতিদূরে পরিবাহিত হয়ে পড়ে। পতঙ্গের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী অন্যান্য জলাশয়ে পরিবাহিত হয়। টর্নেডোর সাহায্যেও মিঠা পানির প্রাণী উত্তোলিত হয়ে দূরের জলাশয়ে পরিবাহিত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। অ্যালি এবং স্মিডথ-এর মতে এই শ্রেণীর পরোক্ষ পরিবহণ মাধ্যম অবিচ্ছিন্ন জলাশয় যেমন সমুদ্রে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থানে স্থলভাগের জলাশয়গুলোতে এই মাধ্যমগুলোর গুরুত্ব যথেষ্ট।

৭.৭. স্থলজ প্রাণী

স্থলজ প্রাণীর চলাচল ও বিস্তারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমুদ্রের বিচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থিত দ্বীপসহ স্থলভাগকে প্রধান চার, প্রাচ্যের স্থল ভাগ (the old world land mass), আমেরিকা মহাদেশদ্বয়, অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা ইউনিটে ভাগ করা যায়। সাগর মহাসাগর হচ্ছে স্থলজ প্রাণীর বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। কেবল বৃহৎ আকারের লবণাক্ত জলাশয়ই নয় অতি অপ্রশস্ত লবণাক্ত জলপৃষ্ঠও স্থলজ প্রাণীর চলাচলের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ওয়ালেস রেখা (মানচিত্র-৭.অ) যা ইন্দোনেশীয় দ্বীপসমূহের মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত প্রণালীর মধ্যের পথ নির্দেশ করে সেই পথ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার প্রাণীর মধ্যে মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। অনুরূপ প্রতিবন্ধক মোজাম্বিক প্রণালী আফ্রিকা ও মালাগাছির প্রাণিকুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে নদীসমূহ প্রাণীর চলাচলের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত নয়। কারণ এগুলো এমন প্রশস্ত নয় যেসব প্রাণীর সাঁতারের ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। নদীতে ভাসমান গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রাণীর পরিবহণ হিসেবেও কাজ করে। তদুপরি নদীর নিম্ন পর্যায়ের পানি প্রবাহের সময় অগভীর অংশ প্রাণীর চলাচলের পথ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। আবার বন্যার কারণে নদীপথ পরিবর্তনের ফলে নদীর তীরবর্তী এক এলাকা অন্য তীরের এলাকায় আদি প্রাণীসহ সংযুক্ত হয়ে ভিন্ন প্রাণিকুলের বিস্তারণে সাহায্য করে।

উচ্চ পর্বতশ্রেণী এলাকার জলবায়ুর পরিবর্তনের পরিবেশ, তাপ হ্রাস, বৃষ্টি বরফপাত বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং চাপহ্রাস প্রাণীর চলাচলকে প্রতিহত করতে পারে। হিমালয় পর্বতমালার উত্তর ও দক্ষিণ এবং আমেরিকার করডিলেরার পূর্ব ও পশ্চিম এলাকার প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যে এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। পর্বত সারির অক্ষাংশভিত্তিক বিস্তৃতি জলবায়ু অঞ্চলের সমান্তরালে জলবায়ুর পার্থক্যকে তীব্রতর করার কারণে প্রাণীর উত্তর দক্ষিণ দিকের চলাচলকে ব্যাহত করে যেমন এশিয়ার টারসিয়ারি যুগের ভাঁজ পর্বত। অন্যদিকে পর্বত সারির উত্তর দক্ষিণের বিস্তৃতির জন্য নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভের ফলে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশের প্রাণীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তারণকে সহায়তা করেছে। আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ের করডিলেরা পর্বতের উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বন প্রাণীর উত্তর-দক্ষিণের চলাচলের পথকে সুগম করেছে। এজন্য আলাস্কার পুমা প্যাটাগোনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়াও পর্বতের প্রতিবন্ধকে পাখি সর্বাপেক্ষা কম বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

জলীয় পদার্থের ঘাটতি অঞ্চল, বনানীবিহীন মরুভূমি প্রাণীর চলাচলে স্পষ্ট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। সাহারা মরুভূমি কেবল মানুষের চলাচলের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রাখেনি বরং প্রাণীরও বিস্তারণের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। প্রায় সকল প্রাণী পানির অভাবে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে না। এজন্য শুষ্ক মরু অঞ্চলে যেমন প্রাণী বাস করতে পারে না, তেমনি তা অতিক্রম করাও প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

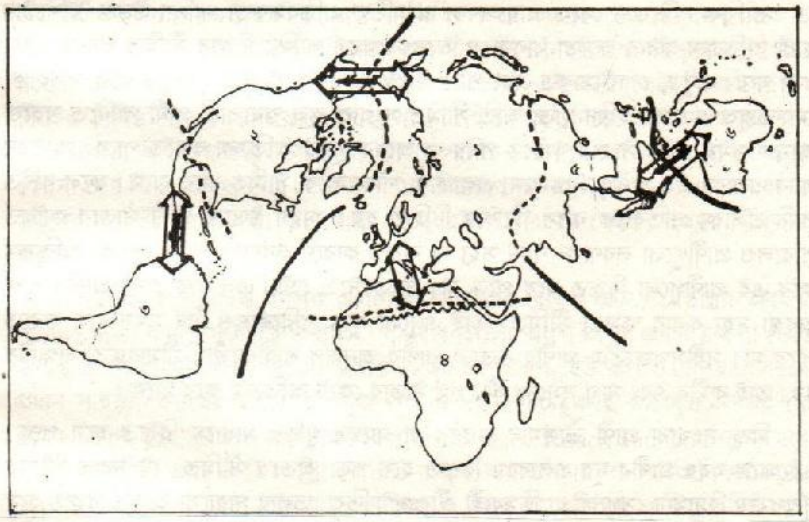

চিত্র ৭.অ : প্রাণী চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও প্রাণী অঞ্চল।

—— সামুদ্রিক প্রতিবন্ধক; - - - পার্বত্য প্রতিবন্ধক; ~~~~ মরু প্রতিবন্ধক

⇔ পরিশ্রুত পথ। চিত্রে তীরচিহ্নের সাহায্যে অধিক সংখ্যক প্রাণী চলাচলের দিক বোঝানো হয়েছে। ১. প্যালি-আর্কটিক অঞ্চল, ২. নি-আর্কটিক অঞ্চল, ৩. নিউট্রপিক্যাল অঞ্চল, ৪. ইথিওপিয়ান অঞ্চল, ৫. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল, ৬. অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল

অনেক প্রাণী নির্দিষ্ট বনানী এলাকায় বাস করে এবং প্রাণীগুলো খাদ্য হিসেবে নির্দিষ্ট বনানীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বনানীর প্রকার অনেক প্রাণীর চলাচল এবং বাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। চীনের বৃহদকায় পাণ্ডা বা ভল্লুকতুল্য প্রাণী জঙ্গলে বাস করে এবং বাঁশের অঙ্কুরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং এই প্রাণীগুলো বাঁশপ্রধান জঙ্গলে বাস করে। অস্ট্রেলীয় কোয়ালা (koala) ইউক্যালিপটাসের বনাঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই প্রাণীগুলোর খাদ্য হচ্ছে ইউক্যালিপটাসের পাতা। ইউরোপীয় ঝুঁটিবিশিষ্ট চামচিকা (European crested tit) শুধু সরলবর্গীয় গাছে বাসা বাঁধে। এজন্য এই প্রাণীগুলো স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমির সরলবর্গীয় অরণ্যে লক্ষ্য করা যায়।

প্রাণীর বিস্তারের সীমাবদ্ধতার অন্য এক নিয়ামক হচ্ছে প্রাণীগুলোর মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার কার্যক্রমের ফলাফল। ট্রিপানোসাম বাহিত সেৎসি (trypanosonic carring tsetse) মাছি আফ্রিকার গৃহপালিত খুরবিশিষ্ট পশুপালনের যথাযথ সীমানা নির্ধারিত করে রেখেছে। খাবার বা এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং আগত প্রাণীর সাথে স্থানীয় প্রাণীর দ্বন্দ্ব প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে ফেলে। কোনো এলাকায় আগত নতুন প্রাণীর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় প্রাণীর বিতাড়ন বা নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন বলা হয়। এই প্রক্রিয়া অস্ট্রেলিয়ার খরগোশ ধেড়ে ইঁদুর বা বিলবিকে (rabbit bandicoots or bilbies) বিতাড়িত করেছে। ধারণা করা হয় যে, ব্রিটিশ লাল কাঠবিড়ালী আমেরিকান ধূসর কাঠবিড়ালের আগমনের পূর্বেই পশ্চাদপসারিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় সকল প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা পাখির উড়ন্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অতিক্রম করার ক্ষমতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পাখির বিস্তার সীমিত পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। বাদুড়, পোকামাকড় এবং পাখি উড়ন্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উভচর জলহস্তি, মেরুভল্লুক ও বল্গা হরিণ ছাড়া অতি সীমিত সংখ্যক স্থল স্তন্যপায়ী প্রাণী পানিতে সহজে অনেক সময় পর্যন্ত সাঁতার কাটতে পারে বা অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সাগরের পানি এলাকা এই প্রাণীগুলোর অন্য এলাকায় পৌঁছানোকে সীমিত করে রাখে। ফলে বর্ণিত পানি এলাকা প্রতিবন্ধক বলয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। কারণ উভচর প্রাণী সাঁতার কাটতে পারলেও প্রাণীগুলো লবণাক্ত পানি সহ্য না করার কারণে লবণাক্ত পানি এলাকা অতিক্রম করে এই প্রাণীগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়ে না। স্যাঁতসেঁতে ভৌম এলাকার এসব প্রাণীর শুষ্ক অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা সীমিত। তাই এগুলো শুষ্ক পরিবেশেও দীর্ঘ সময় বাস করতে পারে না। সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর উভচর প্রাণীর অনুরূপ শারীরবৃত্তীয় সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয় নয়। তাই কুমীর এবং সাপ সমুদ্রের দীর্ঘ পথ সাঁতার কেটে অতিক্রম করে থাকে।

কিছু সংখ্যক প্রাণী ভাসমান কাঠের বা গাছের গুঁড়ির মাধ্যমে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এইক্ষেত্রে বৃহৎ প্রাণীর দূর এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়া অত্যন্ত সীমিত। যে সকল জীবের সুপ্তপর্যায় বিদ্যমান সেগুলো বা ডিমবাহী জীব প্রাকৃতিক ভেলার সাহায্যে অন্যত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

৭.৭.১. বিস্তারণের প্যাটার্ন : ভূপৃষ্ঠের প্রাণিকুলের বিশ্বজনীন এক নির্দিষ্ট প্যাটার্নের বিস্তারণ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ডারলিংটনের তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা যায়। (১) প্রাণীর প্রধান বিস্তারণ প্যাটার্ন কি? (২) কিভাবে এই প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে? এবং (৩) কেন এই শ্রেণীর

প্যাটার্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলোচনা, প্রাণীর চলাচলের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং প্রাণীর দেশান্তরের বাধা উল্লেখ করা যায়। ডারলিংটনের অভিমত, প্রাণীর ছড়িয়ে পড়া এবং বিস্তারণের প্যাটার্ন সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

৭.৭.১.১. বিস্তারণের উপ-প্যাটার্ন : প্রাণীর সামগ্রিক বিস্তারণ প্যাটার্ন কিছু সংখ্যক উপ-প্যাটার্নের জোট দিয়ে সৃষ্ট। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ভৌগোলিক কমপ্লিমেন্টারিটি (geographical complementarity)। উল্লেখ্য, কমপ্লিমেন্টারিটি বলতে ডারলিংটন সমরূপ এলাকার প্রাণীর গ্রুপগুলোর প্রতিযোগিতামূলক বাস্তব্যভিত্তিক প্রাধান্য নির্দেশ করেছেন (Complementarity was coined by Darlington to describe "dominant, ecologically equivalent, presumably competing groups of animals that occupy complementary areas")[৫] বলয়ভিত্তিক জলবায়ু ভৌগোলিক বিকীর্ণতা এবং উপযুক্ত অনুকূল এলাকায় প্রাণীর সমাবেশ দিয়ে এই প্যাটার্নগুলো নিয়ন্ত্রিত। এই উপ-প্যাটার্ন এলাকার উপরিপাত অথবা জোটের সাহায্যে অতি সরল সাধারণরূপ (generalised) এবং গড় প্যাটার্ন প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানী ডারলিংটনের মতে, বৃহত্তর অতি বিচিত্র, অতি সীমিত সংখ্যক প্রাণিকুল প্রাচ্যের প্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। এই অঞ্চল উত্তরে জলবায়ুর দিয়ে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থলভাগের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতা ও অস্ট্রেলিয়ার পৃথকায়নের প্রতিবন্ধক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।

উপ-প্যাটার্নের ব্যাপক এবং প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা। সকল স্থল এবং মিঠা পানির মেরুদণ্ডী প্রাণীর চূড়ান্ত সীমানা ও সংখ্যা যথাক্রমে উত্তরে-মেরুর দিকে এবং মহাদেশ হতে দ্বীপে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার সীমা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। সরীসৃপজাতীয় শীতল রক্তের প্রাণী শীতল পরিবেশে বাস করতে অক্ষম। এজন্য এই প্রাণীগুলোর বিস্তারণের উত্তর দিকের নির্দিষ্ট শীতল সীমারেখার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে উড্ডয়ন ক্ষমতা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার বৈশিষ্ট্যের কারণে পাখির বিস্তারণে সর্পজাতীয় প্রাণীর অনুরূপ কোনো শেষ সীমা বিদ্যমান নয়। এজন্য পাখির বিস্তারণ অনেক উত্তর ও দক্ষিণ এলাকা এবং সমুদ্রের দূরবর্তী দ্বীপে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিস্তারণের ক্ষেত্রে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়।

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ ব্যাপক এলাকার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্রম বা ডিগ্রির অবলয়ীয় (non-zonal) কমপ্লিমেন্টারিটি বিদ্যমান। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রাণীর প্রধান ক্রম বা গোত্রের উপস্থিতি কমপ্লিমেন্টারিটির দিয়েও নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপ ও এশিয়ায় বিদ্যমান প্রধান সাইপ্রিনিফরমের অর্থাৎ আঁশযুক্ত দেহ ও দন্তবিহীন মুখসহ কাঁটাযুক্ত মাছের গোত্র যেমন—কার্প, ব্রিম, রোচ ও গোল্ডফিশের (Carp, Bream, Roach and Goldfish) মধ্যের কমপ্লিমেন্টারিটি এবং এই কমপ্লিমেন্টারিটি দক্ষিণ আমেরিকায় অ-সাইপ্রিনিফরম (non cypriniform) এর মধ্যে বিদ্যমান। আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার প্রাণিকুল মিশ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মারসুপয়াল প্রাণিকুলের মধ্যে প্রাগঢ় কমপ্লিমেন্টারিটি লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার মিশ্র প্রাণিকুল ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র ডিম্বকবাহী প্রাণিকুলের (placental fauna) মধ্যেও কমপ্লিমেন্টারিটি বিদ্যমান।

৫. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 35.

সকল শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী জলবায়ুভিত্তিক বলয় আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। মাছের ক্ষেত্রে বলয়ের কমপ্লিমেন্টারিটি অত্যন্ত প্রবল। প্রায় সকল উভচর প্রাণী প্রধানত ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাস করে। অধিকাংশ সর্পজাতীয় প্রাণী এই বৈশিষ্ট্য বহন করে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক গোত্রের জীব যেমন স্থলজ পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রধান বিস্তারণের প্যাটার্ন পৃথিবীর অনেক উত্তরের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক গোত্রের মাছ এবং উভচর প্রাণী জন্মগতভাবে মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে অভিযোজিত হয়েছে। অন্যদিকে অনেক গোত্রের পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী অভিযোজিত না হয়েও এই বৈশিষ্ট্যের জলবায়ু সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সরীসৃপজাতীয় প্রাণী উত্তরের মৃদু শীতল জলবায়ু যেমন একদিকে সহ্য করতে পারেনি তেমনি অভিযোজিত হয়েও পড়েনি।

এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় এলাকা হতে চতুর্দিকে বিস্তার লাভকে প্রাণীর বিকীর্ণতা বলে অভিহিত করা হয়। ভৌগোলিক এই বিকীর্ণতা প্রাণীর উপ প্যাটার্নের অন্য এক নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভৌগোলিক বিকীর্ণতা মিঠা পানির মাছ এবং বিশেষ করে স্থলভাগে শ্লথগতির পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ডারলিংটনের মতে, প্রাচ্যের প্রতি শ্রেণীর প্রাণীর কেন্দ্র, বিশেষ করে প্রধান প্রাচীন ক্রান্তীয় অঞ্চলের কেন্দ্র ক্রান্তীয় এশিয়ার সাইপ্রিনিফরম মাছ; প্রাচীন র‍্যানিড ব্যাঙ ; সম্ভবত ক্রান্তীয় এশিয়ার উন্নত কোলিউব্রিড সাপ (avanced colubrid snakes) ; প্রাচ্যের সমগ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের গায়ক পাখি এবং এশিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণতর এলাকার মিউরিডজাতীয় তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রাণী (murid rodents) যেমন, ইঁদুর ও বোভাইড (bovides) উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

প্রতিটি মহাদেশে প্রাণিকুলের পৃথকায়নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানী ডারলিংটনের মতে, মিঠা পানির মাছের ক্ষেত্রে প্রধান প্যাটার্ণে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আফ্রিকায় টিকে থাকা প্রাচীন ক্রান্তীয় প্রাণীর গোত্র, ইউরেশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারকারী বর্তমানের সাইপ্রিনিফরম উত্তর আমেরিকায় টিকে থাকা প্রাচীন বা পুরাতন উত্তরের নাতিশীতোষ্ণ প্রাণী গোত্র ; দক্ষিণ আমেরিকার বিক্ষিপ্ত বিবর্তনমূলক প্রাণী গোত্র এবং টিকে থাকা এক অতি প্রাচীন গোত্রের প্রাণিসহ লবণাক্ত পানি সহ্যকারী প্রাণীর অস্ট্রেলিয়ার সমাবেশ প্রাণীর বিকীর্ণতা নির্দেশ করে।

প্রাচীনকালীন ক্রান্তীয় অঞ্চলে স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের মধ্যে একই প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। এইক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, প্রাণীর উত্তরদিকে প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পায়। দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় এই স্পষ্ট পৃথকায়ন প্রকাশ পেলেও অস্ট্রেলিয়ায় তা অতি ব্যাপক আকারে ফুটে উঠে।

প্রতিটি মহাদেশে অতি অনুকূল এলাকায় সমাবেশের এই প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। এই প্যাটার্ণ হতে প্রতিকূল এলাকা যেমন প্রান্তদেশে প্রাণিকুল গোত্রের বিয়োজন ঘটে। এই প্যাটার্ন মিঠাপানির মাছের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিবর্তনমূলক জীবের ক্ষেত্রে তা ততো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, এই প্রাণীগুলো অধিক সংখ্যায় প্রয়োজনীয় অতি বড় এলাকা ও অনুকূল পরিবেশে বিদ্যমান।

উপরের আলোচনা হতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রাণিকুলের উপ-প্যাটার্ন নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক করা যায় :

(ক) মহাদেশের মেরুর দিকে ও মহাদেশ হতে বাইরের দিকে প্রাণিকুলের সীমিত সংখ্যা ; (খ) অবলয়ীয় ভৌগোলিক কমপ্লিমেন্টারিটির ফলাফলের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রধান (dominant) গ্রুপের প্রাণীর উপর প্রভাব, (গ) জলবায়ুর প্রভাবের বলয় (এটি উত্তরে প্রাণীর বিয়োজন ঘটায়) ; (ঘ) প্রাচীনকালীন স্থলভাগের ক্রান্তীয় অঞ্চলের সকল শ্রেণীর প্রাণীর ভৌগোলিক বিকীর্ণতা ; (ঙ) প্রতি মহাদেশ এলাকার প্রাণিকুলের পৃথকায়ন এবং (চ) প্রতি মহাদেশের অনুকূল পরিবেশে প্রতি শ্রেণীর প্রাণীর সমাবেশ এবং ক্রান্তীয় প্রতিকূল এলাকায় প্রাণীগুলোর বিয়োজন প্রাণিকুলের উপ-প্যাটার্নের সৃষ্টি করেছে। এই উপ-প্যাটার্নগুলোর পুঞ্জিত চিত্র প্রাণীর বিস্তারণের সাধারণ, পূর্ণাঙ্গ (যদিও অত্যন্ত জটিল) প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে।

৭.৭.২. প্যাটার্ন গঠন : বিজ্ঞানী ডারলিংটনের যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পায় যে, প্রাচীনকালীন ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রাণী গ্রুপের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই প্রাথমিক বিস্তারণ পরে জলবায়ুর অবস্থা ও বিভিন্ন প্রধান অঞ্চলের পৃথকায়নসহ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে প্রাণীর বলয় সৃষ্টি লাভ করেছে। পরিশেষে প্রাণীর বিলুপ্তি পশ্চাদপসারণ এবং নতুন ও অতি শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর গ্রুপ দিয়ে প্রাচীন প্রাণী গ্রুপের অপসারণের নিয়ামকসমূহের সাহায্যে প্রাণিকুলের বিস্তারণের প্রধান প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে। এই প্যাটার্ন পরবর্তী পর্যায়ের প্রাণীর চলাচলের সাহায্যে বর্ণিত প্রধান প্যাটার্ন অতি জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে (মানচিত্র ৭.অ)।

প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও চলাচল (Evolution and movement) এবং বর্তমান ভূ-প্রাণী অঞ্চলের প্যাটার্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক) পৃথিবীর বৃহৎ ও অতি উপযুক্ত এলাকায় প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বপূর্ণ প্রাণী-গ্রুপ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

খ) মেরুদণ্ডী প্রাণীর ছড়িয়ে পড়ার প্রধান প্যাটার্ন হচ্ছে বৃহৎ এলাকা হতে ক্ষুদ্র এলাকা এবং অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত এলাকা হতে কম উপযুক্ত এলাকা। ফলে প্রাণীর পর্যায়ক্রমিক স্থানান্তর ঘটেছে।

গ) প্রাণীর চলাচল তিন প্রকার পথ দিয়ে—(১) উত্তরের ক্রান্তীয় এলাকা হতে দক্ষিণ আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় ; (২) ক্রান্তীয় এশিয়া হতে অস্ট্রেলিয়ায় ; (৩) প্রাচীনকালে ক্রান্তীয় এলাকা হতে উত্তর আমেরিকায় এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকায় সংঘটিত হয়েছে।

ঘ) প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার অনুরূপ নিয়ামক প্রাচীন প্রাণিকুলকে রক্ষা করেছে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। নচেৎ এই প্রাণীগুলো প্রভাবশালী প্রাণীর ধারাবাহিক আগমনের পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়তো।

ঙ) প্রভাবশালী গ্রুপের প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিস্তার প্রাচীন গ্রুপের প্রাণীকে অসহায় অবস্থায় আনে (overwhelm) এবং স্থানচ্যুত করে। যদিও এই স্থানচ্যুতি সবসময় প্রাথমিক বিস্তারণের কেন্দ্র হতে বহির্দিকে সংঘটিত হয়নি। সুতরাং বহির্প্রান্তে অবিরত বিস্তারণ প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটেছে।

চ) মহিসঞ্চারণ মতবাদ (Theory of continental drift)—প্রাণীর বিস্তারণের অনেক সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে সরল এবং উপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করলেও মতবাদটি উপরে বর্ণিত নিয়ামকগুলোর ক্ষেত্রে সংযুক্ত বলে চিহ্নিত নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী ও বলয় আকারের জলবায়ুর (zonal climate) অতি সাধারণ মিল লক্ষ্য করা গেলেও জলবায়ুর কোনো শ্রেণিবিভাজন প্রাণীর বিস্তারণ দিয়ে উপস্থাপিত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, প্রাণিবিদ্যাবিদ বা প্রাণী-ভূগোলবিদগণের প্রচলিত প্রাণী অঞ্চলের প্রচলিত সীমা জলবায়ু ও বনানী অঞ্চলের সাধারণ সীমা অতিক্রম করে বিস্তারলাভ করে রয়েছে।

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান যে, প্রাণী অঞ্চলের সাথে জলবায়ু ও বনানী অঞ্চলের সহ সম্বন্ধ বিদ্যমান নয়। ভূ-পৃষ্ঠের এক নির্দিষ্ট অংশ যেখানে নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রাণিকুল বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর সমাবেশ প্রকাশ পায় এবং অন্য এলাকার প্রাণিকুল হতে এই এলাকায় প্রাণীর পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ভূ-পৃষ্ঠের সেই অংশকে ভূ-প্রাণী অঞ্চল বলে। সংক্ষেপে বলা যায়, নির্দিষ্ট স্বৈশিষ্ট্যের প্রাণী প্রজাতির সমাবেশ এলাকা হচ্ছে ভূ-প্রাণী অঞ্চল।

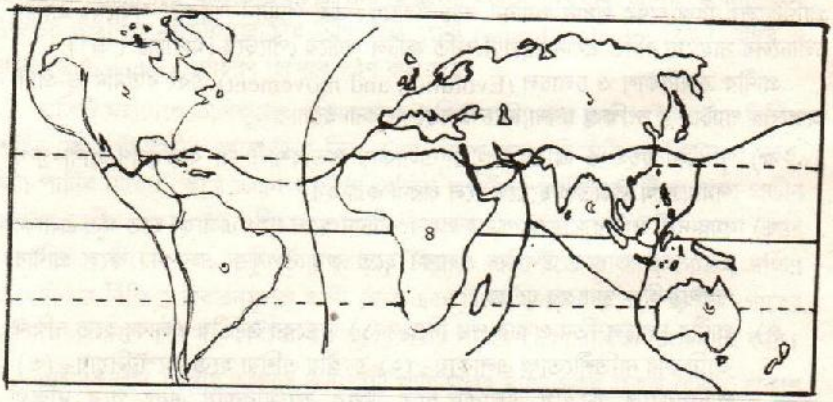

মানচিত্র ৭.আ : জীব ভৌগোলিক রাজ্য বা অঞ্চল। ১. প্যালিআর্কটিক, ২. নি-আর্কটিক, ৩. নিউট্রপিক্যাল, ৪. ইথিওপিয়ান, ৫. অরিয়েন্টাল, ৬. অস্ট্রেলিয়ান

ভূ-প্রাণী অঞ্চল মোটামুটি (very roughly) মহাদেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রে অঞ্চলগুলো মহাদেশের গতানুগতিক সীমাকে অতিক্রম করে প্রকাশ পায় অথবা মহাদেশের আয়তন অপেক্ষা সীমিত এলাকা নির্দেশ করে। এই ভূ-প্রাণী অঞ্চল-সীমার পার্থক্য অতীতের জলবায়ু ও স্থলভাগের বিন্যাসের ফলে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূ-প্রাণী অঞ্চলের প্রাণিকুলের পার্থক্য বর্তমান ও অতীতের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে সৃষ্ট। জলবায়ুর প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের

জলবায়ুর পার্থক্য এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা–পাহাড় পর্বত, বৃহৎ জলাশয় ও মরুভূমি নির্দেশ করে। এই প্রতিবন্ধকগুলো অঞ্চলভেদে প্রাণিকুলকে পৃথক করে রেখেছে।

বিজ্ঞানী পি.এল. স্ক্ল্যাটার ১৮৫৭ সালে পৃথিবীকে প্রথম ভূ-প্রাণী অঞ্চলে বিভক্ত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাখির উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর ৬টি অঞ্চল উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে চার্লস ডারউইনসহ (প্রাণীর ক্রমবিকাশ তত্ত্বের প্রবক্তা) এ.আর. ওয়ালেস পাখির আঞ্চলিক বিস্তারণের প্রায় অনুরূপ স্থলজ প্রাণীর বিস্তারণ লক্ষ্য করেন এবং ১৮৭৬ সালে স্ক্ল্যাটারের শ্রেণিবিভাগের সামান্য পরিবর্তন করে ভূ-প্রাণী অঞ্চল প্রকাশ করেন। এই ভূ-প্রাণী অঞ্চলগুলো নিম্নরূপ (মানচিত্র ৭.আ)

(১) প্যালিআর্কটিক অঞ্চল : এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হচ্ছে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশ ছাড়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশ।

(২) নিআর্কটিক অঞ্চলের মধ্যে উত্তর আমেরিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত।

(৩) নিউট্রপিক্যাল অঞ্চল : এই অঞ্চল সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় আমেরিকা নিয়ে গঠিত।

(৪) ইথিয়পীয় অঞ্চল : সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের সমগ্র আফ্রিকা এবং সংলগ্ন মালাগাছি (মাদাগাস্কার) এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৫) অরিয়েন্টাল (স্ক্ল্যাটারের ভারত) অঞ্চল : এই অঞ্চলের আওতাধীন এলাকা হচ্ছে বেলুচিস্তান হতে মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ) পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার অংশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাংশের কয়েকটি দ্বীপ।

(৬) অস্ট্রেলীয় অঞ্চল : এই অঞ্চল অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড (নিউগিনি) এবং ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাংশের দ্বীপগুলো নিয়ে গঠিত।

পরবর্তীকালে কিছু কিছু ভিন্ন ভূ-প্রাণী অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগের স্কিম উপস্থাপন করা হলেও সেগুলো সন্তোষজনক বা গ্রহণযোগ্য হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর স্ক্ল্যাটার-ওয়ালেসের শ্রেণিবিভাগকে বাস্তব সম্মত ও ব্যবহারোপযোগী বলে গণ্য করা হয় এবং এই শ্রেণী বিভাগের কিছু পরিবর্তন করে বর্তমানের ভূ-প্রাণী ভৌগোলিক বিভাগ (zoogeo-graphical division) উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

ওয়ালেসের ছয় সংখ্যার প্রাণী অঞ্চল বিভাগের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অঞ্চলগুলোর প্রাণীর সমাবেশের ডিগ্রি বা মানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাণিবিদ্যাগত জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে এটা পরিষ্কার যে, বর্ণিত শ্রেণিবিভাগের কিছু কিছু অঞ্চল প্রাণী সমাবেশ এবং গোত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য অঞ্চল হতে স্পষ্ট পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সুতরাং প্রাণিবিদগণ এই বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভূ-প্রাণী অঞ্চলের ক্রমোচ্চমান রক্ষা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। ফলে বর্ণিত ছয়টি প্রধান প্রাণী অঞ্চলের মধ্যে পরিষ্কার সম্বন্ধ প্রকাশ পাবে।

বিজ্ঞানী হেলপ্রিন ১৮৮৭ সালে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যেহেতু প্যালিআর্কটিক ও নিআর্কটিক অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে প্রাণিবিদ্যাগত অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষ্য করা যায় সেহেতু

এই দুই অঞ্চলকে পৃথক মর্যাদা দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই তিনি এই দুই অঞ্চলকে একত্রে হোলার্কটিক (holartic) নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক এই যুক্তি গ্রহণ করে প্রধান অঞ্চল হোলার্কটিকের আওতাধীনের উপ-অঞ্চল হিসেবে প্যালিআর্কটিক ও নিআর্কটিকে গ্রহণ করেছেন। নিউট্রপিক্যাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলদ্বয় এবং অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য এত ব্যাপক ও প্রাণিবিদ্যাগত দিক দিয়ে এত স্পষ্ট যে, এই দুটিকে পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে বৈজ্ঞানিকগণ মত পোষণ করেন। এই অঞ্চল আবার একে অপরটি হতে প্রাণীর প্রকৃতি ও সমাবেশের দিক দিয়ে স্পষ্টত ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্য নিআর্কটিক এবং প্রাচ্যের অন্য তিনটি অঞ্চলের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্যের সাথে এই দুই অঞ্চল পৃথকভাবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ হতে উপবিভাগসহ ভূ-প্রাণী অঞ্চলগুলো নিম্নরূপ (মানচিত্র ৭.ই)।

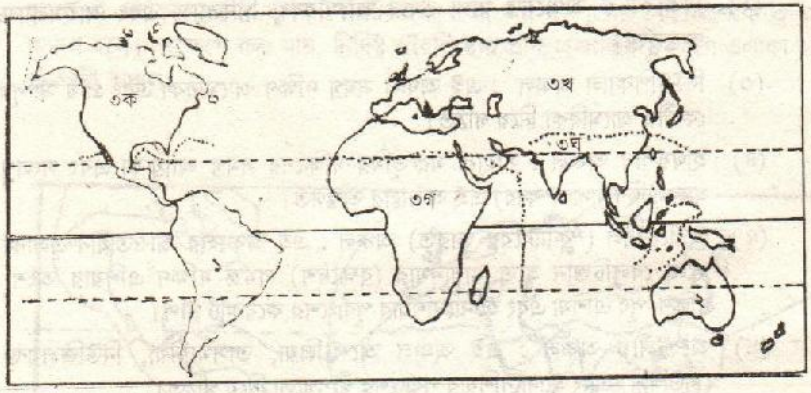

মানচিত্র ৭.ই : ভূ-প্রাণী 'রিলম' এবং 'রিজিয়ন'। ... ... সীমারেখা : ১. নিউট্রপিক্যাল (নিউগি ; ২. অস্ট্রেলিয়ান (নটোগি) ; ৩.ক-নিয়ার্টিক, খ. প্যালিয়ার্টিক , গ. ইথিওপিয়ান, ঘ. অরিয়েন্টাল।

১. নিওগি (নিওট্রপিক্যাল) {Neogea (Neotropical)}

২. নটোগি (অস্ট্রেলিয়ান) {Notogea (Australian)}

৩. আর্কটোগি (Arctogea)

ক) নিআর্কটিক (Nearctic)

খ) প্যালিআর্কটিক (Palearctic)

গ) ইথিওপিয়ান (Ethiopian)

ঘ) ওরিয়েন্টাল (Oriental)

উপরের বর্ণিত সকল তথ্যের ভিত্তিতে ভূ প্রাণী অঞ্চলগুলো আবার নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ক্রমোচ্চমানে উপস্থাপন করা যায়। উপ-বিভাগসহ এই তিন ভূ-প্রাণী রেলম (realm) বর্তমানে প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

১. আর্কটোগি (উত্তরাঞ্চলীয় স্থলভাগ) (Arctogea Northern Land)
   ক) হলোআর্কটিক (Holarctic)
      অ. পূর্বদেশীয় বা প্যালিআর্কটিক (East Palearctic)
      আ. পশ্চিম দেশীয় বা নিআর্কটিক (West Nearctic)
   খ. ইথিওপিয়ান (Ethiopian)
   গ. প্রাচ্য জগতীয় (Oriental)
২. নিউগি বা নতুন জগৎ (Neogea New land)
৩. নটোগি বা দক্ষিণ জগৎ (Notogea Southern land)
   ক. অস্ট্রেলীয় (Australian)
   খ. পলিনেশীয়-হাওয়াইয়ান (Polynesian-Howiian)

৭.৮. আর্কটোগি রেলম

উত্তরাঞ্চলীয় স্থলভাগ (Arctogea), প্রায় কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরের উত্তরাংশীয় উত্তর আমেরিকা ও গ্রিনল্যান্ড ; প্রাচ্যেরও কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরের স্থলভাগ (উল্লেখ্য যে, এই অংশ প্যালিআর্কটিক অর্থাৎ পূর্ব হলোআর্কটিক অঞ্চল নামেও পরিচিত এবং ওরিয়েন্টাল ও ইথিওপিয়ান অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই ব্যাপক ভূ-প্রাণি রেলম-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তর আমেরিকার অপোসাম-এর মারসুপিয়াল ছাড়া মনোস্ট্রিমের অনুপস্থিতি বর্ণিত দুই স্তন্যপায়ী জীবের উপশ্রেণীর (মনোস্ট্রীম ও মারসুপিয়াল) স্তন্যপায়ী জীবের তৃতীয় উপশ্রেণী প্লাসেনটাল হতে প্রাচীন। এগুলো অর্থাৎ মারসুপিয়াল ও মনোস্ট্রিম সম্ভবত শেষেরটি বেশি চতুর ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্লাসেনটাল সম্ভবত স্তন্যপায়ী প্রাণীর পাশ কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলীয় রেলমের সাথে তুলনা করলে ব্যাপক আর্কটোগি রেলমের প্রাণীসমূহের (এবং উদ্ভিদসমূহও) মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য প্রকাশ পায়, যদিও এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে জলবায়ু ও ভূমিরূপের প্রকট পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যাপক এলাকাকে আর্কটোগি রেলমে অন্তর্ভুক্ত করার অন্য এক যুক্তি হচ্ছে যে, এই অঞ্চলের প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী কর্কট ক্রান্তিরেখার উত্তরের স্থলভাগে সৃষ্ট আদি প্রাণীর বংশধর (descendants) হিসেবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। নিউবিগিনের মতে, স্থলভাগের বর্তমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সকল প্লাসেনটাল স্তন্যপায়ী প্রাণী উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগে উৎপত্তি লাভকারী প্রাচীন প্রাণীর বংশধর বা প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যান্য জীবন্ত বস্তুর অনুরূপ—এগুলো উৎপত্তিস্থল হতে তরঙ্গ আকারে অন্য এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে। দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশে এগুলোর বিস্তারণ প্রবেশ পথের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর ক্রমবিকাশের সময় আর্কটোজোয়া রেলমের স্থলভাগগুলো প্রাণীর প্রবেশ পথ স্থল ব্রিজ দিয়ে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিরাজমান ছিল। এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা বর্তমানের বেরিং প্রণালীর স্থল ব্রিজ দিয়ে এবং ইউরেশিয়া শুধু সিনাই উপদ্বীপ দিয়ে নয় বরং জিব্রালটার

প্রণালীর স্থলব্রিজ দিয়ে সংযুক্ত ছিল। আরও ধারণা করা হয় যে, সেই সময় আফ্রো-ইউরেশিয়ান বৃহৎ মরুভূমি ছিল না যেগুলো বর্তমানে প্রাণী চলাচলের বাধা হিসেবে কাজ করে।

আর্কটোগি রেলমের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উন্নততম স্তন্যপায়ী জীব, অত্যন্ত উন্নত বৈশিষ্ট্যের পাখি ও খুরবিশিষ্ট পশু এবং অতি উন্নত পর্যায়ের প্রাইমেট (Highest mammals and the most specialised birds, the specialised ungulates, or hooved animals, which are particularly well represented, and the most advanced primates)।[১] নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয় যে, আর্কটোগীয় রেলমে প্রাচীন প্রাণী যেমন প্রাচীন সরীসৃপজাতীয় প্রাণিসমূহ ক্রমবিকাশের সময় অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর সাথে প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য কারণে টিকে থাকতে পারেনি বলে একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া (আমেরিকার অপসাম-এর মারসুপিয়াল) এই রেলমে প্রাচীন প্রাণী লক্ষ্য করা যায় না।

আর্কটোগিয়ান রেলমের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী অঞ্চল গঠিত হওয়ার কারণ হচ্ছে ভূ-তত্ত্বীয় অতি সাম্প্রতিক প্লিসটোসিন যুগের হিমক্রিয়ার (glaciation) ঘটনা, বিশেষ করে ভূত্বক আলোড়ন বা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে স্থলব্রিজের বিলুপ্তি এবং উত্তর আফ্রিকা ও কেন্দ্রীয় এশিয়ায় মরুভূমির উৎপত্তি।

৭.৮.১. হলোআর্কটিক অঞ্চল : সমগ্র ইউরোপ, কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরের আফ্রিকার অংশ, হিমালয় পর্বত শ্রেণীর উত্তরাংশের এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা হলোআর্কটিক অঞ্চলের অন্তর্গত। অতি উন্নত বৈশিষ্ট্যের ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী এই রেলমের প্রধান প্রাণী। প্লিসটোসিন বরফযুগ অবসান পরবর্তী সময়ের ভৌগোলিক অবস্থা অঞ্চলটির প্রাণিসমূহকে একত্রে আনয়ন করে। এই অঞ্চলে কোনো মনোস্ট্রিম, মারসুপিয়াল, দন্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী (প্লাসেনটালের পূর্বের বংশধর) এবং কোনো প্রাইমেট অর্থাৎ কেবল মানুষ এবং উত্তর আফ্রিকা ও জিব্রালটারের উল্লুক ছাড়া লক্ষ্য করা যায় না। প্রাণী জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে হলোআর্কটিক, পূর্ব প্যালিআর্কটিক এবং পশ্চিম অর্থাৎ নিআর্কটিক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্যালিআর্কটিক উপঅঞ্চল সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, আরবের উত্তরাংশ, সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং হিমালয় ও সিংলিসান পর্বতের উত্তর এশিয়ার সমগ্র এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই উপঅঞ্চল নিআর্কটিক অঞ্চল হতে জলাশয় দিয়ে পৃথক। কিন্তু ইথিওপীয় ও অরিয়েন্টাল উপঅঞ্চলদ্বয়ের সাথে তা স্থলভাগ দ্বারা সংযুক্ত হলেও ব্যাপক মরুভূমি এবং পার্বত্য বলয় এই উপঅঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে। প্যালিআর্কটিক এবং নিআর্কটিক উপঅঞ্চলদ্বয়ের প্রাণিকুলের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ থাকার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, ইউরেশিয়ার সাথে উত্তর আমেরিকা এক বা দুটি স্থল ব্রিজের সাহায্যে সংযুক্ত ছিল। আর এই সংযোগ পথের মাধ্যমে ইউরেশিয়া হতে উত্তর আমেরিকা এবং তদ্বিপরীতভাবে প্রাণী স্বাধীনভাবে চলাচল করার ফলে এ সাদৃশ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। অগভীর বেরিং প্রণালী সম্ভবত সবিরাম স্থল ব্রিজ হিসেবে বিরাজ করত এবং এখনও সময় সময় বরফ জমার ফলে সাইবেরিয়া ও আলাস্কার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

১. Robinson, H. (1972) : Beogeography, p. 395.

নয়। তুলনামূলকভাবে লেজসহ বহুসংখ্যক উভচর প্রাণী এবং লেজবিহীন উভচর প্রাণী যেমন ব্যাঙ ও টোড ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

মাছের ক্ষেত্রে কার্প গোত্র এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকলেও এগুলো শুধু প্যালিআর্কটিক উপ-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকায় লক্ষ্য করা যায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ বিশেষে খামার আকারে এই সকল মাছের চাষ করা হচ্ছে। এই উপঅঞ্চলের মিঠা পানির বানমাছ (Pike), পার্চ (Perch), স্যামন (Salmon) এবং স্টিকলব্যাক (Stickleback) প্রধান।

উপ-অঞ্চলটির ব্যাপক পরিসরের অক্ষাংশের বিস্তৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জলবায়ু, ভিন্ন শ্রেণীর বনানী সৃষ্টি করেছে। ফলে প্রাণিকুলের ভিন্ন পরিবেশ এবং অনেক বায়োমের সৃষ্টি হয়েছে। ইউরেশিয়ার উত্তর প্রান্তে তুন্দ্রা অঞ্চলের কম উচ্চতা এবং ধীরগতির ক্রমবিকাশের বনানী যেমন শেওলা, পুষ্পাল ছত্রাক বা লাইকেন এবং হোগলাসহ বিক্ষিপ্ত লতা ও খর্বাকৃতি গুল্ম এলাকায় বল্গা হরিণ, আর্কটিক শৃগাল, আর্কটিক খরগোশ, মেরু ভল্লুক, সীল ও সিন্ধুঘোটক (reindeer, arctic fox, arctic hare, polar bear, seal and walrus) এর চলাচলের বা যাতায়াতের এলাকা সৃষ্টি করেছে। সরলবর্গীয় অরণ্যে আমেরিকান চমরীগাই, বনবিড়ালজাতীয় প্রাণী ও নেকড়ে বাঘ এবং পশম বহনকারী অনেক প্রাণী বাস করে। পাতাঝরা অরণ্য এলাকায় পূর্বে বেশি সংখ্যায় ভল্লুক, বরাহ, হরিণ, শিয়াল, কাঠবিড়াল (squirrel), কাঁটাচুয়া এবং মৃত্তিকা খননকারী অনেক প্রাণীর বাসস্থান ছিল। বর্তমানে অরণ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে প্রাণীর সংখ্যাও অনুরূপভাবে কমে গেছে। স্টেপ এবং উপমরু অঞ্চলে উদ্ভিদভোজী প্রাণী যেমন—বনগাধা, ঘোড়া, উট, বিভিন্ন শ্রেণীর মেষ, ছাগল, কৃষ্ণসার মৃগ, গজলা হরিণ, শৃগাল ও কোরজাক শিয়াল (corsac fox), ইউরোপীয় ভূ-কাঠবিড়াল এবং এশীয় জারবোয়া বাস করে। তিব্বত মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের তুষার রেখার সন্নিকটে কৃষবর্ণের বন্য ইয়াক বা তিব্বতীয় ষাঁড় লক্ষ্য করা যায়। ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন উদ্ভিদভূমি ও ঝোপ-ঝাড়ের সংক্রমণগত প্রাণিকুল-এলাকা-ইকোটনের সৃষ্টি করেছে। এখানে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাণীর মিশ্রণ ঘটেছে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত ক্রমান্বয়ে মরুভূমির সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে এবং এই এলাকায় কিছু সংখ্যক চারণশীল প্রাণীসহ অন্যান্য জীব যেমন বালি ইঁদুর, জারবোয়া, সরীসৃপজাতীয় প্রাণী, ঈগল এবং বাজ পাখির (sand rat, jarboas, reptiles, eagles and hawk) আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

নিআর্কটিক অঞ্চল অলিউশান দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকা ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে গঠিত। এটা তুষার মুকুট ও তুন্দ্রা এবং অরণ্য ও তৃণভূমির সমন্বয়ে গঠিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্যালিআর্কটিক উপঅঞ্চলের উত্তরাংশের জলবায়ু ও বনানীর অনুরূপ। প্যালিআর্কটিক এলাকার অনুরূপ নিআর্কটিক উপঅঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক সাদৃশ্যপূর্ণ ভূ-স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবিচ্ছিন্ন বিস্তারণ লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিউবিগিনের বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। তিনি লিখেছেন যে, মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে আমেরিকার বনবিড়ালের সাথে ইউরোপীয় বনবিড়ালের নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, আর্কটিক শিয়াল, বাদামি বর্ণের ভল্লুক, মেরু ভল্লুক, পাইন নেউল (pine marten), নেউল বা বেজি (weasel), উলভারেন অর্থাৎ আমেরিকার অতিভোজী প্রাণী প্রভৃতি উভয় উপঅঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। খুরবিশিষ্ট প্রাণী যেমন— ইউরেশিয়ার বল্গা হরিণের সাথে আর্কটিক আমেরিকার ক্যারিবু (Caribou-

আমেরিকার হরিণ বিশেষ), আমেরিকার বাইসনের (bison) সাথে ইউরোপীয় বাইসন, কেন্দ্রীয় এশিয়ার এক প্রজাতির হরিণের সাথে ওপাটি (wapati or Red deer) এবং ইউরোপীয় এলকের সাথে কানাডার মুজ এল্কের (mose elx) সাদৃশ্য বা প্রায় সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় উপঅঞ্চলে তীক্ষ্ণ দন্ত প্রাণীর মধ্যে বিভার (Beaver), সুমেরু মুষিক খরগোশ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। মুষিকজাতীয় পতঙ্গভুক ক্ষুদ্র প্রাণী উভয় উপ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এক প্রজাতির ছুঁচো মুষিক (mole shrews) জাপান এবং অন্য এক প্রজাতির ছুঁচা মুষিক উত্তর আমেরিকায় লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। গন্ধগকুল, কাঁটাচুয়া, হায়েনা অথবা শুকর নিআর্কটিক উপঅঞ্চলে যেমন বাস করে না, তেমনি আমেরিকার প্রাণী–ভোঁদড় এবং ভল্লুক ইউরেশিয়ায় লক্ষ্য করা যায় না।

ঘোড়া ও উটের ক্ষেত্রে প্রাণিবিদ্যাগত দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সম্ভবত ঘোড়ার বংশানুক্রমিক বা উদ্ধংশীয় (Ancestral) উৎপত্তির আবাসস্থল ছিল উত্তর আমেরিকা। সম্ভবত প্রথম প্রজাতির ঘোড়া ইউহিপাস (Eohippus) এখানেই উৎপত্তি লাভ করেছিল। এই এলাকা হতে বেশ কয়েকবার কিছু সংখ্যক ঘোড়ার দেশান্তর দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রাচীন জগতে ঘটে। ইউরোপে এগুলো বন্য ঘোড়া, জেওয়ালস্কি (przewalskis) ও তর্পন (tarpan) এবং পরে এগুলো বন্য গাধা ও জেব্রায় পরিণত হয়। কিন্তু আমেরিকাদ্বয়ে সকল ঘোড়ার মৃত্যু ঘটে। আধুনিক যুগে স্পেনের লোকেরা (spaniards) ঘোড়াকে আমেরিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। উত্তর আমেরিকার উত্তরের এলাকা ঘোড়ার অনুরূপ উটের উৎপত্তিস্থল হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন প্রজাতির উট প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এখানে প্রাপ্ত দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র ঘাড়বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেহের কুঁজ ও কুঁজবিহীন উটের জীবাশ্মের প্রাচুর্য বর্ণিত তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই উৎপত্তিস্থল হতে সম্ভবত দুই দিকে, একটি এশিয়ায়, বর্তমানের উটে আমেরিকার লামা প্রজাতিতে (লামা, আলপাকা, গুয়ানাকো, ভিকুনা—Lama, alpaca, guanaoco vicuna পরিণত হয়। ঘোড়ার অনুরূপ এখনকার এই উটও সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায়।

উত্তর আমেরিকার মিশোরী–ওহিও নদী–সীমার দ্বারা নিউবিগিন সম্ভবত এই নিআর্কটিক উপঅঞ্চলকে দুইভাগে বিভক্ত করে দক্ষিণ অংশকে সনোরীয় অঞ্চল হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ এই দক্ষিণ অংশের প্রাণিকুল নাতিশীতোষ্ণ ইউরেশিয়ার উত্তর অংশের প্রাণিকুল প্রাণিকুলের সাথে সাদৃশ্য বহন করলেও প্রাণীগুলোর উত্তরাংশের প্রাণীর সাথে তেমন সাদৃশ্য বহন করে না এবং হলাআর্কটিক অঞ্চলের কোনো অংশের প্রাণিকুলের সাথেও এগুলোর মিল লক্ষণীয় নয়। কিন্তু নিউবিগিনের সনোরীয় অঞ্চলের প্রাণিকুলের সাথে দক্ষিণ আমেরিকার নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলের প্রাণিকুলের সাথে মিল প্রকাশ পায়।

সম্ভবত প্লিস্টোসিন্ যুগের শেষে বরফ পশ্চাদপসারণের পর উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশে বরফ যুগ পূর্বের দক্ষিণ আমেরিকায় আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু প্রাণী এখানে এসে পুনরায় বসবাস আরম্ভ করে এবং টিকে থাকে। এই এলাকায় আরমেডিল্লো, ওপোসাম ও পেক্কারি (Armadillo opossum and peccary) নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিদ্যমান। বরফসিটের অগ্রসর পূর্ব সময়ে সনোরীয় অঞ্চল প্রাণিকুলের আশ্রয়স্থল এবং পরবর্তীকালে পলায়ন পথ হিসেবে কাজ করেছে। উত্তর আমেরিকায় প্রাণীর চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো

অনুপ্রস্থ প্রতিবন্ধক (transverse barrier) না থাকায় অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে প্রাণী আবার উত্তরে অগ্রসর হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিউবিগিন সনোরীয় অঞ্চলকে পৃথকভাবে গ্রহণ করেন। কারণ অঞ্চলটিতে প্রাক্‌বরফ যুগ এবং বরফ যুগোত্তর প্রাণিকুলের মিশ্রণ প্রকাশ পায়। অনেকে আবার এলাকাটিকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত না করে হলাআর্কটিক ও নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলের মধ্যবর্তী ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (transitional region) হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সনোরীয় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের অনুরূপ অঞ্চল প্রাচীন জগতে লক্ষণীয় নয়, যদিও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় প্রাণীর কিছু সংক্রমণ প্রকাশ পায়।

হলোআর্কটিক অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম উপঅঞ্চলের মধ্যে প্রাণিকুলের পার্থক্য প্রথমত টারসিয়ারি যুগে এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী মাঝে মধ্যের স্থল-সংযোগের মাধ্যমে (Intermittent land connection) দেশান্তরিত প্রাণিগুলির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মিশ্রণ ঘটেনি। দ্বিতীয়ত প্যালেআর্কটিক উপঅঞ্চলের ব্যাপক এলাকার ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ আমেরিকার প্রজাতির প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট বাসস্থানে ক্রমবিকাশে সহায়তা করেছে যদিও এই আদি বাসভূমির প্রাণীগুলো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তৃতীয়ত হিমযুগোত্তরকালে পশ্চিম হলোআর্কটিক অঞ্চলের অনুরূপ প্রাচীন প্রাণীসমূহ পূর্ব উপঅঞ্চলে ফিলে আসেনি।

৭.৮.২. ইথিপিয়ান অঞ্চল : আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি ইথিওপিয়ান এবং হলোআর্কটিক অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে সীমাঞ্চল (frontier zone) সৃষ্টি করেছে। সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকা, আরবের দক্ষিণ অর্ধাংশ এবং মালাগাছি নিয়ে ইথিওপিয়ান অঞ্চল গঠিত যদিও মালাগাছিকে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের উপ-অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত। প্রাকৃতিকভবে ইথিওপিয়ান ও নিউট্রোপিক্যাল অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। উত্তর দিকে উভয় অঞ্চলের স্থলসংযোগ বিদ্যমান। কিন্তু অন্যান্য দিকে জলাশয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অঞ্চল দুটি পৃথকভাবে অবস্থান করছে। উভয় অঞ্চলে বৃহৎ নদী, ব্যাপক বিস্তৃতির ক্রান্তীয় চিরসবুজ অরণ্য এবং ক্রান্তীয় তৃণভূমি বিদ্যমান। প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অন্য যে কোনো প্রাণী অঞ্চল অপেক্ষা ইথিওপিয়ান অঞ্চলে বাদুড় ছাড়া ভিন্নধর্মী ৩৮ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণিকূলের গোষ্ঠী বিদ্যমান। অদ্বিতীয় গোত্রের সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চল নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলের পরে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রয়েছে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে কিছু সংখ্যক প্রাচীন প্রাণী যেমন—অ্যারডভার্ক, হাইরাক্স (Aardvark, hyrax), কিছু সংখ্যক স্থানীয় পতঙ্গভুক যেমন স্বর্ণ মুষিক বা ছুঁচা, উদ্ভিড়াল মুষিক (otter shrews) এবং হস্তিমুষিক (elephant shrews) এবং উত্তরে জন্মলাভকারী খুববিশিষ্ট আধুনিক প্রাণীর অতি সাম্প্রতিক কালের আগমনের দ্বারা অঞ্চলটি বর্ণিত সকল প্রাণীর এক মিলন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আবার অনেক আধুনিক প্রাণী যেমন ভল্লুক, হরিণ এবং মেষ এই অঞ্চলে কখনও পৌছেনি।

আফ্রিকায় সম্ভবত উত্তরের উৎস এলাকা হতে আধুনিক প্রাণিকুলের আগমন ঘটেছে। এই অঞ্চলের বারটি গোত্র ছাড়া ছাব্বিশটি গোত্রের অংশীদারিত্ব প্যালিআর্কটিক অথবা অরিয়েন্টাল অঞ্চলের সাথে জড়িত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা যেতে পারে যে অঞ্চলটি আর্কটোগি রেলমের অংশ। আফ্রিকার প্রাণিকুল হিমযুগোত্তরের অন্তরণের বৈশিষ্ট্য বহন

করলেও ইথিওপীয় এবং অরিয়েন্টাল অঞ্চলের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। প্লিসটোসিন বরফ যুগের সময় সাহারা মরুভূমি যে স্টেপ তৃণভূমির আওতায় ছিল তার তথ্য বিদ্যমান। ফলে এলাকাটি দক্ষিণ দিকে প্রাণী চলাচলের প্রতিবন্ধক হিসেবে নয় বরং মুক্তপথ হিসেবে কাজ করেছিল। এই প্রাণীগুলো, প্রধানত খুরবিশিষ্ট প্রাণী বিশেষ করে বর্তমানের শিকারযোগ্য বৃহৎ প্রাণী গ্রুপে পরিণত হয়েছে। অধিক উত্তরের প্রাণী প্রজাতি এই ইথিওপিয়ান অঞ্চলে না আসার উদাহরণ হিসেবে জিরাফকে ধরা যায়। এই প্রাণী প্লায়োসিন যুগে গ্রিস, ইরাক, উত্তর ভারত এবং চীনে বিদ্যমান ছিল। বরফ যুগ অবসানের সাথে সাথে উত্তর আফ্রিকা শুষ্কতার আওতায় পড়ে এবং সাহারা মরুভূমি সৃষ্টি হয় এবং এই মরুভূমিই বর্ণিত প্রাণীর এই অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বরফ যুগোত্তরকালে পূর্বের প্রাণীসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়াও মরুভূমির প্রতিবন্ধকতাটি অতি আধুনিক প্রাণী যেমন—বাঘ, পান্ডা, মেষ ও ছাগলের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই অঞ্চলে এই প্রাণীগুলো লক্ষ্য করা যায় না। অন্যদিকে অরিয়েন্টাল অঞ্চলে যে প্রাণীগুলো বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে যেগুলো বিলীন হয়ে যায় সেই প্রাণীগুলো ইথিওপিয়ান আফ্রিকায় টিকে থাকে। এগুলোর মধ্যে পূর্বে বর্ণিত জিরাফ, জলহস্তি (hippopotamus) এবং শিম্পাঞ্জি অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক স্যাভানা অঞ্চল আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত। এই তৃণভূমিতে বহু প্রজাতির খুরবিশিষ্ট প্রাণী যেমন—কৃষ্ণসার মৃগ, জেব্রা, নু (gnu), বৃষবৎ হরিণ, হারটিবিস্ট (Hartebeests hart) ছয় বছর বা ততোধিক বয়স্ক হরিণ এবং জিরাফ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। কৃষ্ণসার মৃগের উপ-গোত্র, বৈচিত্র্যপূর্ণ বোভাইড এই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও লক্ষণীয় নয়। এই তৃণভূমিতে হাতি, কালো ও সাদা গণ্ডার (Rhinocerose) উভচর জলহস্তি লক্ষ্য করা যায়। তৃণভোজী প্রাণী শিকারের উপর নির্ভরশীল প্রাণী যেমন সিংহ এবং বিড়াল গোত্রের চিতাবাঘ (Cheetah) এই অঞ্চলে এবং হায়েনার অনুরূপ কেশরবিশিষ্ট শৃগাল আফ্রিকার সকল এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। এরা শিয়ালের মতো গর্ত করে এবং শব বা মৃতদেহের মাংস ও পোকা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আরডভার্ক বা কেপ অ্যানটিয়েটার (Aardvark or cape anteater) এবং ওয়ারথগ (Warthog) এই দুই বিশেষ প্রাণী দক্ষিণ আফ্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। এটার নামের অর্থ ভূ-শূকর (Earth pig)। গর্ত সৃষ্টিকারী এই প্রাণীগুলোর খাদ্য হচ্ছে পিপীলিকা। ওয়ারথগ এককভাবে সেংসিং খুরবিশিষ্ট প্রাণী এবং শূকর গোত্রের অন্তর্গত। উপমরু ও মরুভূমি এলাকায় (দক্ষিণ আফ্রিকায়) কৃষ্ণসারমৃগ (Springbok), জারবোয়া (Gerboa), রক হাইরাক্স (Rock hyrax), টেনরেক ও গুনডি (Gundi) বাস করে। জিরাফ গোত্রের ওকাপি (Okapi), পিগমি জলহস্তি (*Pigmy hyppopotamus*), অরণ্য হস্তি, গরিলা (Gorilla), শিম্পাঞ্জি এবং বিভিন্ন প্রকার বানর ক্রান্তীয় অরণ্যে বাস করে।

পাখির বিভিন্ন প্রজাতি সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে ইথিওপিয়ান অঞ্চল পরিচিত। অরিয়েন্টাল অঞ্চলের পক্ষিকুলের সাথে এই অঞ্চলের পক্ষিকুলের সাদৃশ্য বিদ্যমান। অদ্বিতীয় বর্গের পাখি হচ্ছে অসস্ট্রিচ (Ostrich)। অনেক সাপ, গিরগিটি এবং এবং কিছু টিকটিকি এখানে লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙ এবং টোড ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। লেজবিশিষ্ট কোনো উভচর প্রাণী এখানে লক্ষ্য করা যায় না। এক শ্রেণীর গেছো ব্যাঙ (tree frogs) পলিপেডেটিড

(Polypedatids) এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় গোত্রসহ অনেক শ্রেণীর মাছ এখানে বিদ্যমান। মরমাইরিডের (Mormyrids) বৈদ্যুতিক কলাকৌশলের গঠন বিদ্যমান।

মালাগাছিকে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের উপ-অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। মূল স্থলভূমির প্রাণিকুলের সাথে দ্বীপটির প্রাণিকুলের পার্থক্য ও ক্ষুদ্র আয়তনের কারণে একে অঞ্চল হিসেবে নয় উপ-অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নিউবিগিনের অভিমত হচ্ছে যে, মাদাগাস্কার (মালাগাছি) এবং আফ্রিকার মধ্যে প্রাণিকুলের পার্থক্য না সূচক। কারণ মূল স্থলভাগের অনেক স্তন্যপায়ী জীব এখানে বিদ্যমান নয়। এই উপ-অঞ্চলে লেমুর (lemur) ছাড়া ইথিওপিয়ান অঞ্চলের অন্য প্রাইমেট দেখা যায় না। লেমুরের প্রচুর সংখ্যা প্রায় ৩৬ প্রজাতি বিদ্যমান। আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের অতি আধুনিক খুরবিশিষ্ট প্রাণী, বিড়াল গোত্রের প্রাণী, গন্ধগোকুল গ্রুপ ছাড়া মাংসাশী প্রাণী এবং পাখি এই উপ-অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় না। মালাগাছি উপ-অঞ্চলে আফ্রিকার যেসব প্রাণী বর্গ লক্ষ্য করা যায় সেগুলোও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সর্প প্রজাতির প্রাণীর সাদৃশ্য আফ্রিকার সাপের সাথে নয় বরং দক্ষিণ আমেরিকার সাপের সাথে প্রকাশ পায়। অতি প্রাচীন পতঙ্গভুক প্রাণী এই উপ-অঞ্চলে বিদ্যমান।

মধ্য টারসিয়ারি সম্ভবত মায়োসিন যুগে মাদাগাস্কার আফ্রিকা হতে পৃথক হওয়ার পূর্বে আফ্রিকায় প্রাণীর প্রজাতি সীমিত সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল এবং প্রাণীগুলো প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বহন করতো। এই সময়ই মালাগাছিতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের প্রাণী বসবাস করতো। আফ্রিকা হতে মালাগাছির বিচ্ছিন্নতা প্রথমত টারসিয়ারি ও প্লিসটোসিন যুগের আধুনিক স্তন্যপায়ী জীবের চলাচলের পথ বন্ধ করে এবং দ্বিতীয়ত যেসব প্রাণিকুল এই উপকূলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সেগুলো উন্নত প্রাণীর প্রতিযোগিতা ও আক্রমণ হতে রক্ষা পায় এবং এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দেশীয় প্রাণিবর্গে পরিণত হয়।

৭.৮.৩. অরিয়েন্টাল অঞ্চল : বিজ্ঞানী স্ক্ল্যাটার এই অঞ্চলকে ভারতীয় অঞ্চল বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশ, দক্ষিণ চীন, সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অঞ্চলটি পশ্চিম দিকে পর্বত ও পূর্ব ইরানের মরুভূমির দিয়ে বেষ্টিত। উত্তরে হিমালয় ও সিংলিংসান, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যথাক্রমে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয় বিদ্যমান। শুধু দক্ষিণ পূর্বে দ্বীপীয় অঞ্চলের (insular region) জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। এক্ষেত্রে ওয়ালেস প্রদত্ত সীমারেখা সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয় (মানচিত্র ৭.আ)। অরিয়েন্টাল অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত ক্রান্তীয়। অঞ্চলটিতে অরণ্য লক্ষ্য করা গেলেও কিছু এলাকা স্যাভানা এবং মরুভূমির অন্তর্গত।

ভারত উপমহাদেশ এবং আসামের ভূ-প্রতিবন্ধকের (bottleneck) পরবর্তী এলাকা, মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ), চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাকী দেশগুলোর মধ্যে অরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণিকুলের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। মধ্য টারসিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বতমালার উৎপত্তির পর উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের দুই প্রধান প্রবেশ পথ অরিয়েন্টাল অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। এক পথ পশ্চিমের হিমালয়ের প্রতিবন্ধকতার কিনারা বরাবর এবং অন্যটি পূর্বের পার্বত্যসঙ্কুল এলাকার পথ। পশ্চিমের পথ (avenue) পার্বত্য ও মরু এলাকার

মধ্য দিয়ে বিস্তৃত এবং যেসব প্রাণী মরু বা পার্বত্য পরিবেশের সাথে অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। যেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমানের পার্বত্য সিংহ (mountain lion) সেগুলো এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। চীনের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল মধ্যবর্তী পূর্বের পথ দিয়েও উক্ত অঞ্চলের পরিবেশে অভিযোজিত প্রাণী এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে। আর্দ্র, অরণ্যময় ও জটিল প্রকৃতির পর্বত সঙ্কুল উত্তর-পূর্ব ভারতীয় এলাকা অনেক প্রজাতির প্রাণীর উপমহাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করলেও বাঘ আসামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং অরিয়েন্টাল অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব পথ দিয়ে স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপসমূহে উপস্থিত হয়েছে।

অরিয়েন্টাল অঞ্চলে মালাগাছির অনুরূপ উপঅঞ্চল গড়ে উঠেনি যদিও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর কিছু মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে লেমুরসহ কিছু প্রাচীন প্রাণী, উচ্চতর প্রাণী যেমন—দেশীয় (ungulate) ষাঁড় ও প্রাইমেট (আঙুলবিহীন বানর) এবং নরাকার এপ (anthropoid apes) ও বানর লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশিয়ার মিশ্র ও অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাণিকুল এশিয়ার সাথে এটার অতীতের স্থল সংযোগ এবং কখনো কখনো সংযোগচ্যুতি ও অন্তরণ নির্দেশ করে। তদুপরি মনে হয় এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সাথে ইন্দোনেশিয়ার স্থল সংযোগ সম্ভবত হয় সংক্ষিপ্ত না হয় সবিরাম থাকার কারণে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণিকুলের এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আগমন ঘটেনি। ফলে প্রাচীন প্রাণিকুলকে ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। আবার এটাও ধারণা করা হয় যে, অঞ্চলটিতে টিকে থাকা ক্রান্তীয় অরণ্য অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছে যেমন এরূপ পরিবেশে পশ্চিম আফ্রিকার *Pigmy hippopotamus*-র টিকে থাকা সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থাকার কারণে অরিয়েন্টাল অঞ্চলের অংশ, ইন্দোনেশিয়া মালাগাছির অনুরূপ উপ-অঞ্চলে পর্যবসিত হতে পারেনি।

অরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণীসমূহ বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির সাথে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের অনুরূপ জীবসমূহের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রধান কারণ হচ্ছে উভয় প্রাণী অঞ্চলই প্রাচীন পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। অনেকে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে সুদূর অতীতের স্থল সংযোগকে অস্বীকার করতে চান না এবং এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মালাগাছির উভচর প্রাণী ও পাখির সাথে অরিয়েন্টাল অঞ্চলের উভচর প্রাণী ও পাখির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের বর্ণিত জীবের সাথে নয়। অরিয়েন্টাল অঞ্চলে সর্বনিম্ন সংখ্যক অদ্বিতীয় প্রাণী প্রজাতি বিদ্যমান এবং মাত্র চারটি স্বদেশীয় স্তন্যপায়ী জীব লক্ষ্য করা যায়।

অরিয়েন্টাল অঞ্চল প্রাইমেটসমৃদ্ধ এবং সকল ভূ-প্রাণী অঞ্চলগুলোর মধ্যে এগুলোর ক্রমের অনুপাতও এখানে বেশি। এখানে গিবন, ওরাংওটাং এবং প্রাচ্যের বানর বিদ্যমান। বানরের অনেক ক্ষুদ্র জাতি যেমন লরিস (Lorises), গেছো পতঙ্গভুক মুষিক ও টারসিয়ার (Tarsiers) লক্ষ্য করা যায়। টারসিয়ার হচ্ছে আঙুলবিহীন বানর স্তরের (Ape) ক্রমবিকাশের সন্ধিক্ষণ স্তরের প্রাণী। এ অঞ্চলে ভারতীয় হাতি, জলজ মহিষ, দুই প্রকার গণ্ডার, বাঘ এবং হরিণও বাস করে। বিভিন্ন প্রকার কৃষ্ণসার মৃগ প্রধনত ভারতীয় উপমহাদেশে লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল বর্ণের পাখিসহ বহুসংখ্যক পাখি এই অঞ্চলে বাস করে। কিছু

পাখির নিকট সম্বন্ধ অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষ করে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের পাখির সাথে বিদ্যমান। এখানে ফিজ্যান্ট (Pheasant অর্থাৎ রঙিন পাখিবিশেষ) ও কবুতর কিন্তু স্বল্প সংখ্যক তোতা পাখি বিদ্যমান। চমৎকার ময়ুর ও আরগাস ফিজ্যান্টসহ বন্য মুরগি হচ্ছে এখানকার দেশী প্রজাতির পাখি। এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর পাখি, কল্পনার নীল পাখি এই অরিয়েন্টাল অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বিষধর সাপসহ অনেক শ্রেণীর সাপ, বিভিন্ন শ্রেণীর গিরগিটি, স্থল ও মিঠাপানির অনেক কচ্ছপ এ অঞ্চলে বিদ্যমান। উভচর জীবের মধ্যে ব্যাঙ এবং টোড ব্যাপকভাবে অঞ্চলটিতে লক্ষ্য করা যায়। মাছের মধ্যে কার্প, পোনামাছ এবং মাগুর মাছ প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে এই প্রাণী অঞ্চলে।

৭.৯. নিওগি রেলম

এই রাজ্য বা জগত (realm) নিউট্রপিক্যাল অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চল সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, কেন্দ্রীয় বা যোজকীয় (isthumus) আমেরিকা, প্রায় সমগ্র মেক্সিকো এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চল উত্তরের নিআর্কটিক অঞ্চলের সাথে যুক্ত হলেও অন্য তিন দিকের সমুদ্র দিয়ে অন্য অঞ্চলগুলো হতে এটি বিচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থিত। নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলের দক্ষিণ অংশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অংশ ছাড়া সমগ্র অঞ্চলটিতে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিদ্যমান। নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলটিতে ভূমিরূপ ও জলবায়ুর জটিল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে আমাজান উপত্যকার চিরসবুজ বনসহ ব্যাপক নিম্ন সমভূমি, ব্রাজিল ও গায়ানার সাভানা তৃণভূমিসহ প্রায় সমতল মালভূমি, অরিনোকো উপত্যকার স্যাভানা, প্লেট এর মোহনা সংলগ্ন নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি এলাকা এবং অ্যান্দিজ করডিলেরার উচ্চ পার্বত্য অরণ্য ও এর উচ্চতলের আন্তঃমালভূমির উপমরু এলাকা বিদ্যমান।

এই অঞ্চলটির প্রাণিকুল বিশেষ স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বহন করে। ভূ-তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুদূর অতীতের সময়কালে দক্ষিণ আমেরিকার সাথে অস্ট্রেলিয়ার নিকট সম্বন্ধ বজায় ছিল। এই সাদৃশ্য ছাড়াও সম্ভবত জুরাসিক যুগ পূর্ব সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা উত্তরের স্থলভাগের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফলে উত্তরের প্রাচীন প্রাণীসমূহ এ অঞ্চলে আসার পথ পায় এবং বসবাস আরম্ভ করে। জুরাসিক যুগে দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা হতে সম্ভবত পানির অংশ বা জলাশয় দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন অংশ পানামা তোরণ (Ponama portal) নামে পরিচিত। ফলে দীর্ঘকালব্যাপী দক্ষিণ আমেরিকার বিচ্ছিন্ন অবস্থানে স্থলভাগের প্রাণী ক্রমবিকাশ লাভ করে। তাই এ অঞ্চলের প্রাণী প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসহ টিকে রয়েছে যদিও এ প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিসমূহের অনুরূপ অতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বহন করে না। পরবর্তীকালে এ পানামা পোরটাল স্থলভাগ, পানামা যোজকে পরিণত হওয়ার ফলে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রাণীর চলাচল আরম্ভ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু সংখ্যক প্রাচীন প্রাণী মধ্য আমেরিকা এমনকি উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে ক্রমবিকাশ লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে আরমেডিল্লো (Armedillo) দক্ষিণ আমেরিকায় গর্তে বাসকারী কঠিন আঁশে আবৃত দেহের ক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষ, ওপোসাম (Oppossum), সজারু (Porcupine) এবং কিছু সংখ্যক লেপটোডাকটিলিডের (Leptodactylid) নাম উল্লেখ করা যায়। সম্ভবত অন্যান্য প্রাচীন প্রাণী নিউট্রপিক্যাল অঞ্চল পরিত্যাগ করে। উত্তরের স্থলভাগ

হতে আগত অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণীর আক্রমণের ফলে অনেক প্রাচীন প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কিছু সংখ্যক প্রাচীন প্রাণী টিকে থাকে। উত্তরের স্থলভাগ হতে আগত প্রাণীর মধ্যে হরিণ, বিড়াল, এক শ্রেণীর ভল্লুক, উট (লামা এবং সমগোত্রের প্রাণী), পেক্যারি (Peccary অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার শূকরসদৃশ প্রাণী), স্কাঙ্ক (Skunk অর্থাৎ আমেরিকার ভোঁদড়জাতীয় প্রাণী), নকুল বা নেউল বা বেজি বা (weasel), ব্যাঙ, স্যালাম্যানডার (Salamander অর্থাৎ অদাহ্য কল্পিত ও বিষধর) সরীসৃপতুল্য উভচর প্রাণী, বিভিন্ন প্রকার সাপ এবং কচ্ছপ হচ্ছে প্রধান। দক্ষিণ আমেরিকা হতে প্রাণীর বহির্গমন অপেক্ষা আগমনের সংখ্যা অধিক বলে বিবেচনা করা হয়।

বাদুড় ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় ৩২ গোত্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে রয়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে ১৬টি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে। সকল প্রাণী অঞ্চলের মধ্যে বেশি সংখ্যায় স্থানীয় গোত্রের প্রাণী নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিদ্যমান। এখানে প্যালিআর্কটিক ও নিআর্কটিক উপঅঞ্চলের কুকুর, বিড়াল, হরিণ, ভল্লুক একমাত্র গণ, শশক (Rabbit), শ্রু (Shrew অর্থাৎ মুষিকজাতীয় ক্ষুদ্র পতঙ্গভুক প্রাণী), কাঠবিড়াল, প্রোকিওনিড (Procyonid), মাসটেলিড এবং ক্রিসেটিড ইঁদুর (cricetid mice) এবং নিআর্কটিক অঞ্চলের আরমেডিল্লো, ওপোসাম, সজারু এবং পেকারি (Peccary) বিদ্যমান। এই অঞ্চলে সাধারণ স্তন্যপায়ী জীব যেমন হেজ হগ (hedge hog), ছুঁচো (mole), হায়েনা, স্থানীয় বোভাইড বর্গের এবং দেশজ ঘোড়ার (অতীতে বিদ্যমান ছিল) প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাণী বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় না।

দেশী স্তন্যপায়ী ১৬ গোত্র জীবের মধ্যে তিন গোত্র—অ্যান্টিটার (Anteater), স্লোথ (Sloth) ও আরমাডিল্লো এডেনটাটা (*Edentata*) গণের সৃষ্টি করেছে। এই বর্গের *Dasypus* গণের নয়টি বন্ধনীর আরমিডিল্লো নিআর্কটিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এখানে তিন প্রকার অ্যান্টিটার ভূমিপৃষ্ঠের বাসরত বৃহৎ লেজবিশিষ্ট আন্টিটার হতে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র এবং শেষে আঁকড়িয়ে ধরতে সক্ষম ক্ষুদ্রাকৃতি লেজবিশিষ্ট অরণ্যের গাছবাহী অ্যান্টিটার বিদ্যমান। (*Edentata* গণের এই প্রাণীগুলোর গোত্রই কেবল দাঁতবিহীন এবং এরা গণটির সত্যিকার অর্থ প্রকাশ করে। স্লোথের দুই গণ বিদ্যমান এবং প্রাণীগুলো গাছ এবং ভূমিতে উঠানামা করে। প্রাণিগুলোর দেহ ক্ষুদ্র হাড়ের বা শৃঙ্গসদৃশ বর্মের পদার্থের স্তরের সাহায্যে আবৃত। দেহের এরূপ কাঠামো থাকা সত্ত্বেও মৃত্তিকা খননকারী ও ধাবমান প্রাণী হিসেবে এগুলো পরিচিত।

অবশিষ্ট প্রাণীর দেশী গোত্রের মধ্যে মারসুপিয়াল (বাচ্চা ধরে রাখার থলিবাহী প্রাণী)। দুই গোত্রের বানর, এগার প্রকার ক্যাভিওমরফ তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী (caviomorph rodents) এবং পাঁচ গোত্রের বাঁদুড় লক্ষ্য করা যায়।

মারসুপিয়ালের দুই গোত্রের মধ্যে ইঁদুরের অনুরূপ কেইনোলেসটিডে (caconolestidae) এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। ডিডেলফাইডে বা ওপোসাম (Didelphidae or opposum) নিআর্কটিক অঞ্চলে বিদ্যমান। এ দুই গোত্র ছাড়া মারসুপিয়াল শুধু অস্ট্রেলিয়াতে লক্ষণীয় এবং এখানে ছয় গোত্রের মারসুপিয়াল বাস করে।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন গোত্রের বানর, ডুরুকৌলিস (Douroucoulis), স্পাইডার বানর (Spider monkey), ক্যাপুচিন (Capuchins), কাঠবিড়াল বানর (Squirrel

monkeys), হাওলার (Howlers), সিবিড (Cebid) গোত্র এবং ট্যাম্যারিন ও মারমোসেট (Tamarins and marmoset), ক্যালিথ্রিসিড (Callithricid) গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ দুই বানর গোত্রের মিলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চ্যাপটা নাক এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীন জগতের নিম্নমুখী নাকবিশিষ্ট বানরের গোত্র হতে এগুলোকে পৃথক করে রেখেছে। অন্যদিক দিয়ে এগুলো ব্যাপক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য প্রকাশ করে। মারমোসেট ঝোপসদৃশ ক্ষুদ্র লেজ ট্যামারিনের নখরবিশিষ্ট আঙুল ও পদাঙুলি এবং সেবিদের আদর্শ বানর চ্যাপ্টা নখ ও আঁকড়িয়ে ধরার লেজের অঙ্গগুলোর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায়।

নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে ১১ গোত্রের তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট প্রাণী হচ্ছে ক্যাভিওমরফ উপক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতীচ্যের (new world) সজারু হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যা এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। দেশী ক্যাভিওমরফ গোত্রের তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট প্রাণীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। এগুলো হচ্ছে চার ফুট দৈর্ঘ্যের ক্যাপিবারা (Capybara), গিনি শূকর (Guinea pigs), ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট প্যাকারানা (Spotted pacaranas), প্যাকা (Pacas), অ্যাগুটি (Agoutis), ছিনছিলা (Chinchillas), নিউট্রিয়া (Nutrias), মৃত্তিকা খননকারী ডেগা (Burrowing degas) এবং টুকটুকু (Tucotucos) এর ছিনছিলা ইঁদুর (Chinchilla rat) ও কন্টকাবিশিষ্ট ইঁদুর (Spiny rats)।

নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে স্বদেশ জাতের পাঁচ শ্রেণীর বাঁদুড় বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রক্তচোষা বাদুড় (Vampire bats) সুপরিচিত। এগুলো গবাদি পশু পালের (Cattle herds) জন্য ধ্বংসাত্মক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত এবং এগুলো বিভিন্ন অসুখ যেমন জলাতঙ্ক রোগ (Rabies) ছড়ায়। বলা হয়ে থাকে যে স্বদেশ জাত ঘোড়ার বিলুপ্তি রক্তচোষা বাঁদুড়ের মাধ্যমেই ঘটেছে।

অঞ্চলটিতে প্রাণিকুলের অনুরূপ পক্ষীকুলও (Avi fauna) সমৃদ্ধশালী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। পাখির প্রায় অর্ধেক সংখ্যা সীমিত গোত্রের পর্যায়ে বিদ্যমান। দুই ক্রম (Orders), রি (Rhea অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার উটপাখি বিশেষ) ও টিনামুস (Tinamus) কেবল নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। রি আফ্রিকা ও আরবের অসট্রিস গোত্রের অনুরূপ উড়তে অক্ষম পাখি। উত্তর-পূর্ব ব্রাজিল হতে প্যাটাগোনিয়ার তৃণভূমিতে দক্ষিণ আমেরিকীয় তিন শ্রেণীর অসট্রিচের বিস্তারণ লক্ষ্য করা যায়। কেবল এ অঞ্চলে পাখির অন্যান্য সীমিত গোত্রগুলো হচ্ছে টুকান (Toucan), ট্রমপেটার (Trumpeter), হোয়াট্‌জিন (Hoatzin), ক্র্যাসিড (Cracid) এবং কনটিনজিড (Contingid)। আমাজনীয় সেলভায় মাকজ (Macaws), ও অতি রঙিন পালকবিশিষ্ট বৃহৎ তোতাপাখি লক্ষ্য করা যায়। আন্দিজ-এর অরণ্য প্রান্তে অত্যন্ত রঙিন গুঞ্জন বা গুনগুন ধ্বনিবিশিষ্ট পাখি বিদ্যমান। অনেক পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং ব্যতিক্রমধর্মী শব্দ প্রকাশ পায়। এ অঞ্চলে গায়ক পাখি অত্যন্ত সীমিত।

সাপ, গিরগিটি, কুমির এবং কচ্ছপ এ অঞ্চলে বহুল সংখ্যায় বিদ্যমান। বহুল পরিচিত আনাকোনডা (Anaconda) ও বোয়া কনস্ট্রিকটর *(Boa constrictor)* সাপ এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। একক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ইগুয়ানিড গিরগিটি বহুল সংখ্যায় বাস করে। এ শ্রেণীর গুটিকাযুক্ত গিরগিটির দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার (৫') পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর দীর্ঘ লেজ,

খাঁজকাটা পৃষ্ঠদেশীয় চূড়া আঁশযুক্ত মাথা এবং বৃহৎ গলকম্বল বিদ্যমান। প্রায় সকল গিরগিটি বৃক্ষচারী (Arboreal) এবং সবুজ বর্ণ প্রকাশ করে। কুমির গোত্রের মধ্যে অ্যাল্লিজেটর (Alligater) এবং ক্যায়মান প্রধান এবং এগুলো নদীতে লক্ষ্য করা যায়। পার্শ্বঘাড়বিশিষ্ট কচ্ছপ এখানে লক্ষণীয়। পেলোমেডুসিডে বা কর্দম কচ্ছপ (Pelomedusidae or mud turtle) আফ্রিকার কচ্ছপ এবং অন্যটি চেলিইডে বা স্বর্প কচ্ছপ (Chelyidae or snake turtle) অস্ট্রেলিয়ার কচ্ছপের সাথে সাদৃশ্য বহন করে। উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ ছাড়া টোড, হাইলিড গেছো ব্যাঙ এবং পিপিড টোড (Pipid toad) প্রধান। ইথিওপীয় অঞ্চলের টোডের সাথে পিপিড টোড গোত্র সাদৃশ্য বহন করে।

৭.১০. নটোগিয়ান রিলম

ভূপ্রাণিজগতের মধ্যে নটোগি হচ্ছে স্পষ্টভাবে নির্ণীত জগত। কিন্তু জগতটির সীমা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে কিছু মতদ্বৈত্যতা বিদ্যমান। এ জগত দক্ষিণ ভূখণ্ড নামেও পরিচিত। জগতটি প্রাণিকুলের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে পরিচিত। এজন্য একে জীবন্ত জীবাশ্মের জগতও বলা যায়। নিউবিগিন এই প্রাণিজগতকে অস্ট্রেলীয় পলিনেশীয় এবং হাওয়াই অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। অনেক সময় পলিনেশীয় ও হাওয়াই অঞ্চলদ্বয়কে একত্রে এক অঞ্চলে সংযুক্ত করা হয়।

৭.১০.১. অস্ট্রেলীয় অঞ্চল : অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, নিউগিনি এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বপূর্ব দ্বীপসমূহ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। বর্ণিত ও সেলিবিস এবং বালি ও লোমবক দ্বীপ মধ্যবর্তী সীমারেখা (মানচিত্র ৭.ঈ) এই অঞ্চলকে অরিয়েন্টাল অঞ্চল হতে পৃথক করে রেখেছে। এই সীমারেখাও সর্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নিওগি জগতের মধ্যের অঞ্চলগুলোর সাথে অন্য অঞ্চলের স্থল সংযোগ না থাকার কারণে অঞ্চলটিতে অতি পার্থক্য সূচক প্রাচীন প্রাণিকুল লক্ষ্য করা যায়। অতি অল্প সংখ্যক ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রের স্তন্যপায়ী প্রাণীর, কিছু সংখ্যক মনোট্রিম (monotremes) এবং মারপুলিয়ালের প্রাচুর্য এ অঞ্চলে বিদ্যমান। অন্য ভূ-প্রাণী অঞ্চলে প্ল্যাসেনটাল প্রাণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও অস্ট্রেলীয় অঞ্চলে মারসুপিয়াল প্রাণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মারসুপিয়াল হতেও অধিক প্রাচীন ডিম দেয়া মানোট্রিম যেগুলো উড়তে অক্ষম সেই অত্যাশ্চার্য পাখি এবং প্রাচীন মাছও এই অঞ্চলে বিদ্যমান। এসব অত্যাশ্চার্য এবং প্রাচীন প্রাণীসমূহ অঞ্চলটির দীর্ঘ সময়ভিত্তিক প্রাকৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থান প্রাচীন প্রাণীগুলোর টিকে থাকার জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের মহাদেশটিতে উন্নততর ও অপেক্ষাকৃত হিংস্র ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রের প্রাণী প্রবেশ করতে না পারার কারণে বর্ণিত প্রাচীন প্রাণিসমূহকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়নি। সুদূর অতীতে সম্ভবত ১৫ কোটি বছর পূর্বে অস্ট্রেলীয় ও এশিয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই স্থলসংযোগ বিদ্যমান ছিল। আর এ স্থলসংযোগের মাধ্যমে পূর্বের স্তন্যপায়ী জীব মহাদেশটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার মধ্যের স্থলসংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা দীর্ঘকাল ধরে কোনো স্থল সংযোগ থাকে না। ফলে সময় এবং অতি দূরের বিচ্ছিন্ন অবস্থান অঞ্চলটির অদ্বিতীয় প্রাণিকুল ও উদ্ভিদজীবনকে ক্রমবিকাশের সুযোগ দিয়েছে (conspired)।

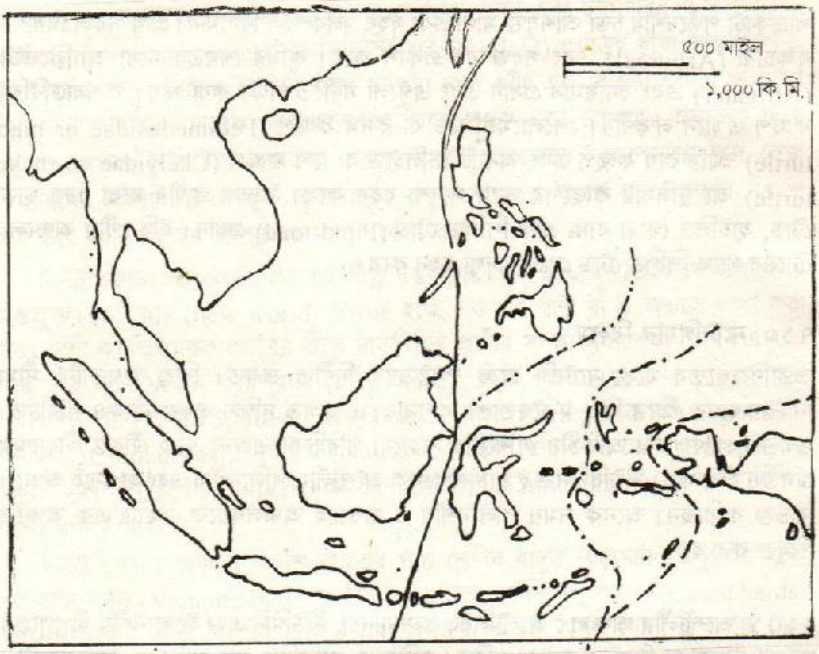

মানচিত্র ৭.ঈ : ওয়ালেস এবং ওয়েবারের 'বিলস' এর সীমারেখা।

—·—·— ওয়ালেসের মূল সীমারেখা, ——— ওয়ালেসের পরিবর্তিত সীমারেখা,

—·—·— ওয়েবারের মূল সীমারেখা, – – – – ওয়েবারের পরিবর্তিত সীমারেখা

অস্ট্রেলীয় অঞ্চলের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্বল্প সংখ্যা। বাঁদুড় ছাড়া নয় গোত্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এই গোত্রগুলোর মধ্যে মাত্র এক গোত্র ছাড়া সব গোত্রগুলোই বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই অঞ্চলের মারসুপিয়ালই হচ্ছে প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাণীগুলো ছয় গোত্রের অন্তর্গত। বিশেষ স্বতন্ত্র প্রাণী হচ্ছে ক্যাঙ্গারু। শান্ত এবং প্রায় স্বপ্রতিরক্ষাহীন এই প্রাণী যদি মাংসাশী প্রাণীর প্রতিযোগিতায় পড়তো তাহলে এগুলো অতি সহজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ত। ওয়াল্যাবি (Wallaby অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাঙ্গারু), কোয়ালা (Koala), উমব্যাট (Wombat অর্থাৎ ভল্লুকসদৃশ থলিবিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী), ছুঁচা বা গন্ধ মুষিক (Mole), লম্ফ প্রদানকারী নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, উড়ন্ত ফ্যালাঙ্গার (flying phalanger) হচ্ছে অন্যান্য মারসুপিয়াল।

বিজ্ঞানী জর্জের মতে, অস্ট্রেলিয়ায় কিছু সংখ্যক স্তন্যপায়ী জীব বাহ্যিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাদৃশ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ এ অঞ্চলের মারসুপিয়াল, গন্ধমুষিক, উড়ন্ত ফ্যালাঙ্গার ও তাসমানীয় নেকড়ে, অন্য অঞ্চলের প্ল্যাসেনটাল (ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রবিশিষ্ট প্রাণী), উড়ন্ত

কাঠবিড়াল এবং হায়েনার সাথে বাহ্যিক কাঠামোর সমান্তরলতা (parallelisim) লক্ষ্য করা যায়। ক্যাঙ্গারু ও ওয়াল্যাবির অনুরূপ স্পষ্ট গঠন কাঠামোর প্রাণী পৃথিবীর অন্য কোথাও লক্ষণীয় নয়। ঘটনা হচ্ছে যে, এগুলো তৃণভোজী প্রাণী এবং এরা উন্মুক্ত এলাকায় দ্রুতগতিতে (celerity) চলাচল করে। তাই ধারণা করা হয় যে, অন্য অঞ্চলের খুরবিশিষ্ট প্রাণীর (ungulates) যথাযোগ্য স্থান এই অঞ্চলে এরা দখল করে রেখেছে।

অস্ট্রেলীয় প্রাণিকুলের দুই গোত্র মোনোট্রিমাটা অর্থাৎ উপশ্রেণী-মনোট্রিমা বা ডিম প্রদানকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে অন্তর্গত। দুই গোত্র হচ্ছে পাতিহাঁসের ন্যায় চঞ্চুযুক্ত প্লাটিপাস (Platypus অর্থাৎ পাতিহাঁসের ন্যায় চঞ্চুযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী অন্তজ জন্তু বিশেষ) এবং একিড়নাস (Echidnas)। প্লাটিপাস হচ্ছে এক অদ্ভুদ জন্তু। জন্তুটি আধা-জলচর লোমশ স্তন্যপায়ী জীব। এর পাতিহাঁসের অনুরূপ চঞ্চু বিদ্যমান এবং ডিম পাড়ে। এজন্য জন্তুগুলোর ক্ষেত্রে রসাত্মক মন্তব্য হচ্ছে যে এগুলো মৎস্য, পক্ষিমাংস যেমন নয়, তেমনি উৎকৃষ্ট লোহিত ভক্ষণযোগ্য গরু, ভেড়া, মৃগ প্রভৃতির মাংসও নয়। একিডনা বা মেরুদণ্ড অ্যাটিয়েটার হচ্ছে দীর্ঘ নাক ও দীর্ঘ জিহবাবিশিষ্ট লেজবিহীন ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টিকারী প্রাণী। এগুলো কীটপতঙ্গভুক। অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ বা পঞ্চ পদাঙ্গুলিযুক্ত প্রজাতি হচ্ছে *Echidna aculeata* এবং নিউগিনির প্রজাতি হচ্ছে ত্রি-পদাঙ্গুলিবিশিষ্ট *Proecaidna bruignii*।

ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর একমাত্র গোত্র মিউরিড নেংটি ইঁদুর অস্ট্রেলিয়াতে লক্ষ্য করা যায়। এই গোত্র কেবল অস্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান নয়। নিউগিনির ডিংগো বা দেশী কুকুর এবং শূকর সম্ভবত এই অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালে মানুষের সাহায্যে প্রবর্তিত হয়। খরগোশ, ইঁদুর ও নেংটি ইঁদুর গবাদি যেমন—ঘোড়া এবং মেষ অতি সাম্প্রতিককালে এই অঞ্চলে প্রবর্তিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষিকুল দশ প্রজাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করলেও এগুলো প্রাণিকুলের অনুরূপ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বহন করে না। এই অঞ্চলের প্রায় সকল পাখির গোত্রের বিস্তার ভৌগোলিক ব্যাপক পরিসর এলাকায় বিদ্যমান। বহুল সংখ্যায় কবুতর ও তোতাপাখির মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অরিয়েন্টাল অঞ্চলের অনুরূপ পাখি এই অঞ্চলে দেখা গেলেও এই অঞ্চলে ফিজ্যান্ট লক্ষ্য করা যায় না। এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহনকারী গোত্রের পাখির মধ্যে লায়ার পাখি (Lyre bird অর্থাৎ বীণা বাদ্যযন্ত্রের তারের পুচ্ছযুক্ত পাখি), নিকুঞ্জ পাখি (Bower bird), সুন্দর পক্ষযুক্ত বায়স পাখি, ক্যাসোওয়ারি (Cassowaries অর্থাৎ উড্ডয়ন অক্ষম বৃহৎ পাখি) এবং এমু (Emus) প্রধান। ক্যাসোওয়ারি অসট্রিসের পরই উড্ডয়নে অক্ষম দ্বিতীয় বৃহৎ অতি দ্রুত চলাচলের পাখি। এমু ক্যাসোওয়ারি পাখির অনুরূপ এবং এগুলো ১.৫ মি. হতে ১.৮ মি. (৫-৬ ফুট) উঁচু। এমু কেবল অস্ট্রেলিয়ায় লক্ষ্য করা যায়। অবিরত শিকার করার ফলে এই পাখিগুলো এখন বিলুপ্তির পথে।

অন্যান্য প্রাণী অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক সরীসৃপ, উভচর প্রাণী এবং মিঠাপানির মাছ লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলীয় অঞ্চলে প্রায় ২৫০ প্রজাতির গিরগিটি বিদ্যমান। অধিকাংশ প্রজাতির গিরগিটি ক্ষুদ্র এবং নিরীহ (Harmless)। যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ এলাকা উত্তপ্ত ও শুষ্ক সেহেতু অনেক গিরগিটি এই পরিবেশে অভিযোজিত হয়েছে। প্রায় ১৫

সে.মি. (৬") কাঁটাবিশিষ্ট ড্রাগন বা কাঁটাবিশিষ্ট ডেভিল এর জলাকর্ষী চর্ম (অর্থাৎ এটা সহজে পানি শোষণ করে) বিদ্যমান। অস্ট্রেলিয়ার *Varanid komododragon* হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গিরগিটি। অঞ্চলটির ক্রান্তীয় অংশে কুমির বাস করে। এখানে তিন শ্রেণীর কচ্ছপ লক্ষ্য করা যায় এবং মাত্র এক শ্রেণীর কচ্ছপের সাথে নিউট্রপিকাল অঞ্চলের কচ্ছপের মিল রয়েছে। সাধারণ টোড লক্ষণীয় না হলেও প্রায় ১০০ প্রকার ব্যাঙ এই অঞ্চলে বিদ্যমান। মিঠাপানির মাছের স্বল্প সংখ্যা এই অঞ্চলে প্রকাশ পায়। সেরাটোডাস (Ceratodus) হচ্ছে অতি প্রাচীন মাছ এবং এটা কুইন্সল্যান্ডের নদীতে লক্ষ্য করা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিক্ষিপ্ত বিস্তারণের দ্বীপসমূহকে নটোগি প্রাণিজগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিউবিগিন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে এক পৃথক প্রাণী অঞ্চল হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে, এই দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ করে পাখি ও খোলকবিশিষ্ট ভূ-প্রাণী স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে। ক্ষুদ্র আয়তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীপপুঞ্জটিকে পৃথক প্রাণী অঞ্চল হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে। বাস্তবক্ষেত্রে পলিনেশীয় দ্বীপসমূহকে পৃথক প্রাণী অঞ্চল হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ এক বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। তবুও যেহেতু অঞ্চলটিতে ভূ-স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী লক্ষ্য করা যায় না, তাই এই দ্বীপগুলোকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে অনেক বিজ্ঞানী স্বীকৃতি প্রদান করেন। বিজ্ঞানী নিউবিগিনের মতে, সলোমন দ্বীপসমূহে কয়েক প্রকার উভচর প্রাণী এবং মারসুপিয়াল যেমন মারসুপিয়াল কুচকাচ (*Cuscus*) কুমির ও কিছু সংখ্যক পাখি বিদ্যমান রয়েছে। তাই এগুলোকে নিউগিনি অর্থাৎ অস্ট্রেলীয় অঞ্চলের সাথে যুক্ত করা যায়। নিউগিনির নিকটে অবস্থিত নিউ ব্রিটেনে চার শ্রেণীর মারসুপিয়াল বিদ্যমান। তাই নিউ ব্রিটেন ও সলোমন দ্বীপসমূহের মধ্যবর্তী সীমারেখার সাহায্যে নিউব্রিটেনকে অস্ট্রেলীয় এবং সলোমন দ্বীপসমূহকে পলিনেশীয় অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি উপস্থাপিত হয়। আরও দক্ষিণ পূর্বে নিউ হেব্রাইডিজ ও নিউক্যালিডোনিয়ায়, নগণ্য সংখ্যক প্রাণিকুল, কিছু বাঁদুড় ও ইঁদুর বিদ্যমান। এখানে মোটামুটি বহু পাখির বাস। দ্বীপ দুটিতে বিষাক্ত সাপ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক সাপ বিদ্যমান। দ্বীপ দুটির পূর্বে ফিজিতে অতি অল্প সংখ্যক সাপ এবং পাঁচ শ্রেণীর ফলখেকো বাঁদুড় লক্ষ্য করা যায়।

দূরবর্তী অবস্থান ও বিচ্ছিন্নতার জন্য নিউজিল্যান্ডের প্রাণী জীবনের স্বল্প সংখ্যা নির্দেশ করে। দেশীয় প্রাণিকুলের মধ্যে দুই গোত্রের বাঁদুড়কে ভূ-স্তন্যপায়ী জীব হিসেবে গণ্য করা হয়। যে কুকুরগুলোকে দেশী কুকুর বলা হয় সেগুলো বাস্তবক্ষেত্রে মাওরিদের (Maor) কর্তৃক আনীত। মাত্র এক শ্রেণীর উভচর প্রাণী এবং দুই শ্রেণীর সাপ, চঞ্চুবিশিষ্ট গিরগিটি (Beaked lizard) ও গেকো (Gecko) এখানে লক্ষ্য করা যায়। নিউজিল্যান্ডে কিছু সংখ্যক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখি দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক পাখি উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যেমন— কিউ (Kiwi), ক্যাকাপো (Kakapo), টাকাহি (Takahe), উইকা (Weka) এবং বিলুপ্ত প্রাণী মোয়া (Exiincl moa)। অন্যান্য পাখির উড়ন্ত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এখানে মোটামুটি বিভিন্ন প্রকারের কীটপতঙ্গ, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জীব এবং মাছও বিদ্যমান।

পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয়, বিশেষ করে পলিনেশীয় ও হাওয়াই দ্বীপসমূহে প্রায় সকল ভূ-প্রাণী ও মিঠা পানির জীবের স্বল্প সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। ইঁদুর এবং ফলভূক বাঁদুড় হচ্ছে এখানকার ভূ-স্তন্যপায়ী জীব। এখানে কিছু সংখ্যা ভূ-প্রাণী এবং সমুদ্র পাখি বিদ্যমান।

কচ্ছপ হচ্ছে এখানকার অতি সাধারণ প্রাণী। যে প্রাণীগুলো যেমন—পাখি, বাদুড় ও কীটপতঙ্গ এখানে দেখা যায় সেগুলো সম্ভবত উড্ডয়ন এবং ভাসমান বস্তুর মাধ্যমে এই দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়েছিল।

নিউবিগিন দ্বীপের প্রাণিকুলের তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন—

(ক) দেশীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া যেমন হাওয়াই দ্বীপের ভূ-খোলক প্রাণী (land shells)

(খ) উড়ন্ত বৈশিষ্ট্য হারানো যেমন নিউজিল্যান্ডের কিউই ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিছু সংখ্যক পতঙ্গ এবং

(গ) প্রাণীর বামনাকৃতিতে পরিবর্তন যেমন—বেঁটে বা ক্ষুদাকায় শ্রেণীর প্রাণী লক্ষ্য করেছেন।

Library stamp

অষ্টম অধ্যায়

মানুষ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী

৮.০. মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব

পৃথিবীর স্থল পৃষ্ঠের উপরিভাগে উদ্ভিদ সবুজ আচ্ছাদনে ভূ-দৃশ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। উদ্ভিদের এই সবুজ আবরণ মানুষের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর অতীতকাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র এবং আশ্রয় এই উদ্ভিদ আবরণ সরবরাহ করে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ মৌল বা প্রাকৃতিক অবস্থায় উদ্ভিদের সৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করতো। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষাগার ও শিল্প কারখানায়, সময়ের অগ্রগতিতে মানুষ উদ্ভিদ হতে নিত্যনতুন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদিত দ্রব্যের তালিকা দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আর এসব দ্রব্য সামগ্রী যেহেতু উদ্ভিদের আদি চিহ্ন বহন করে না সেহেতু আমরা পৃথিবীর উদ্ভিদ আবরণের গুরুত্ব বলা চলে, ভুলে গেছি।

নতুন নতুন উদ্ভিদের সন্ধানের কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে রাশিয়ায় শিল্পের কাঁচামালের স্বল্পতার কারণে রাশিয়ার বিজ্ঞানীগণ নতুন উদ্ভিদের সন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে কোক সাঘিজ (Kok Saghyz) এর সন্ধান পান। এই উদ্ভিদের তরুক্ষীর (latex) হতে তাঁরা প্রাকৃতিক রাবারের প্রতিস্থাপক পদার্থ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সমগ্র পৃথিবীতে নতুন উদ্ভিদের সন্ধানে এখনও নিয়োজিত রয়েছেন।

স্থল পৃষ্ঠের সবুজ আচ্ছাদনসহ প্রাণী ও পানিতে বিদ্যমান প্রাণীর গুরুত্ব এই পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের প্রয়োজন ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে (ক) প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারণের ক্ষেত্রে মানুষের প্রভাব (খ) প্রাণী-প্রজাতির বিলুপ্তির ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা (গ) মানুষের কার্যকলাপে প্রাণীর সংযুক্ততা এবং (ঘ) ক্ষতিকর ও বিরক্তিকর কীটপতঙ্গ বা মানুষের শত্রু হিসেবে প্রাণীর গুরুত্ব মূল্যায়ন করা যায়।

৮.১. বন্য এবং চাষকৃত উদ্ভিদ

মানুষের ব্যবহৃত বনানীসমূহ দুই প্রধান দলে প্রাকৃতিক বা বন্য এবং ফসল বা চাষকৃত (domesticated) বনানী বিভক্ত। বন্য বনানী কড়ি কাঠ (timber), বনানী তেল (vegetable oil), ভেষজ দ্রব্য (drugs) প্রভৃতি পদার্থ উৎপাদনের জন্য যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার মানুষের খাদ্য হিসেবে চাষকৃত বনানী আরও অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ফসল বা চাষকৃত উদ্ভিদ স্থানীয় প্রাকৃতিক বনানীর বংশধর বলে বিবেচনা করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এগুলো অন্য অঞ্চলের বনানী। উদাহরণ হিসেবে কমলালেবু গাছের বিষয় উল্লেখ

করা যায়। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বহনকারী অঞ্চলে এই ফলের গাছের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও গাছগুলো আদিতে এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশ হতে আনা হয়। প্রায় সকল চাষকৃত উদ্ভিদ সম্ভবত ছয় প্রধান এলাকায় উৎপত্তি লাভ করেছিল এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় এগুলোর বিস্তার ঘটে। এই প্রধান এলাকাগুলো হচ্ছে : দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া, তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশ, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, ইথিওপিয়া, মেক্সিকো ও আন্দিজের দক্ষিণাংশ, চীনের উত্তরাংশ এবং পশ্চিম আফ্রিকা। মানুষ তাদের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে প্রায় ২,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের বিকাশ ঘটায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

এশিয়ার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশ হচ্ছে মানুষের অধিকাংশ চাষকৃত বনানীর প্রধান উৎসস্থল। মানুষসহ তাদের সভ্যতার পশ্চিমাভিমুখী পরিযানের (migration) ফলে ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন এলাকায় উদ্ভিদগুলো বিস্তার লাভ করে। এই এলাকায় ইউরোপীয়গণ নির্বাচন, রোপণ কার্যক্রমের সাহায্যে চাষকৃত উদ্ভিদ ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। নতুন ভূমি আবিষ্কৃত হওয়ার সময় এবং পরে (আবিষ্কার যুগ, পঞ্চদশ শতাব্দির শেষার্ধ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দি) ইউরোপীয়গণ চাষকৃত উদ্ভিদ পৃথিবীর প্রায় সকল অংশে বহন করে নিয়ে যায় এবং ফসল হিসেবে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। উদ্ভিদের এই বিস্তার একমুখী না হয়ে বিপরীতমুখীও হয়ে পড়ে। ফলে নতুন ভূখণ্ড হতে ভুট্টা, বাগানশুঁটি টমেটো, আলু, কোকো, তামাক এবং রাবার গাছ প্রাচ্য জগতে বিস্তার লাভ করে (মানচিত্র ৮.অ)।

মানুষের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ছড়িয়ে পড়ার (disseminated) ফলাফল, কেবল মানুষের খাবারের গুণাগুণ ও বিভিন্নতা বাড়ায়নি বরং কলকারখানার উৎপাদনের সম্পদের লভ্যতার ব্যাপকতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এ ছাড়া প্রজনন শাস্ত্রের জ্ঞান ও নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথেষ্ট গুণাগুণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ ফলনশীল সঙ্কর জাত ভুট্টার উদ্ভাবন ও এর চাষের মাধ্যমে একদিকে যেমন অত্যধিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি ভুট্টার চাষকৃত আয়তন কমানো সম্ভব হয়েছে।

মানুষ তার বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর উদ্ভিদ জগত ও উদ্ভিদ জীবনের রূপান্তর করতে পারলেও উদ্ভিদের প্রতিস্থাপক বস্তু আবিষ্কার করতে পারেনি। এজন্য এখনও মানুষ তার প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় পদার্থের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে।

উদ্ভিদের বহুবিধ (manifold) এবং অতি ব্যাপক পরিসরের ব্যবহার লক্ষণীয়। পলিউনিন উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহার পর্যালোচনা করে বস্তুগুলোকে সতেরটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—খাদ্য, পানীয় ও সুগন্ধযুক্ত আরোগ্যকর ও ভেষজ, চর্বিযুক্ত বা ঘন তেল ও মোম, ধুমপান পদার্থ, গঠন সংক্রান্ত ও আশ্রয়স্থলসংক্রান্ত বস্তু শিল্প কারখানার ব্যবহার্য পদার্থ ও নিষ্কর্ষ বা নির্যাস, পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য তন্তু জ্বালানি তরুক্ষীর ও তরু ক্ষরিত বস্তু (exudates), চর্মপাকা করা ও রঞ্জন কাজের পদার্থ (Tanning and dyeing materials), অপরিহার্য তেল ও সুগন্ধি পদার্থ (essential oils and scents), কীটনাশক ও বস্তু আগাছানাশক বস্তু (Insecticides and herbicides), পরিবেশীয় ও বাস্তুসংস্থানীয় (Environmental and ecological), সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট ও শোভাময় (Aesthetic and ornamental), অণুজীব (Microorganisms) এবং শেষ পর্যায়ে কিছু উপদ্রব সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর বস্তু (finally, some nuisances)।

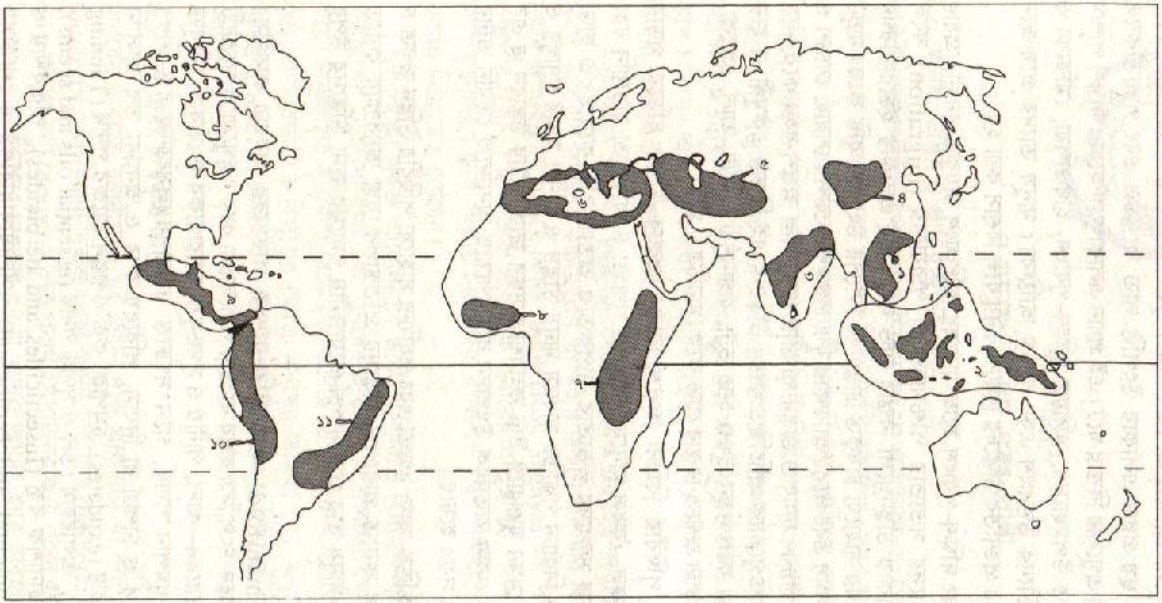

মানচিত্র ৮.৩ : উদ্ভিদ ফসল (Plant commodities) এবং এই ফসলগুলোর উৎস অঞ্চল : (after J.E. Spencer and W.L. Thomas)
১. উত্তর পূর্ব এশিয়া–লেবুজাতীয় ফল কলা, মিঠে আলু, ট্যারা, শুটি, ধান, চা, ২. ইক্ষু, ব্রেড ফল, মিঠে আলু, ট্যারো, নারকেল, কলা, শসা, ৩. ধান, জোয়ার বা ভুট্টা, সরগাম, মটর, আম, কেপক, পাট ; ৪. জোয়ার, লাউ, কোলা বাদাম, তেল উৎপাদী তালগাছ ; ৫. কোমল দানার গম, বার্লি, মসুর, জই, রাই, পেঁয়াজ, গাজর, শন , শন বা হেম্প, ডুমুর, আপেল, ৬. বার্লি, জই, আঙুর, জলপাই,, খেজুর, ক্যারোব, বিট, পিয়াজজাতীয় কন্দ, হরিদ্রাভ বর্ণ পুষ্প ও গাজরবৎ মূলের উদ্ভিদ, শতমূলী সবজি, লেটুস, সেলেরি, ৭. শক্ত দানাবিশিষ্ট গম, কলাইজতীয় গাছ, কফি, রেড়ি শুটি, তুলা ; ৮. ভুট্টা, মিষ্টি আলু, লাউজাতীয় সবজি, লঙ্কা, গোলমরিচ, অ্যাভোকাডো, আতা, ৯. সাদা অলু, টমেটো, কুমড়া, কুইনোয়া, পেঁপে, স্ট্রবেরি বা ক্ষুদ্র রসাল ফল, ১০. চিনাবাদাম, আনারস কাজু বাদাম, প্যাশন ফল, কেকো, তুলা, তামাক।

সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ভিদ ব্যবহার কার্যক্রমকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো :

১) মানুষের খাদ্য সামগ্রী (Human foodstaff) ; (২) প্রাণীর খাদ্য সামগ্রী ; (৩) শিল্প কল কারখানার কাঁচামাল ; (৪) রাসায়নিক পদার্থ ; (৫) নির্মাণ সামগ্রী (Constructional materials) ; (৬) জ্বালানি ; (৭) বাস্তুসংস্থানীয় ব্যবহার (Ecological uses) ; (৮) অণুজীব (Micro organisms) ; (৯) প্রযুক্তিগত ব্যবহার (Technological uses) এবং (১০) সৌন্দর্য বোধবিশিষ্ট ব্যবহার (Aesthetic uses)।

এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদ ব্যবহারের (Plant uses) শ্রেণী বিভাগগুলো যেমন অপরিবর্তনীয় বিধিবদ্ধ/বাঁধাধরা পদ্ধতি নয় তেমনি এক শ্রেণী অপর শ্রেণী হতে স্বতন্ত্রও (Exclusive) নয়।

৮.২. মানুষের খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ

মানুষের খাদ্য তালিকা হতে এক অপরিহার্য উপাদান লবণ বাদ দিলে খাদ্যের প্রতি উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বনানী হতে আসে। ধারণা করা হয়, কোনো না কোনো সময়ে মানুষ খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ এমনকি প্রাণীর সকল অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। ফলে অনেক সময় তারা অসুস্থ হয়েও পড়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়। আশ্চর্যজনক হলেও এটা সত্য যে, মানুষের খাদ্য–স্বাদ ও খাদ্য নির্বাচনের সর্বজনীনতা বিদ্যমান। শামুক (Snails), কন্দজাতীয় ছত্রাক মসলা (Truffles), বিচি ডি মার (Biche de mer), সাগর শৈবাল (Sea weed), পাখির বাসার সুরুয়া (Bird's nest soup), ছত্রাক ও ভুঁইফোড় (সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষের লবণে জারিত রুচিকর ডিম), মাশরুম ও ক্যাভিয়ার (Mushroom and caviar) প্রভৃতি খাদ্য বস্তুগুলো আশ্চর্যজনক ও উদ্ভট হলেও একঘেঁয়ে বা নিরস (humdrum) খাবার রুটি, আলু, শুঁটি, মাছ এবং মাংসের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় মানুষের খাদ্যে পরিণত হয়।

মানুষ খাদ্য হিসেবে প্রধানত শর্করাজাতীয় ও অন্যান্য শক্তি যোগানকারী পদার্থ উদ্ভিদ হতে পেয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে ফসল দানা ও ফসলজাতীয় উদ্ভিদের শিকড় বা মাটির অভ্যন্তরের অংশ এই দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দানাশস্য বলতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গম, বার্লি, ওট বা জই, রাই, বাকহুইট (Buck wheat) ও কুইনোয়া (Quinoa) এবং উষ্ণ অঞ্চলের ধান, ভুট্টা, সরগাম, ও জোয়ার (Millet) বোঝায়। দানা শস্য হচ্ছে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ষিত প্রজাতির ঘাস। প্রায় ৭,০০০ বছর পূর্বে নব্য প্রস্তরযুগীয় বিপ্লবের (Neolithic revolution) সময় ফসল চাষের যে কৌশল প্রবর্তিত হয় সে সময় হতে দানা শস্য প্রায় সমগ্র মানবকুলের প্রধান খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। প্রধান দানা শস্যগুলো হচ্ছে গম ও ধান। ভুট্টা ও জোয়ার এদিক দিয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই। গম, ধান ও রাই প্রধানত মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং ভুট্টা, বার্লি ও ওট শিশু খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শ্বেতসারজাতীয় দানা শস্য হতে বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে গম প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। গমের অনেক প্রজাতি বিদ্যমান। শত শত শ্রেণী গমের গণ হচ্ছে *Tritichum*। উচ্চমানের খাদ্যপ্রাণ, উত্তম মানের রুটি উৎপাদন, সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণ এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে চাষের বৈশিষ্ট্যের কারণে দানা শস্য

উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন জলবায়ু ও মৃত্তিকায় অভিযোজন করাও সম্ভব হয়েছে। এজন্য ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, মহাদেশীয় তৃণভূমি এলাকা এবং শীতকালীন ফসল ক্রান্তীয় জলবায়ু এলাকায়ও গম চাষ করা সম্ভব হয়েছে। ত্বরিত পূর্ণতাপ্রাপ্তি, রোগ বালাই নিরোধক এবং অনুর্বর ও শুষ্ক মৃত্তিকার চাষ উপযোগী গমের উদ্ভাবন এই দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও শক্ত দানার গম এবং কোমল দানার গমের নাম উল্লেখ্য।

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল। ধানের উচ্চ হারের উৎপাদন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক শ্রমিকের প্রয়োজনের কারণে এই ফসল এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলে পৃথিবীর স্থলভাগের মোট আয়তনের ১০% এবং মোট জনসংখ্যার ৪০% বিদ্যমান। পৃথিবীর ধানের উৎপাদনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এই অঞ্চলে উৎপাদিত হলেও অন্য অঞ্চলেও কিছু কিছু ধান উৎপাদিত হয়। চাল হতে আটা তৈরি করা গেলেও রুটি তৈরির ক্ষেত্রে এই আটা উপযুক্ত নয়। তাই এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ চালকে ভাতে (boiled rice) পরিণত করে। অনেক সময় উপাদেয় খাদ্যের জন্য ভাতের সাথে যৎকিঞ্চিত (morsels) মাংস, চিংড়ি মাছ, ডিম প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। প্রচলিত খোসামুক্ত ধান অর্থাৎ চালে ভিটামিনের অপ্রতুলতা প্রকাশ পায় যদিও এতে উচ্চমানের শর্করাজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। গমের অনুরূপ ধান গাছ তৃণ গোত্রের উদ্ভিদের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ধান ভিন্ন প্রকৃতির জলবায়ু ও মৃত্তিকা অঞ্চলে জন্মে থাকে। প্রধান দুই শ্রেণীর ধান হচ্ছে (ক) বারবার সংঘটনের পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতবিশিষ্ট পাহাড়ীয় ঢাল এলাকার উচ্চভূমির ধান এবং (খ) স্বাভাবিক বন্যা কবলিত বা কখনো কখনো সেচাধীন সমতল ভূমির নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান। শেষোক্ত ধান সিক্ত ধান নামেও পরিচিত এবং এর মোট উৎপাদন সর্বাধিক।

অন্যান্য প্রধান খাদ্যের ফসল শিকড় বা কন্দজাত ফসলের অন্তর্গত। সাদা বা আইরিস আলু, মিষ্টি আলু, মিঠে আলু (Yams), ম্যানিওক (Manioc) এবং ট্যারো হচ্ছে এই শ্রেণীর খাদ্যের ফসল। আইরিস আলু *(Solanum tuberosum)* দক্ষিণ আমেরিকার আদি ফসল। ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপে এর চাষ আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই আলু ইউরোপ, সিআইএস এবং উত্তর আমেরিকায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। অন্যান্য কন্দজাতীয় ফসল বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মে থাকে এবং এগুলো এসব এলাকার লোকের প্রধান খাবার। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক এলাকায় এগুলো দানা শস্যের পরিবর্তে যেমন চাষ করা হয় তেমনি আবার এটা অন্য এলাকায় সম্পূরক ফসল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ জাতীয় ফসল অতি সহজে চাষ করা যায়। কিন্তু এ শ্রেণীর শর্করাজাতীয় খাদ্য দানা শস্যের শর্করাজাতীয় খাবার অপেক্ষা কম পুষ্টিকর।

সাধারণ আলু বর্তমানে পৃথিবীর প্রতি দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় ইউরোপে আলু ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় এবং এ অঞ্চলদ্বয়ে এটা প্রধান খাদ্য হিসেবেও চিহ্নিত। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আলু উৎপাদিত হয়। উপযুক্ত পরিবেশে প্রতি একরে অন্য যে কোনো দানা শস্য অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ার কারণে বর্ণিত অঞ্চলে আলু ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। অধিকাংশ আলু মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইউরোপের কোনো কোনো স্থানে ৪০% আলু পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আলু হতে শর্করাজাতীয় খাদ্য, গ্লুকোজ, শিল্প সুরা এবং পানযোগ্য বা পেয় স্পিরিট উৎপাদিত হয়।

মিষ্টি আলু সাধারণ আলুর অনুরূপ ব্যবহৃত হয়। এর চাষ ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার পূর্বাংশের এলাকাবিশেষে শুষ্ক ঋতুতে পানি সেচের মাধ্যমে এই আলুর চাষ করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে নারিকেল ও মাছসহ এ আলু লোকজনদের প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত।

ইয়াম (Yam) হচ্ছে ডায়োসকোরিজাতীয় (Dioscorea) বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির দুগ্ধব্যৎ ভোজ্য কন্দ। এগুলো ক্ষুদ্র ঝোপ আকারে আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মে থাকে। প্রায় ২০০ প্রজাতির অধিক ইয়াম চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভবত, কমপক্ষে ২,০০০ বছর পূর্বে এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশে এর চাষ আরম্ভ হয়। প্রায় সকল ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর ইয়ামের চাষ করা হয়। স্থায়ী (sedentary) এবং স্থান পরিবর্তনশীল জীবিকা নির্বাহী কৃষকের দ্বারা প্রাচীন পদ্ধতিতে ইয়াম চাষ লক্ষণীয়। ইয়াম আলুর অনুরূপ সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে খাওয়ার পদ্ধতি বিদ্যমান।

কন্দজাতীয় উদ্ভিদ, ম্যানিওক (manioc) ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে চাষ করা হয় এবং এখানে ব্যাপকভাবে খাদ্য হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রক্রান্তীয় আফ্রিকা ও নিরক্ষীয় এশিয়ায়ও এর চাষ করা হয়। মিষ্টি ম্যানিওকের কন্দ কাঁচা অথবা আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়া হয়। তিক্ত (bitter) ম্যানিওকে হাইড্রসাইঅ্যানিক এসিড (Prusic acid) বিদ্যমান থাকে। খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের পূর্বে এই প্রকার ম্যানিওকের এই এসিডমুক্ত (extracted) করা প্রয়োজন। শুষ্ক ম্যানিওকের ময়দা কাসাভা (*Cassava*) নামে পরিচিত। এই ময়দা হতে ট্যাপিওকা (*Tapioca*) তৈরি হয়।

ট্যারো (*Taro*) কলোক্যাসিয়া (*Colocasia*) বর্গের অন্তর্গত বনানী। ট্যারোর কন্দের চূর্ণকৃত ও গাঁজান পদ্ধতির দ্বারা শর্করা খাদ্য (starchy food), পোই (Poi) তৈরি করা হয়। পলিনেশীয়দের এটা প্রধান খাদ্য। এর প্রথম চাষ এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশে আরম্ভ হয় এবং পরবর্তীকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে বিস্তার লাভ করে।

খাদ্য হিসেবে সবজি হচ্ছে শাকজাতীয় গাছের কন্দ—যেমন গাঁজর, পার্সনিপ (Parsnips), শালগম বা ওলগম (Turnip), সুইড (Swedes—swidish turnips), ম্যানগোল্ড (Mangolds) এবং শুঁটি। খাবার হিসেবে সবুজ শাক যেমন বাঁধাকপির (Cabbage) গোত্র {যেমন ফুলকপি, কুঞ্চিত পাতার বাঁধাকপি, কেলী, ক্ষুদ্র বাঁধাকপি, সেলেরি (Celery), লেটুস এবং এনডিভের (Endive) প্রচলন বিদ্যমান। শিম গোত্রের বিভিন্ন ফসলের সাধারণ নাম ডাল। মটর, শুঁটি, মশুর, চিনাবাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি এই গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শুঁটিজাতীয় ফসল ব্যাপকধর্মী জলবায়ু অঞ্চলে জন্মানো যায়।

খাদ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ফলগাছ চাষ করা হয়। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফলকে তিন শ্রেণীর বিভক্ত করা হয়েছে : (১) পাতাঝরা গাছের ফল (Deciduous fruits) যেমন—পোম (Pome) ফল যথা আপেল, নাশপাতি ও কুইন্স (eg. apples, pears and quinces), বীচিযুক্ত ফল (stone fruits)—যেমন চেরি, কুল, অ্যাপ্রিকট, জামজাতীয় ফল বা পিস (eg. cherris, plums, apricots and peaches) এবং বীচিশূন্য রসালো ফল ; যেমন বৈচিজাতীয় ফল, জামজাতীয় ফল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বীচিশূন্য আঙুর (goose berries, black berries and the various currants) ; (২) উপক্রান্তীয় ও উষ্ণ দেশীয় ফল—লেবুজাতীয়

ফল–অলিভ, ডমুর, দাড়িম্ব, লিচু, খেজুর ইত্যাদি এবং (৩) ক্রান্তীয় ফল যেমন—কলা, আনারস, আম, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি। ফলতুল্য ফসল হচ্ছে বাদাম, যেগুলোর অধিকাংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন (কাগজী) বাদাম, (Almonds), আখরোট (Walnuts), হেজেলনাট (Hazelnuts), ব্রাজিল নাট (Brazil nuts), চেস্ট নাট (Chest nut) এবং কাজু বাদাম (Cashew nut)।

কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর বনানী হতে খাবার তৈরি করা হয়। শেওলাজাতীয় বনানী যেমন ভক্ষণযোগ্য কেলপ ও ল্যাভরস্ এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো প্রাচ্যে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আগর (জেলির অনুরূপ) লাল শৈবাল হতে নিষ্কর্ষিত পদার্থ অনেক খাবার যেমন—জেলি, ব্ল্যাঙ্ক–ম্যাংগে (Blancmange), আইসক্রিম এবং পুডিং তৈরি করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু ছত্রাক যেমন মাশরুম ও ট্রাফল (Mushrooms and truffles) খাদ্য হিসেবে এবং কিছু সংখ্যক ছত্রাক মাখন তৈরি করতে সাহায্য করে।

চা, কফি, কোকো এবং ইয়ারবা মেইট (Yerba mate) হচ্ছে পানীয় ফসল। এগুলো ক্রান্তীয় অথবা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। সুদূর অতীতকাল হতে চীনে চা–চাষ এবং চায়ের ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত উপমহাদেশ–ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ পৃথিবীর সম্পূর্ণ চা সরবরাহকারী দেশ। ইথিওপিয়ার পশ্চিম কাফফা প্রদেশে সর্বপ্রথম কফির চাষ আরম্ভ হয় এবং প্রদেশটির নাম হতে এই পানীয়ের নামকরণ করা হয়। এই এলাকার ইয়েমেন এবং আরও কয়েকশত বছর পর মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় কফি চাষ শুরু হয়। পৃথিবীর প্রায় সম্পূর্ণ কফিই এই অঞ্চলে চাষ করা হয়। অন্যদিকে কোকোর আদি স্থান ছিল দক্ষিণ আমেরিকা। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ কফির চাষ আফ্রিকায় বিদ্যমান। কিছু পরিমাণ কফি পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ কফি চকোলেট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। ইয়ারবা মেইট প্যারাগুয়ে চা নামে পরিচিত। এটা হোলির (Holly) প্রজাতি ইলেক্স প্যারাগুয়েনসিস (*Paraguainsis*) নামক ক্ষুদ্র গাছের পাতা থেকে উৎপাদিত হয়। স্থানীয় অন্যান্য পানীয় হচ্ছে উত্তর আফ্রিকায় প্রচলিত খাট (Khat) (এটি কখনও কখনও অ্যারাবিয়ান চা নামেও পরিচিত), ক্যাসিনি (Cassine) চায়ের অনুরূপ উত্তর আমেরিকার পানীয় এবং ইয়োকো (Yoko) দক্ষিণ আমেরিকার এক বিশেষ শ্রেণীর গাছের বল্কল হতে তৈরি করা হয়। অসংখ্য শ্রেণীর কোমল পানীয় ফলের রস বা বনানীর নির্যাস হতে তৈরি হয়। কোলা (Cola), আদামিশ্রিত পানীয় মেনথল (peppermint) এবং সারসাপারিলা (sarsaparilla) কোমল পানীয় এর মধ্যে অন্যতম।

সুরাজাতীয় পানীয় দুই গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (ক) গাঁজানো এবং (খ) চোলাইজাতীয়। আঙুর হতে মদ এবং প্রধানত বার্লি ও হোপ (hop) থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিয়ার হচ্ছে গাঁজানো পানীয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সুরা তৈরির ক্ষেত্রে মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রকাশ পায়। এজন্য সিডার (Cider) আপেল হতে, সেক (Sake) ভাত হতে এবং সিকা (Chicha) ভুট্টা হতে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। চোলাইজাতীয় সুরা হচ্ছে হুইস্কি, জিন, ভোদকা এবং লিকুয়ের।

মসলা, কাসুন্দি (Condiments), সুগন্ধসার (Essences) এবং অনুরূপ অসংখ্য উদ্ভিদ উৎসারিত পদার্থ মানুষের খাদ্যের সাথে সংযুক্ত। এগুলো হচ্ছে রুচিকর সুগন্ধপূর্ণ পদার্থ সাধারণত এগুলো সৌরভযুক্ত উপাদান যেগুলো ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় উদ্ভিদের পাতা, ফুল, বীজ, ছাল এবং শিকড় হতে তৈরি করা হয়। এগুলো সাধারণত রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৮.৩. প্রাণীর খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ

ঘাস, ক্লোভার (clovers) ও আলফালফা মানুষের গৃহপালিত পশুর প্রধান খাদ্য। প্রকৃতি প্রদত্ত উদ্ভিদ হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্য। পুরাকালে মানুষের গৃহপালিত জন্তু-গরু, মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি সমভূমি অথবা উদ্ভিদভূমির প্রকৃতি প্রদত্ত ঘাসের উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অত্যধিক পুষ্টিকর কর্ষিত ঘাস মানুষ উদ্ভাবন করে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক এলাকায় প্রাকৃতিক ঘাস পরিবর্তিত করে আমদানিকৃত প্রজাতির ঘাসের সাহায্যে তৃণভূমি তৈরি করা হয়েছে। নর্থ আইল্যান্ডের (নিউজিল্যান্ড) দেশীয় ঘাসের তৃণভূমি বলা চলে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। ইংল্যান্ড হতে আমদানিকৃত ঘাস দেশী ঘাসের তৃণভূমি এলাকা এবং বন পরিত্যক্ত এলাকায় বপন করা হয়েছে। এই বপন তৃণভূমিগুলো রাই ঘাস (Rye grass), পাসপালাম (Paspalum), ক্লোভার প্রভৃতি ঘাস পর্যাবৃত্ত বপন দ্বারা রক্ষা করা হচ্ছে।

প্রায় সকল চাষকৃত ঘাস বা তৃণ যেগুলো দানা শস্য তৈরি করে, সেগুলো পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টা বা ভারতীয় কর্ন (*Zea mays*) মানুষের খাদ্য অপেক্ষা পশু খাদ্য হিসেবে অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয় যদিও দরিদ্র দেশের লোকদের এটা প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভুট্টা হচ্ছে অতি উন্নতমানের পশু খাদ্য। গবাদি পশু ও শূকর মোটা তাজা করার সময় এটা ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাদ্য হিসেবে ওটের ব্যবহার অত্যন্ত কম। বেশির ভাগ ওট গৃহপালিত গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গম, বার্লি ও রাই গবাদির খাদ্য ফরেজ ফসল হিসেবে চিহ্নিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন শ্রেণীর সরগাম পশু খাদ্য হিসেবে উৎপাদন করা হয়। মানুষের জন্য তৃণ গোত্রের উদ্ভিদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করে।

গবাদি পশুর খাদ্য তৃণের পরের স্থান হচ্ছে শুঁটিজাতীয় গাছ। শুঁটিজাতীয় ফসলের শিম (Beans) ; মটর শুঁটি, খেসারি (Chick peas) এবং মসুর মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জাতীয় অনেক ফসল ফোরেজ গাছ হিসেবে গবাদির খাদ্যের জন্যও চাষ করা হয়। এগুলোর মধ্যে আলফালফা (Alfalfa—*Medicago sativa*) হচ্ছে প্রধান। ব্যাপক ব্যতিক্রমধর্মী তাপ ও আর্দ্রতাবিশিষ্ট অঞ্চলে আলফা আলফার চাষ করা সম্ভব। অন্যান্য শুঁটিজাতীয় ফসল যেমন— ক্লোভার (Clover), ভেচ (Vetches), লেসপেডিজাস (Lespedezas), ও কুডজু (Kudzu) পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দমূলবিশিষ্ট সবজিজাতীয় ফসল গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। কপি গোত্রের ফসল, কেলি (Kale) ইউরোপে ব্যাপকভাবে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শালগম (Turnips), ম্যানগোল্ড (Mangold) ও সুইড (Swedes) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশুখাদ্য। আলু বিশেষ করে শূকরের প্রধান খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত।

৮.৪. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে উদ্ভিদ

উদ্ভিদ রাজ্য কলকারখানা ও শিল্প প্রক্রিয়াজাত বস্তুর জন্য মানুষকে বহুবিধ কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। এই কাঁচামালের সংখ্যা এত ব্যাপক ও বহুবিধ যে এগুলোর তালিকা ও বর্ণনা দেয়া প্রায় অসম্ভব। প্রধান প্রধান কাঁচামালামাল হচ্ছে তন্তুজাতীয় ফসল, তেল ও ক্রিয়াজাত শাকসবজি, রাবার এবং তামাক। মানুষের খাদ্য ফসলের অনেক দানা শস্য এবং শাকসবজিও শিল্পজ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার দানা শস্যের খড় ও ভূষি

(যেমন—ভুট্টা, গম, ধান ইত্যাদি) অনেক জিনিসপত্র তৈরি করতে সাহায্য করে। আঠালো পদার্থ, কৃত্রিম আঁশ, কাঠ-কয়লা, শস্য শ্বেতসার, স্থিতিস্থাপক দ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ, জ্বালানি দ্রব্য, ছাতা (moulds) জন্মানোর জন্য পুষ্টিকর দ্রব, প্যাকেটকরণ বস্তু কাগজ, পেস্টবোর্ড (pasteboard), প্লাস্টিক, শিল্প সুরা, দ্রাবক পদার্থ, শিল্পোৎপাদনের জন্য সাইলেজ ও সাইজিং প্রক্রিয়াজাত বস্তু, বর্ণিত খড় ও ভূষি হতে উৎপাদিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ হতে তন্তু উৎপাদিত হয়। এই বয়ন কাজ, দড়ি ও রজ্জু অথবা প্যাক ও প্যাকেট পূর্ণকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়। তুলা, শণ এবং পাট প্রধান তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে অন্যতম। সকল তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রাচীন তন্তু হচ্ছে তুলা। *Gossypium* গণের অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ তুলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশী প্রজাতি বিদ্যমান। উভয় এলাকায় অতি প্রাচীনকালে তুলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তুলা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

বয়ন কাজের ক্ষেত্রে শন অতি পুরাতন না হলেও ব্যবহারের দিক দিয়ে এটা অতি প্রাচীন এবং এটা ইউরোপীয় নব্য প্রস্তরযুগীয় অধিবাসীগণ এবং প্রাচীন মিসরীয়গণ ব্যবহার করতো। শণের তন্তু তুলার তন্তু অপেক্ষা শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হলেও এই তন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও তন্তুর সাহায্যে লিনেল উৎপাদন বেশ কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এজন্য এটা বয়ন কার্যে তুলা অপেক্ষা কম ব্যবহৃত হয়। শণ উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। উন্নতমানের তন্তু বহনকারী শণ নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। কিন্তু বীজ উৎপাদনের জন্য উষ্ণতর অক্ষাংশ অঞ্চলে শণ চাষ করা হয়।

Chorchorus গণের পাট গাছ নলখাগড়াজাতীয় লম্বা বনানী। পাটগাছের দেহের তন্তু মোটা বা স্থূল আর্দ্রক্রান্তীয় পলল সমভূমির ফসল হচ্ছে পাট। পাটের তন্তু হতে চট, বস্তা, কার্পেট ও মোটাসুতা বা মিহিরজ্জু (sacks, bags, carpets and twin) তৈরি হয়। কেনাফ অন্য এক প্রকার তন্তুজাতীয় ফসল এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা পাটের প্রতিস্থাপক ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। তন্তুজাতীয় অন্য এক গ্রুপের ফসল হচ্ছে শণ। প্রধানত কোমল আঁশের তন্তু শণ এবং ক্রান্তীয় শক্ত তন্তুর শণে এই ফসলকে বিভক্ত করা হয়। শেষের শণকে বাস্তবে শন হিসেবে গণ্য করা যায় না। দুই প্রজাতির শণ এক প্রজাতি ইউরোপ এবং অন্যটি কখন কখনও সানহেম্প (sunnhemp) নামে পরিচিত। প্রধানত ভারত এবং চীনে চাষ করা হয়। শণের তন্তু হতে রজ্জু, দড়ি, মোটা বস্ত্র ও ক্যানভাস (Rope, cordage, coarse fabrics and canvas) উৎপাদিত/তৈরি হয়। এশিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে হেম্প নেশাজাতীয় ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। কারণ এই ফসল হতে ভাং, ম্যারিজুয়ানা ও হাশিস (Cannabis, marijuana and hashish) উৎপাদিত হয়।

আবাকা (Abaca) অথবা ম্যানিলা হেম্প (Manilahemp), হেনেকুইন (henequen) এবং সিসাল (Sisal) শক্ত আঁশের ফসল নামে পরিচিত। এগুলোর তন্তুর দ্বারা দড়িদাড়া এবং মাদুর তৈরি হয়। তন্তু ফসলের শক্ত আঁশের পাতা হতে তন্তু তৈরি করা হয়। কিন্তু শণ, পাট ও তিসি গাছের ছাল হতে তন্তু উৎপাদিত হয়। কলা গোত্রের উদ্ভিদ হচ্ছে আবাকা। এই উদ্ভিদ হতে বলিষ্ঠ শক্ত ও সমুদ্রের পানির ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত তন্তু উৎপাদিত হয়। এই তন্তু প্রধানত জাহাজের কাছি বা রজ্জু (hawsers) তৈরির জন্য উপযুক্ত। কেন্দ্রীয় আমেরিকায় দেশজ বা স্থানীয় অ্যাগেভ প্রজাতির হেনেকুয়েন ও সিসাল হতে অনুরূপ বস্তু উৎপাদিত হয়।

বর্ণিত তন্তুজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও কম গুরুত্বপূর্ণ তৃণ ও উদ্ভিদ শ্রেণীর ফসল হচ্ছে র‍্যামি বা চীনা ঘাস মালাগাছির তালজাতীয় গাছ, রাফিয়া (Raffia palm), ফোরমিয়াম বা নিউজিল্যান্ড ফ্ল্যাক্স সিল্কের অনুরূপ তুলাগাছ সদৃশ (*Eriodendron aufractuosum*). কাপোক বা ভেজিটেবল ডাউন (Kapok or vegetable down), নারকেল এবং এসপার্টো তৃণ উত্তর আমেরিকায় শেষের তৃণ আলফা নামে পরিচিত।

বিংশ শতাব্দির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উৎপাদন বস্তু এবং ব্যবসা বনানী তেলের সাথে জড়িত। এই গুরুত্বের কারণগুলো হচ্ছে (ক) লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও পশু চর্বির স্বল্প সরবরাহ (খ) উদ্ভিদ তেলের ব্যবহারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং (গ) উদ্ভিদ তেল নিষ্কাশন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন। মাখনের বদলি মারজারাইন এবং সাবান তৈরির শিল্প কারখানার দ্রুত পরিবর্ধন উদ্ভিদ তেল উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছে। এটা ছাড়াও রঞ্জন পদার্থ বার্নিশ, পিচ্ছিলকারী তেল এবং প্ল্যাস্টিকের ক্ষেত্রেও এই তেলের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উদ্ভিদ তেল ফল বাদামজাতীয় ফসল বীজ এমনকি কিছু উদ্ভিদের শিকড় হতেও নিষ্কাশন করা হয়। তেল উৎপাদনকারী প্রধান ফসল বা গাছ হচ্ছে চীনাবাদাম, তেল উৎপাদিত তালজাতীয় গাছ নারিকেল গাছ, বাবাছু তালজাতীয় গাছ (Babassu palm), অলিভ, সয়াবিন, ফ্ল্যাক্স, তুলা, সরিষা, সিসাম (Sesame), সূর্যমুখী এবং টাংগাছ (Tung-tree)।

বিভিন্ন উদ্ভিদ হতে অপরিহার্য ও উদ্বায়ী তেল উৎপাদিত হয়। এগুলো ওষুধ, সুগন্ধি উৎপাদন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ ও পোকামাকড় বিতাড়ক এবং রুচিকর সুগন্ধপূর্ণ উপাদান তৈরি করতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর তেলের উদাহরণ হচ্ছে গোলাপ আতর, ল্যাভেনডার তেল, লেমন গ্রাস তেল, সিট্রোনেলা তেল (oil of citronella) এবং কর্পুর তেল (Camphor oil)।

বর্তমানে পৃথিবীর এক প্রধান কৌশলী পদার্থ (strategic material) হচ্ছে রাবার। রাবারের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এটা এক অপরিহার্য কাঁচামাল হিসেবে চিহ্নিত। রাবারের গুরুত্ব বিশেষ করে মটর গাড়ি নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রতিফলিত হয়। প্রধানত *Hevea brasiliensis* গাছের আঠা প্রক্রিয়াজাত করে রাবার তৈরি করা হয়। আমাজানের আদি এই গাছ এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। গুয়াইউল গুল্ম (guayule shrub), ল্যান্ডোলফিয়া দ্রাক্ষালতার (Landolphia vines) কিছু প্রজাতি এবং রাশিয়ান ডানডেলিয়ন বা কোক সাঘিজের আঠা হতেও রাবার উৎপাদিত হয়। একই পদার্থ অর্থাৎ রাবারের অনুরূপ পদার্থ হচ্ছে বালাটা (Balata)। এটা *Mimusops balata* উদ্ভিদ হতে সংগৃহীত হয় এবং বালাটা হতে শিল্প কারখানার বেল্ট উৎপাদন করা হয়। রাবারতুল্য পদার্থ গাট্টা-পারচা রাবারের প্রতিস্থাপক পদার্থ হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ান অঞ্চলের এক শ্রেণীর উদ্ভিদ হতে গাট্টা-পারচা তরুক্ষীর পাওয়া যায়। গাট্টা পারচা প্রধানত বৈদ্যুতিক আস্তরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল তামাকের উদ্ভিদ প্রজাতি হচ্ছে *Nicotiana tabacum*। চিনি উৎপাদনের ফসল হচ্ছে আঁখ। ঘাসজাতীয় প্রজাতির এই বহু বর্ষজীবী ফসল ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে চাষ করা হয়। বিট হতেও চিনি উৎপাদিত হয় এবং এটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। কুয়েব্রাকো এবং ওয়াটল (Quebracho and wattle)

হতে ট্যানিন উৎপাদন করা হয়। এই ট্যানিন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কারনোবা তালজাতীয় গাছ (Carnauba palm) হতে এক প্রকার মোম উৎপাদন করা হয়। এই মোমজাতীয় পদার্থ দিয়ে গ্রামোফনের রেকর্ড তৈরি হয়। পাইরেথ্রাম উদ্ভিদ হতে কীটনাশক ওষুধ তৈরি করা হয়।

ওষুধ তৈরির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ দীর্ঘকাল থেকে উদ্ভিদ ব্যবহার করে আসছে। সাক্ষ্য প্রমাণ হতে প্রতীয়মান যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষ প্রাচীনকালে যন্ত্রণা ও রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য উদ্ভিদ ও বনানী পদার্থ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ব করেছিল। মধ্যযুগীয় ভেষজ গুণ-চর্চা ব্যক্তিবর্গের (Herbalist) উদ্ভিদ ব্যবহারের প্রাচীন অনেক কলাকৌশল দ্বারা যন্ত্রণা ও রোগমুক্তি সৃষ্টিকর্তার দান এবং অনুমান প্রসূতমন্ত্রের (Guess work) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে বিশ্বাস করা হতো। আধুনিক ওষুধবিজ্ঞান (Pharmacology) হতে জানা যায় যে, এসব অনেক বনানী হতে প্রাপ্ত উৎপাদিত পদার্থের ওষুধের গুণাগুণ অত্যধিক।

নেশাজাতীয় পদার্থ, যন্ত্রণা অবসাদনাশক ও অপ-অবসাদনাশক পদার্থ, উত্তেজক, প্রশান্তিদায়ক রেচক ও বমোনেন্দ্ররোধক (Painkillers, depressants, anti-depressants, stimulants and sedatives, along with emetics, purgatives) ইত্যাদি পদার্থ উদ্ভিদের ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড এবং শিকড় হতে সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত ওষুধ ও নেশাজাতীয় পদার্থের তালিকা অতি দীর্ঘ। এজন্য এখানে ব্যাপক আলোচনার পরিবর্তে কিছু সংখ্যক এই জাতীয় পদার্থের উদ্ধৃতি দেয়া হলো। *Opium* বিভিন্ন পপিজাতীয় বনানী হতে সংগৃহীত হয়। এতে মরফিন ও কোডাইনের উপক্ষার (Alkaloids morphine and wdeine) থাকে—যেগুলো যন্ত্রণানাশক ও বমন হ্রাসক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *Opium* মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই ব্যবহার ঐতিহাসিক উষালগ্ন কাল থেকে চলে আসছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশীয় কোকা উদ্ভিদের (Coca plant or *Erythroxylon coca*) পাতায় কোকেন (Cocaine) বিদ্যমান। এই গাছের পাতা চর্বণ করার ফলে ক্ষুধা ও শারীরিক শ্রান্তি লাঘব হওয়ার কারণে অ্যান্ডিন ইন্ডিয়ানগণ (Andean Indians) ব্যাপকভাবে এই পাতা চর্বণ করে থাকে। আধুনিক ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ওষুধ সংশ্লেষণ করার পূর্বে কুইনাইন বা সিঙ্কোনা গাছের ছালের উপক্ষার ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক হিসেবে (combat) ব্যবহৃত হয়। সিঙ্কোনা গাছ দক্ষিণ আমেরিকার দেশীয় গাছ। চাল মুংগ্রা তেল এই গাছ হতে উৎপাদন করা হয় এবং এই তেল লেপ্রোসী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফলদায়ক ভূমিকা রাখে। কাসকারা (*Cascara*), ডিজিটালিন (*Digitalin*), সেন্না (*Senna*), লিকুয়োরিস (*Liquorice*), ইপেকাকুয়ানহা (*Ipecacuanha*), স্লিপারি এলম (*Slippery* elm), ইউক্যালিপটাস তেল (Eucalyptus oil) প্রভৃতি উদ্ভিদ হতে উৎপাদিত হয়।

বর্তমানে অনেক বিস্ময়কর ওষুধ যেমন পেনিসিলিন (*Penicillin*), স্ট্রেপটোমাইসিন (*Streptomycin*) প্রভৃতি অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিজ্জ, মোল্ড হতে উন্নয়ন করা হয়েছে।

৮.৫. গৃহনির্মাণ সামগ্রী (Constructional materials)

সভ্যতার উষালগ্ন হতে কড়িকাঠ ও অন্যান্য উদ্ভিদ বস্তু মানুষ গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং বহুবিধ আসবাবপত্র (*Artifootn*) তৈরির জন্য ব্যবহার করতো। জাহাজ স্বল্পভাগে ব্যবহৃত

যানবাহন, বাড়ি ও ব্রিজ, আসবাবপত্র এবং ডেগ-বাসন-কোসন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয় এবং এগুলোর ব্যবহার এখনও সহজ সরল মানব সমাজে লক্ষ্য করা যায়। গৃহ-কলকারখানা নির্মাণের কাঠামো এখনও কড়িকাঠের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, যদিও বর্তমান যুগের নির্মাণাধীন সামগ্রী হচ্ছে ইট, কংক্রিট, স্টিল এবং প্লাস্টিক। ভবিষ্যতে উদ্ভিদ পদার্থের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। পলিউনিনের উদ্ধৃতি হতে জানা যায় যে, প্রতি বছর ৬০০০,০০,০০০,০০০ ঘনফুট (১৭০ কোটি ঘনমিটার) কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদ্ভিদ প্রধানত জ্বালানি, নির্মাণ সামগ্রী, গহবর বা খনির খুঁটি বা অবলম্বন, দীর্ঘ খুঁটি, রেলপথের স্লিপার, কোমল মণ্ড এবং ট্যানিন নির্যাস উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়। জ্বালানির জন্য বর্তমানে মোট কাঠ উৎপাদনের ৪০% এবং অবশিষ্ট ৬০% শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কড়িকাঠ বা টিম্বার প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়—শক্ত কড়ি কাঠ ও নরম কড়ি কাঠ।

উত্তর গোলার্ধের সরলবর্গীয় বন প্রায় সকল কোমল কাঠের সরবরাহ অঞ্চল। কোমল কাঠের তিন চতুর্থাংশ শিল্পের টিম্বার এবং আসবাবপত্র ও মালামাল প্যাকিং এর বাক্স তৈরি প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। অতি স্বল্প পরিমাণে এই শ্রেণীর কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর কাঠ হালকা, দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে কাজ করার বৈশিষ্ট্য বহন করে। কোমল কাঠের ব্যাপক চাহিদা এবং এই চাহিদা পূরণার্থে অপেক্ষাকৃত সুগম্য সরলবর্গীয় বনের অংশবিশেষে সীমা লঙ্ঘনকর ব্যবহারের (extravagant exploitation) ফলে বন এলাকা ব্যাপক হ্রাস পেয়ে চলেছে। এজন্য বনায়ন কার্যক্রম এবং বন সংরক্ষণের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডে অপরিকল্পিত গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং বনায়ন কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

শক্ত কাঠের দুই-তৃতীয়াংশ জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হয়। যেসব দেশে শক্তি সম্পদ অপ্রতুল যেমন ব্রাজিলে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ ক্যাবিনেট কাঠ হিসেবে আসবাবপত্র ও নৌকা তৈরি, পোতাশ্রয় পাইল ও জাহাজ ডেক গেট ট্যানিন-নির্যাস উৎপাদন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ এই শক্ত শ্রেণীর কাঠের কাঠিন্য, দীর্ঘস্থায়ী, পানি প্রতিরোধ, সূক্ষ্ম আঁশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বহন করে। কয়লাজাত আলকাতরা হতে সস্তা খনিজ রঙ আবিষ্কারের পূর্বে এই শ্রেণীর কাঠ বর্ণিত রঙ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হত। প্রায় সকল শক্ত কাঠ ক্রান্তীয় অঞ্চলের গাছ সরবরাহ করে থাকে। মেহগনি, টিক, গ্রিনহার্ট এবং রোজউড (mahogany, teak, greenheart and rose wood) এই শ্রেণীর কাঠের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শক্ত কাঠের গাছ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক এলাকায় বাঁশ, তালজাতীয় গাছের পাতা এবং খড় বাড়ি-ঘর নির্মাণের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অনেক স্থানে বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ করে পাইপ এবং গৃহের জিনিসপত্র রাখার সামগ্রী যেমন ঝাঁকা, ঝুড়ি ইত্যাদি।

৮.৬. জ্বালানি হিসেবে উদ্ভিদ

তাপ, আলো এবং শক্তির (Heat, light and power) উৎপত্তি উদ্ভিদের সাথে জড়িত। জীবাশ্ম শক্তি–কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম উদ্ভিদ হতে সৃষ্ট। কাঠ অঙ্গার (Charcoal) শত শত বছর ধরে এক প্রধান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক দেশে এটা গৃহস্থালী কাজের (domestic) এক প্রধান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং এটা এখনও কিছু কিছু কারখানায় শক্তি সরবরাহের কাজ করে। বনানীর আংশিক রূপান্তরিত পদার্থ–পিট উত্তরাংশের অনেক শক্তি ঘাটতি দেশে গৃহ উত্তপ্ত করা ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখনও পিট ব্যবহার করা হচ্ছে। অঙ্গার গ্যাস (coal gas) এবং সম্ভবত প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপত্তি অতীতের বনানীর সাথে জড়িত ছিল। কিছু কিছু বনানীর তেল, আলো এবং ডিজেল ইঞ্জিনে শক্তি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রধান শক্তি কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের প্রতি ক্ষেত্রে। বাৎসরিক কোটি কোটি মেট্রিক টনের উৎপাদন ও ব্যবহার, বনানীর গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

৮.৭. বাস্তুসংস্থানীয় ব্যবহার

পরিবেশের উপর গাছপালার গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত উৎপাদিত পদার্থ স্থানীয় উদ্ভিদ হতে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়াজাত পদার্থের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সে জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা সম্ভব কি–না তার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কেবল উৎপাদিত পদার্থের জন্য নয় মানুষের খাদ্য সরবরাহ ও তাদের বসবাস অঞ্চলের জীব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাস্তুসংস্থানীয় (ecosystem) যেমন অ্যামাজোনিয়ার আন্দি–ইন্ডিয়ান অঞ্চলের পশু পালক (Pastoralists) এবং ল্যাপলান্ডের বল্গা হরিণের (Reindeer herder) জীবনযাত্রা, খাদ্য সরবরাহ এবং সামাজিক আচার আচরণের প্যাটার্ন অঞ্চলগুলোর বনানীর সাহায্যে গড়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক বনানীর সাহায্যে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুসংস্থানীয় কার্যক্রমে লক্ষ্য করা যায়। কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক বনানীর অপসারণ দুঃখজনক যেমন মৃত্তিকার ভৌম ফলাফল ক্ষয় বয়ে আনে। এক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৃত্তিকা বন্ধনকৃত উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনানীর রোপণ ও বপন মৃত্তিকার ক্ষয়কে রোধ করতে সাহায্য করে। বালিয়াড়ির অনুরূপ আলগা কণার সমন্বয়ের বালি মৃত্তিকা এলাকায় মাররাম (Marram) শ্রেণীর কণা বন্ধনকারী তৃণের ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য বর্ণিত শ্রেণীর ব্যবহার অনুপযোগী বালি মৃত্তিকাকে স্থিতিশীল মৃত্তিকায় পরিণত করা হচ্ছে। ভিন্ন প্রকৃতির বাস্তব্য প্রণালী সামুদ্রিক পাইন গাছের সারি তৈরি করে ফ্রান্সের ল্যান্ডেস জেলার উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ সমভূমি বায়ুবাহিত ধ্বংসকারী বালির আবরণের হাত রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্র হতে উদ্ধারকৃত নেদারল্যান্ডের নিম্নাঞ্চল (emnoldered land) মূল্যহীন হয়ে থাকত যদি না মৃত্তিকাকে জিপসামের ড্রেসিং এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘাসের দ্বারা লবণ হ্রাস বা মুক্ত করা না হতো।

বনানীর অন্যান্য বাস্তুসংস্থানীয় ব্যবহার বিদ্যমান। গাছ কেবল প্রাণীকে ছায়া প্রদান করে না বরং অন্যান্য ছায়া অনুরাগী বনানীকেও ছায়া দান করে সেসব বনানীকে ক্রমবিকাশে সাহায্য করে। কলা গাছের ছায়া সৃষ্টি করে প্রায় ক্ষেত্রেই কোকো বৃক্ষকে সূর্যরশ্মি হতে রক্ষা করা হয়। কোমল প্রকৃতির ফসলকে (delicate crops) রক্ষা করার জন্য গাছ দ্বারা আশ্রয় বলয় সৃষ্টি করার প্রচলন বিদ্যমান। রোম উপত্যকা অঞ্চলের মাইমোসা এবং অন্য ফুলের বাগানকে নিকটবর্তী পর্বত হতে আগত শীতল ও তীব্র মিস্ট্রাল বাত্যার (Cold, sharp blasts of mistral) ক্ষতিকারক ফলাফলকে ব্যাহত করার জন্য কৃষকেরা রেখাকারে গাছ এবং ঝোপ সৃষ্টি করে বায়ুপ্রবাহের গতিরোধক সৃষ্টি করেছে। ফলে এই বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে ফসলের ব্যাপক ধ্বংসলীলার ফলাফলকে কমানো সম্ভব হয়েছে।

৮.৮. অণুজীব

অণুজীব (Micro-organisms) হচ্ছে জীবন্ত বস্তু। নিম্নশ্রেণীর শৈবাল, নিম্নশ্রেণীর ছত্রাক (lower fungi), রোগ জীবাণু এবং সংক্রামক রোগের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস, পৃথিবীর সর্বত্র–বায়ু, পানি এবং মৃত্তিকায় বিদ্যমান রয়েছে। পোস্টগেটের মতে, "এই গ্রহের অণুজীবীয় বস্তুর মোট পরিমাণ ধারণাতীতভাবে ব্যাপক (incalculably large)। হিসাব করা হয়েছে যে, এর মোট পরিমাণ সকল জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মোট পরিমাণের পঁচিশ গুণ।" পৃথিবীতে উচ্চশ্রেণীর জীবাণুর অস্তিত্ব অণুজীবের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে উদ্ঘাটিত হয়েছে যে অণুজীবগুলো পৃথিবীর প্রাণরসায়নকে কার্যকর করে রেখেছে। অনেক সংখ্যক অণুজীব হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের উদ্ভিদ। নিম্নস্তরের শৈবাল এককোষী উদ্ভিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিম্নস্তরের ছত্রাক (মোল্ড, মিলডিউ, কাগজ প্রভৃতির গায়ে ক্ষয়কর ছাতা, রাস্ট বা উদ্ভিদের রোগবিশেষ) ; ছাতা এবং ইস্ট (Moulds, mildews, rusts and yeasts)} হচ্ছে বনানী এবং এই ছত্রাকের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে জীবাণু।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কিছু অণুজীব জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধ যেমন পেনিসিলিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন, যেমন মাখন ও তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঈস্টের সাহায্যে সেঁকা, চোলাই ও জীবাণু সৃষ্টির কার্যক্রম সমাধা করা হয়। বিভিন্ন পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অণুজীবের ভূমিকা বর্ণনাতীত। গাঁজানো, তন্তুজাতীয় ফসল পচানো, জৈব এসিড ও ভিটামিন উৎপাদন, চামড়া লোমমুক্তকরণ (hide dehairing), নাইট্রোজেন সংবন্ধন, নর্দমার ময়লা মুক্তকরণ, শোধন ও সংরক্ষণ (sewage, disposal, purification and preservation), রন্ধন ও সাইলেজ (cooking and silage) এবং অনুরূপ সকল কার্যক্রমের জন্য অণুজীব কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি, পলিউনিনের ভাষায় অণুজীব হচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত স্ক্যাভেনজার (scavengers)। এই ধাঙড়গুলো জীবন্ত পদার্থের পচন ও ভাঙনের সাহায্যে অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক অপরিহার্য পদার্থের সৃষ্টি করে। এই পদার্থগুলো জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং এগুলো আবার সাধারণ পুনঃবৃত্তাকার (general recycling) কার্যক্রমে প্রাপণীয় হয়।

অণুজীবের ইতিবাচক ভূমিকা ছাড়াও কিছু নেতিবাচক ভূমিকা বিদ্যমান। কিছু কিছু রোগবীজবাহী জীবাণু অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। এটা সৌভাগ্য যে, রোগ সৃষ্টিকারী বা রোগজীবাণুর সংখ্যা অন্যান্য অণুজীবের সংখ্যা অপেক্ষা অতি নগণ্য। যদিও লক্ষ্য করা গেছে যে, রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশে এই জীবাণুগুলো ভীতিকর পর্যায়ে রোগ ছড়ায়।

৮.৯. প্রযুক্তিগত ব্যবহার (Mechanical uses)

জীবভূগোলের এক নতুন দিগন্ত বনানী, খনিসম্পদ সঞ্চয় এলাকা নির্ণয়ের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির সমাবেশ লক্ষ্য করে কোল (cole) খনিজীভবন অঞ্চল (zones of mineralisation) চিহ্নিতকরণের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। জাম্বিয়া ও ব্রাজিলের তামা খনিজীভবন এলাকা ; অস্ট্রেলিয়ার সীসা ও দস্তার খনিজীভবন এলাকা এবং ভেনেজুয়েলা ও অস্ট্রেলিয়ার লোহা-আকর সঞ্চয় এলাকার নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির সমাবেশ তিনি লক্ষ্য করেছেন।

তাঁর বর্ণনা হচ্ছে :

> বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বনানী খনিজভবন প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। প্রথমত এমন উদ্ভিদ সম্প্রদায় বিদ্যমান যেগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশ বহির্ভূত বলে চিহ্নিত বা খনিজ নির্দেশক প্রজাতি বলেও চিহ্নিত নয়, সেগুলো এমন মৃত্তিকার পরিবেশ নির্দেশ করে, যেমন—যেখানে সালফাইড আকরের উপস্থিতি মৃত্তিকা এলাকাটিকে অধিক অম্লের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে পৃথক করে রাখে। দ্বিতীয়ত, প্রধান খনিজ আকর পুঞ্জিভবন এলাকার প্রসারিত ক্ষুদ্র শাখা এলাকায় নিয়মবহির্ভূত ও বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ সমাবেশ বা উদ্ভিদের হঠাৎ প্রস্থচ্ছেদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ শ্রেণীর বনানী সমষ্টির সেই খনিজ পদার্থ সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকার ফলে কেবল সেই শ্রেণীর উদ্ভিদ ধাতব খনিজ সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় সমৃদ্ধি লাভ করে বা বনানীগুলো খনিজ পদার্থ শোষণ না করেও বিষাক্ত পদার্থ সহ্য করার ক্ষমতা বহন করে। বনানী অনেক ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট খনিজ ধাতব পদার্থ সঞ্চয়ের পরিসর মান নির্দেশ অথবা উদ্ভিদ সমষ্টি অনেক খনিজ পদার্থের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত মৃত্তিকার খনিজের ভূ-রাসায়নিক বিচ্ছুরণের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত শ্রেণীর বনানীর বিস্তারণ প্রকাশ পায়। কিন্তু যেখানকার স্তর শিলা (bed rock) অত্যধিক বোঝা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে সেই এলাকার গভীরে প্রবিষ্ট শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদ নিয়মবহির্ভূত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। ব্যাপক এলাকায় বিস্তারিত ও খনিজ নির্দেশক বনানীর জীব রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে (biochemical analysia of both widely distributed and indicator species) খনিজ ধাতুর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও বর্ণনা করা সম্ভব (detect and delineate metal anomalies)।[১]

বনানীর অন্যান্য ব্যবহার হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতির। কৃষি ও বনায়নের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বনানী মৃত্তিকার গুণাগুণের নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। জলাভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ইউক্যালিপটাসের প্রবর্তন পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ফলদায়ক বলে বিবেচিত। সংরক্ষণ সমস্যার ক্ষেত্রে বনানীর ফলদায়ক ভূমিকা উদ্ঘাটিত হতে পারে।

---

১. Robinson, H. (1972) : Biogeography, পৃ. ৩৪৪.

৮.১০. সৌন্দর্যবোধক ব্যবহার

কেবল খাদ্যের চাহিদা পূরণ হলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। গতানুগতিক ও একঘেঁয়েমি অবস্থা লাঘবের জন্য মানুষ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। সম্ভবত এই দৃষ্টিকোণ থেকে বনানী মানুষের সৌন্দর্যবোধকে (Aesthetic) উজ্জীবিত করে। পানির অনুরূপ ভূদৃশ্যকে বনানী সুশোভিত করে রাখে। এজন্য মানুষ তার কর্মজীবনের গতানুগতিক ও একঘেঁয়েমি অবস্থা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য সপ্তাহান্তে মোটরগাড়ি ও সাইকেলযোগে এমনকি পায়ে হেঁটে গ্রামাঞ্চলে জগদ-বহির্ভূত উদ্দীপনা ও শক্তি (refreshment) সংগ্রহের জন্য গমন করে। এই দৃষ্টিকোণ হতে বলা হয় যে, আমাদের মধ্যে, আমাদের ধারণা অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যক ওয়ার্ডসওয়ার্থ (wordsworth) বিদ্যমান। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ইংরেজবাসীদের একচেটিয়া অধিকার নয়। অন্য জাতির মানুষদেরও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ়। অত্যধিক উদ্ভিদ সমাবেশ এলাকা, মালয়েশিয়ার কৃষকগণও তাদের সাধারণ বসতবাড়ি সংলগ্ন এলাকা ফুলের বাগান দিয়ে সজ্জিত করে রাখে। অত্যধিক উন্নত দেশ যেমন জাপানে মানুষ ফুল দিয়ে সজ্জিত পরিবেশকে উচ্চমূল্যের সুকুমার শিল্প (highly esteemed art) বলে গণ্য করে।

ড. ভঘান কর্নিশ (Dr. Vaughan Cornish) চিত্রানুরূপ দৃশ্যের সৌন্দর্যের পদ্ধতিগত পাঠকে ভূগোলের কান্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Aesthetic aspect of geography) বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে শহর-নগর-চিত্রের অলঙ্করণ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য বনানীর প্রয়োজন প্যারিসের রাজপথের উভয় পাশের রেখাকারে পরিশোভিত বৃক্ষের সারি, বৃক্ষশোভিত লণ্ডন স্কয়ার, বাগান নগর, বসত বাড়ির বাগান, জানালার অলঙ্করণ বাক্স, এসব হচ্ছে শহরের কর্কশ বা রূঢ় এবং নীরস ও একঘেঁয়ে (Harshness and drabness) পরিবেশকে প্রাণচঞ্চল (enliven) করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা বনানী বিশেষ করে গাছ, ঘাস বা ফুল শহরের পরিবেশীয় চিত্রকে জীবন্ত রূপ প্রদান করে।

বনানী ও গাছ হচ্ছে শিল্পীর প্রেরণার উৎসস্থল। চিত্রকরের প্রিয় বিষয় হচ্ছে ভূদৃশ্য। কিন্তু শিল্পকর্মের সাজসজ্জা ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বনানীর গুরুত্ব অপরিসীম। গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদি ডিজাইনের অলঙ্করণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অপরিসীম।

মানুষ ও প্রাণিজগতের মধ্যে পারস্পরিক অধীনতা বিদ্যমান। সমাজবিদ্যাগতভাবে মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। এক প্রধান সম্বন্ধ, শিকারী হিসেবে প্রাচীনতম না হলেও সুপ্রাচীন বলে বিবেচিত। গুহার দেয়ালের আবিষ্কৃত চিত্র শিকারের যন্ত্র এবং প্রাণীর ভগ্ন হাড়ের প্রাপ্তি হতে প্রতীয়মান যে, মানুষের প্রাণী শিকার অতি প্রাচীন এক পেশা। মানুষের আদিম বা প্রাচীনতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাণীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ মানুষ তাদের খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য প্রাণীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। মানুষের সাহায্যে পশুপালন অনেক পরে আরম্ভ হয়। শিকারের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে প্রাণীর অভ্যাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হয়। ফলে মানুষ কিছু শ্রেণীর প্রাণীকে যেমন পছন্দ করতে আরম্ভ করে তেমনি আবার অন্য শ্রেণীর প্রাণীকে ভয় করতে থাকে। পরবর্তীকালে কিছু প্রাণী মানুষের নিকট পবিত্র বলে পরিচিত হয়। তাই প্রাণীকে কিছু মানুষ

যেমন পূজা করতে আরম্ভ করে তেমনি অনেক প্রাণী কিছু মানুষের নিকট ধর্মের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৮.১১. মানুষ ও প্রাণীর বিস্তারণ

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে অনেক প্রাণী প্রজাতি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু অনেক জীব মানুষ দ্বারা অতি দূরবর্তী এলাকায় প্রবর্তিত হয়েছে। কিছু প্রাণী যেমন আকস্মিকভাবে অথবা দৈবাৎ প্রবর্তিত হয়েছে তেমনি আবার অন্যগুলো সুচিন্তিতভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এরূপ বিদেশী প্রাণীর প্রবর্তন সাধারণত বড় আকারের এবং সুদূর প্রসারী বিপর্যয় ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় অপ্রীতিকর এবং অতি ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে প্রাকৃতিক প্রাণিকুলের মধ্যে শিকার জীবী প্রাণী ও শিকারযোগ্য প্রাণীর মধ্যে ভারসাম্য বিদ্যমান থাকে। এই ভারসাম্য অসীম বা অবাধ না হলেও এক যুক্তিপূর্ণ ভারসাম্য প্রাণিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বিদেশী কোনো প্রাণীর অসতর্ক বা খেয়ালী প্রবর্তন প্রাকৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছু প্রাণী প্রজাতির সর্বনাশ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে আগত নতুন প্রাণীর শত্রুবিহীন আদর্শ পরিবেশের অনাধিকৃত এলাকা (unoccupied niche) দখল বা পূর্ণ করে প্রাণীগুলো সংক্রামক মহামারীর (Plague proportions) রোগের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে অন্যান্য প্রাণীকে স্থানচ্যুত করে।

৮.১১.১. **জীবের আকস্মিক প্রবর্তন :** ঐতিহাসিক যুগের প্রথমদিকে স্থান হতে স্থানান্তরে মানুষের ব্যাপক চলাচলের সময়ে বিদেশী প্রাণীর দৈবাৎ প্রবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণীর প্রবর্তন সমুদ্র পরিবহন শুরু হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়নি। মানুষের অগোচরে জাহাজে রক্ষিত মালপত্র সিন্দুক গাইট বা বস্তা প্রভৃতিতে লুকায়িত অবস্থায় হাজার হাজার মাইল দূরে পরিবাহিত হয়ে ক্ষুদ্র জীব অন্য এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে। রেলপথ, মটর যান এবং বিমান বা উড়োজাহাজ প্রবর্তন প্রাণীর আকস্মিক আমদানি অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করেছে। ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর এবং আরশোলা (Rat, mouse and cockroach) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়ার কালো ইঁদুর মধ্যযুগে ইউরোপে উপস্থিত হয় এবং পরে এটি বিটিশ দ্বীপপুঞ্জসহ সমগ্র প্রাচ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এশিয়ার গৃহ নেংটি ইঁদুর যেগুলো মানুষের গৃহের অযাচিত সঙ্গী সেগুলো বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দৈবাৎ প্রবর্তিত স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে নেংটি ইঁদুর এবং অন্য শ্রেণীর ইঁদুর উপকারের গুরুত্ব বহন না করলেও এগুলো উৎপাতকারী, ধ্বংসকারী এবং প্রায় অবিতাড়নযোগ্য (ineradicable) বিরক্তিকর প্রাণী।

কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর জীব নতুন এলাকায় দৈবাৎ প্রবর্তিত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় আমেরিকার স্বদেশীয় নিশাচর ক্ষুদ্র গিরগিটি মৌসুমী এশিয়ার দেশগুলোতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই গিরগিটি কলার গুচ্ছে আত্মগোপন অবস্থায় ব্রিটেনে পৌঁছে। অ্যানোফিলিস মশা (ম্যালেরিয়া জ্বরেরবাহক) পশ্চিম আফ্রিকা হতে আমেরিকা মহাদেশে পরিবাহিত হয় এবং এই মহাদেশের উপকূলীয় জলাভূমি এই মশার আবাসস্থলে পরিণত হয়।

আমেরিকান এক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জিপসি মথ আমদানি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এই মথের সাথে রেশম পোকার সঙ্করায়ন করা। দুর্ঘটনাক্রমে কিছু সংখ্যক শুয়া পোকা (Cater pillars) পলায়ন করে। এগুলো পুনরায় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক এই মথ ধরা পড়া হতে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। জিপসি মথ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে এগুলো বনানীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে চলেছে। এই মথ বিতাড়ন বা সমূলে উৎপাটনের এর জন্য বাৎসরিক ১০ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করা হচ্ছে।

ক্যানসডেল নিউজিল্যান্ডে বোলতা বা ভিমরুলের বিস্তার সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

> ইউরোপীয় বোলতা উড়োজাহাজের দ্বারা ১৯৪৫ সালে নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডে প্রবেশ করে। এই বোলতাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ডি.ডি.টি. এবং সায়ানাইড ব্যবহার করার পরও এগুলো ২০০ মাইল ×১৫০ মাইল এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই বোলতাগুলো বিতাড়িত বা নিশ্চিহ্ন করা প্রায় অসম্ভব। তাই এই বোলতাগুলোকে ফলের বাগান সমৃদ্ধ প্রদেশ হতে দূরে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনেক দেশ উড়োজাহাজকে কঠোর বাষ্পস্নানের আইনের (Fumigation laws) আওতায় এনেছে যেন মশা, ধ্বংসাত্মক মাছি এবং বিরক্তিকর ও রোগবাহী কীট দেশগুলোতে প্রবেশ করতে না পারে।[২]

মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াই ল্যামপ্রে (সাধারণত লবণাক্ত পানির জীব এবং এরা মাছের দেহের সাথে সংযুক্ত থাকে ও মাছটির রক্ত শোষণ করে) ওয়েল্যান্ড খালের (welland canal) দ্বারা ইরি হ্রদে সহজে পৌঁছে। গ্রেট লেকে ল্যাম্প্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংখ্যাধিক্যে (scourge) পৌঁছে। ফলে ট্রাউট মাছের উন্নত শিল্পের অবনতি শেষ প্রান্তে পৌঁছে। ল্যাম্প্রে ১৯১৮ সালের দিকে হ্রদগুলোতে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। ফলে ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হুরোন হ্রদ এলাকার ট্রাউট মাছের বাৎসরিক গড় উৎপাদন ২০ লক্ষ পাউন্ড হতে মাত্র ৫ হাজার পাউন্ডে নেমে আসে। আরও লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, সেই সময়ে কোনো ট্রাউট মাছ ল্যাম্প্রে দ্বারা ক্ষতবিহীন অবস্থায় ছিল না। সাম্প্রতিককালে মানুষের প্রচেষ্টায় ল্যাম্প্রে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এখানে আবার ট্রাউট মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮.১১.২. মানুষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জীবের প্রবর্তন (Dellberate introduction) : গৃহপালিত পশুর উদাহরণ বাদ দিলে নতুন পরিবেশে বিদেশী প্রাণীর প্রবর্তন অতি সাম্প্রতিককাল ঊনবিংশ শতাব্দিতে ঘটেছে। মনে হয় প্রধানত তিন কারণে এই প্রবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, সম্ভাব্য খাবারের উৎস হিসেবে, যেমন নিউজিল্যান্ডে হরিণ ও ট্রাউট মাছের প্রবর্তন দ্বিতীয়ত, বিরক্তিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণ যেমন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নকুল বা বেজি প্রবর্তন এবং তৃতীয়ত, উপনিবেশিকদের স্বদেশের স্মৃতি রক্ষার জন্য যেমন অস্ট্রেলিয়ায় শশকের প্রবর্তন করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এই ইচ্ছাকৃত প্রাণীর প্রবর্তনের মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যক, যেমন ব্রিটেনে ক্ষুদ্রকায় পেঁচা ও ফিজ্যান্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার ব্রাউন ও রেইনবো ট্রাউট প্রবর্তন লাভজনক বলে প্রমাণিত হলেও অন্যগুলো দুঃখজনক ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আদর্শ বা অনুকূল পরিবেশের প্রচুর খাদ্য ও শিকারী প্রাণীবিহীন অবস্থায় আমদানীকৃত প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এত বৃদ্ধি পায় যে প্রাণীগুলো বিরক্তিকর

২. Robinson, H. (1972) : Biogeography, পৃ. ৪১৩

বা বর্জ্যরূপে পরিগণিত হয়। তাই এই প্রাণীগুলোর বর্ধিত সংখ্যাকে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষকে অতি ব্যয়সাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে।

মানুষের সাহায্যে ইচ্ছাকৃত প্রাণীর প্রবর্তন অতি দীর্ঘ তালিকাবিশিষ্ট। পূর্ববর্তী শতাব্দির শেষ দশকে প্রবর্তিত ধূসর বর্ণের আমেরিকার কাঠবিড়াল বর্তমানে ব্রিটেনের সকল অংশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং এগুলো স্বদেশী লাল কাঠবিড়ালের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেশীয় কাঠবিড়ালকে বিতাড়নর পর্যায়ে এনেছে। উত্তর আমেরিকার গন্ধগকুলা (Musquash) ইউরোপে পশম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুক্ত গন্ধগকুলার সাহায্যে বংশবৃদ্ধির ফলে লক্ষ লক্ষ গন্ধগকুলা ইউরোপ ও সি.আই.এস.-এর বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মহামারীরূপের সংখ্যার ইঁদুর দমনের জন্য ভারত ও মিশরের স্বদেশী ক্ষুদ্র মাংসাশী প্রাণী বেজী প্রবর্তন করা হয়। বেজী ইঁদুর ও সাপ শিকার করে এবং পাখি ও কুমিরের ডিম খায়। বেজী ইঁদুর নিধন সমাধা করে। ইঁদুরের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে বেজী দ্বীপবাসীর পালিত মুরগী এবং দ্বীপটির স্বদেশী বন্য পাখির ডিম খেতে আরম্ভ করে।

কেবল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ব্যাপক আকারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক প্রাণী বর্জ্যরূপ বা বিরক্তিকর ও অবাঞ্ছিত প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। ইংরেজ অভিবাসী ১৮৩৭ সালে প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় শশক নিয়ে আসে। এই প্রাণী নিয়ে আসার কারণ, হয় ক্রীড়া কৌতুক করা বা স্বদেশকে মনে রাখার (Nostalgia) বাসনা। কয়েক ডজন শশক যুগল ১৮৫৯ সালে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে মুক্ত করে দেয়া হয়। বিরক্তিকর প্রাণী হিসেবে শশক প্রতিষ্ঠা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। শত্রুবিহীন প্রাকৃতিক তৃণভূমি শশকের বাসের উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। ফলে ব্যাপকভাবে শশক বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং লাগামহীন অবস্থায় শশকের বংশবৃদ্ধি পেতে থাকে। মুক্ত হওয়ার ২০ বছরের মধ্যে সমগ্র ভিকটোরিয়া প্রদেশে শশক মাত্রাধিক্য সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়ার পর সংলগ্ন নিউসাউথ ওয়েলস ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশদ্বয়েও শশক প্রবেশ করে। আঠার শত আশির দশকে শশকের উৎপাত সংক্রামক মহামারীর অর্থাৎ প্লেগের রূপ ধারণ করে। নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার শশক নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫ লক্ষ পাউন্ড খরচ করেন। কিন্তু শশকের সংখ্যা অপ্রতিরোধনীয় হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮৯০ সালে কুইন্সল্যান্ড এবং এক দশক পরে শশকের অবাঞ্ছিত আবির্ভাব উত্তর ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়ও ঘটে। বিজ্ঞানী রীজ লিখেছেন যে, শশক অভেদ্য বেড়া শশক ঠেকানোর এক গ্রহ যোগ্য ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয় এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এলাকা শশক মুক্ত রাখার জন্য এক হাজার মাইল দীর্ঘ বেড়া, কোনডোল হতে হোপেটুন সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পাঁচ বছর (১৯০২–০৭) ধরে নির্মাণ করা হয়। তবুও শশক এই বেড়া অতিক্রম করে। তাই পূর্বপাশে ১৯১৬ সালে শশক দৃষ্টিগোচরে আসে।

শশক নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কয়েকটি অভিযান চালানো হয়। ইউরোপ হতে শৃগাল বা বৃহৎ নকুল বা বেজী (stoat) এবং নেউল আমদানি করে আনা হয় যেন শশক দমন করা যায়। এই আনীত প্রাণীগুলো শশককে আক্রমণ করলেও সহজে শিকারযোগ্য সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষাবিহীন স্বদেশী প্রাণী, কোয়ালা ভল্লুককে এগুলো শিকার করতে আরম্ভ করে। তাই এই ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় শশকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শশকের

ধ্বংসের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে হাজার হাজার একর এলাকার চারণভূমির ঘাস খেয়ে শশক চারণভূমি ধ্বংস করে ফেলে বা শশক চারণভূমির নির্বাচিত ঘাস খেয়ে চারণভূমির অবস্থা নিম্নমানের পর্যায়ে আনে। শশক প্রতিষ্ঠিত ফসল ধ্বংস করে ফেলে এবং চারাগাছ ভক্ষণ করে। শশক গাছের ছাল খেয়ে ব্যাপক এলাকার বনভূমিও ধ্বংস করে ফেলে। এই ভয়াবহ শশক–ভীতি সমগ্র অস্ট্রেলীয় জাতির এক প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। পূর্বে বর্ণিত শশক প্রতিরোধক বেড়ার প্রচলন ছাড়াও মৃত্তিকায় অভ্যন্তরের করোগেটেড বা ঢেউ তোলা লৌহ সিটসহ ঊর্ধ্বে লোহার জাল স্থাপন করা হয়, যেন মৃত্তিকায় অভ্যন্তর এলাকা দিয়ে গর্ত করে বা বেড়া ডিঙ্গিয়ে শশক অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এই পদ্ধতিও ফলপ্রসূ হয়নি। বড় পেরেক বা গজাল দিয়ে উদ্ভাবিত চিড় সৃষ্টিকারী লাঙল (ripper plough) চালনা করে শশকের বাস এলাকার গর্তগুলো ধ্বংস করা হয়। এর ফলে শশকের খুব একটা ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মৃত্তিকার ব্যাপক ক্ষয় শুরু হয়। অন্যান্য পদ্ধতি যেমন বিষ ও বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কেবল শশক নয় বরং মেষ এবং উদ্ভিদও মারা যেতে থাকে। এরপর কুকুর ও বন্দুকসহ অভিযান চালিয়ে স্থানীয়ভাবে শশক নিধনের ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য লাভ করা গেলেও বৃহৎ আকারের সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যায়ে সংক্রামক ব্যাধি মাইক্সোমেটোসিস (Myxomatosis) প্রবর্তন করে শশকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। শশক দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতির পরিমাণের একটি উদাহরণ, ৫ বছরকালে (যা ১৯৪৯ সালে শেষ হয়) ৪২.৮ কোটি মেষের চামড়া রপ্তানি করা হয়। কিন্তু ১৯৫২ এর হিসাব অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার চারণভূমি নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মেষের সংখ্যা কমপক্ষে ২.৫ কোটি কমে যায়। শতাধিক বছরের শশক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা অবশেষে মাইক্সোমেটোসিস রোগের সাহায্যে হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে। বর্তমানে শশকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে মানুষের আগমনের পূর্বে মাত্র দুই গোত্রের স্তন্যপায়ী জীব, স্বদেশী বাঁদুড় বিদ্যমান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দিতে মাওরি এই দ্বীপপুঞ্জে তাদের সঙ্গী হিসেবে পলিনেশীয় কুকুর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের ইঁদুর তাদের খাদ্যের জন্য আনে। এই দুই শ্রেণীর প্রাণীকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কোনো জীবই এই দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এবং কুকুর অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ৪৫ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব আমদানি করে দ্বীপপুঞ্জটিতে মুক্ত করে দেয়া হয়। মাত্র ২৫ প্রকার জীব বন্য অবস্থায় স্বল্প বা অধিক সংখ্যায় টিকে থাকে। এই সময়ে অযাচিত জীব, ইঁদুর এবং নেংটি ইঁদুর জাহাজে লুকায়িত অবস্থায় দ্বীপপুঞ্জটিতে এসে বিস্তার লাভ করতে থাকে। টিকে থাকা প্রাণীগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু (wallaby) ও অপোসাম (oppossum), আমেরিকার ওয়াপাতি (wapati) অর্থাৎ আমেরিকার বৃহৎ হরিণ, ভারতের সামবার হরিণ (Sambr dear) লাল হরিণ ইউরোপের বেজী ও বিড়াল। ক্যাপটেন কুকের এখানে প্রথম অবতরণের (অক্টোবর, ১৭৬৯) পর আনীত ১৩০ শ্রেণীর পাখির মধ্যে ২৪ শ্রেণীর পাখি দ্বীপপঞ্জটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বীপপুঞ্জটির প্রাণীবিহীন (মুক্ত) এলাকায় অনেক আনীত স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপযুক্ত স্থান হওয়ার কারণে দ্রুত গতিতে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। গৃহপালিত শূকর ও ছাগল বন্য প্রাণীতে পরিণত হয়। কয়েক শ্রেণীর হরিণও প্রধান প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হয়। ইঁদুরজাতীয় প্রাণী নিয়ন্ত্রণের জন্য নকুল, বেজী ও ফেরেট (Feret) অর্থাৎ নকুলজাতীয় ধবধবে সাদা

প্রাণীবিশেষ আনা হয়। এই প্রাণীগুলো ইঁদুরজাতীয় প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করলেও এগুলো দেশী পাখিকে সহজ শিকার হিসেবে গণ্য করতে আরম্ভ করে। ট্রাউট গোত্রের মাছ অস্ট্রেলিয়ার স্বল্প সংখ্যক দেশী মাছবিশিষ্ট নদীগুলোতে সাফল্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে ১৮৩৮ সালের দিকে শশকের প্রচলন করা হয় এবং ১৮৭০ সালে শশক বালাই প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে শশকের দ্বারা চারণভূমির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে ও মৃত্তিকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তাই মৃত্তিকা ক্ষয় এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত বাহকের অভাবে মাইক্সোমেটোসিস রোগ বিস্তার করা সম্ভব হয় না। তাই গতানুগতিক অস্ত্র, বিষ, বন্দুক, ফাঁদ এবং কুকুর দ্বারা শশক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৪৭ সালে শশক নিধন কাউন্সিল গঠন করা হয়। শশক পালন কৃষকদের এক লাভজনক পেশার কারণে শশক নিয়ন্ত্রণ অনুভব হয়নি। শশকের ব্যাপক উপাদানের ফলে চারণভূমি ১৯৪৮ সালের ৪২ লক্ষ একর হতে শশক উপদ্রবিহীন এলাকা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার একরে দাঁড়ায়। পরে ১৯৫৪ সালে শশকের মৃতদেহ (*Carcasses*) রপ্তানি অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফলে শশক পালন বন্ধ হয় এবং এর পরবর্তীকালে ধ্বংস প্রাপ্ত চারণভূমি সবুজ বর্ণ ধারণ করতে আরম্ভ করে।

প্রথম যুগের অভিবাসী ব্রিটেনের লাল হরিণ সম্ভবত মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য নিউজিল্যান্ডে নিয়ে আসে। এই প্রাণীগুলো ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। দ্বীপপুঞ্জটিতে এই প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো প্রাকৃতিক শিকারী প্রাণী না থাকার কারণে শশকের অনুরূপ প্রাণীটির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটা অবাঞ্ছিত প্রাণী বলে পরিগণিত হয়। লাল হরিণ এই পর্যায়ে শশকের সাথে একত্রে চারণভূমি ও গাছ ধ্বংস করতে থাকে। ফলে মৃত্তিকার ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই শ্রেণীর হরিণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পেশাদারী হরিণ নিধক নিযুক্ত করেছেন। এই নিধকগণ বিমানের সাহায্যে হরিণকে খোঁজ করে গুলি করে হত্যা করে। বছরে এক লক্ষ হরিণ এভাবে হত্যা করা হলেও হরিণের সংখ্যা এখনও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ যে প্রাণীকে অপরিচিত পরিবেশে প্রবর্তিত করেছে তার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উপরে আলোচনা করা হয়েছে। গৃহপালিত পশু বাদে এসব প্রাণীর প্রবর্তন বাস্তবক্ষেত্রে অনেক গোত্রের দেশী প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারণ পরিবর্তিত করলেও বিস্তারণের ভৌগোলিক পরিসর এলাকার বিস্তৃতি ততো ব্যাপক নয়। প্রবর্তিত প্রাণীগুলোর ভৌগোলিক বিস্তৃতি এলাকা ব্যাপক না হলেও তার ফলাফলের গুরুত্ব কম নয়। এই ফলাফল হচ্ছে দ্বিবিধ। প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে ফলাফলগুলো ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী প্রাণী নতুন এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরদেশী প্রাকৃতিক বনানীর পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধন করে মৃত্তিকা ক্ষয়কেও ত্বরান্বিত করেছিল। কোনো এলাকার প্রাণীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাত প্রচলন সাফল্যজনকভাবে মানুষ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে এলাকাটির প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে বিয়োগান্ত ফলাফল বয়ে আনবে। বর্তমানে প্রায় সকল দেশ এই প্রকার ফলাফলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।

৮.১২. গৃহপালিত পশু

মানুষের সাহায্যে বিদেশী প্রাণীর প্রবর্তন ছাড়াও, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গৃহপালিত পশুর বিস্তার বেশ ব্যাপক আকারে অনেক ক্ষেত্রে যেমন মেষ ও গবাদি পশু সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এইক্ষেত্রে মানুষের প্রাণীর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বন্য প্রাণী প্রবর্তনের নিয়ন্ত্রণবিহীন ফলাফল ঠেকানো সম্ভবপর হয়েছে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বনানীর ক্ষতি ও মৃত্তিকা ক্ষয় সংঘটিত হয়েছে।

অতি প্রাচীনকালীন সভ্যতার যুগ হতে মানুষ নতুন পরিবেশে তার গৃহপালিত পশু প্রবর্তন করলেও বর্তমান শতাব্দীগুলো প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী হতে ব্যাপকভাবে গৃহপালিত পশুকুলকে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে প্রেরণ বা স্থানান্তর করা হয়েছে। এই স্থানান্তর প্রধানত ইউরোপ হতে নতুন পৃথিবী এর সম বৈশিষ্ট্যের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এলাকায় করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুর স্থানান্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হতে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যেও সংঘটিত হয়েছে।

৮.১২.১. **প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি :** অনেক বন্য জীবের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং অনেক বন্য প্রজাতির জীব বিলুপ্ত হয়েছে। ভূতত্ত্বীয় জীবাশ্ম দ্বারা প্রমাণিত যে, সমগ্র ভূতাত্ত্বিক যুগে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই প্রকারের বিলুপ্তি প্রাকৃতিক এবং বিবর্ধনমূলক পরিবর্তন। মানুষের দ্বারা কৃত্রিম বা অপ্রাকৃতিক এবং দ্রুতগতির প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি অন্য ঘটনা নির্দেশ করে। গত দুই বা তিন শতক এবং বর্তমানে প্রাণী বিলুপ্তির যে মৃত্যুর ঘণ্টা ধ্বনি (toll) বেজেছে তা অন্য কোনো সময়ে এত ব্যাপক, এত ভয়াবহ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সত্তর প্রজাতির মতো এবং এই শতকের প্রথমার্ধে কমপক্ষে চল্লিশ প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে। আরও অনুমিত যে কেবল স্তন্যপায়ী গোত্রের জীবের বিলুপ্তি অতি উচ্চপর্যায়ে বছরে একটি গোত্রের বিলুপ্তি ঘটছে। বর্তমানে বিদ্যমান ১,০০০ ক্রমের প্রাণী বিলুপ্তির পর্যায়ে রয়েছে এবং ২৭০ স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীকে সরকারিভাবে বাস্তব বিলুপ্তির তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার বিভিন্ন কারণ উপস্থাপন করা যায়। সকল কারণ মানুষের সাথে জড়িত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফিটারের বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় :

> যদি মানুষের দ্বারা প্রাণীর বিলুপ্তির কার্যক্রম বর্তমান পর্যায়ে না আসত তা হলেও একমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই ২,০০০ বৎসরের মধ্যেই কিছু সংখ্যক প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতো। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, হ্যারিকেন বা অন্য শ্রেণীর প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দ্বারা দ্বীপের প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটতো। স্থানীয় আর্দ্র এলাকার শুষ্কতা, মেরু এলাকার তুষার মুকুটের দীর্ঘসময় ভিত্তিক হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ামক স্থানীয় প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাত। কিন্তু গত ২,০০০ বৎসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিলুপ্তির ঘটনা এই সকল কারণে সংঘটিত হয়নি।[৩]

মানুষের কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধকতাই প্রাণীর বিলুপ্তির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মানুষের দ্বারা অতিরিক্ত প্রাণী শিকার, ইচ্ছাকৃত বাসস্থান ধ্বংস বা প্রাণীকে প্রাকৃতিক বাসস্থান হতে বিতাড়ন, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিস্তারণের ফলাফল, মানুষের বাসস্থান এলাকা বৃদ্ধি, মানুষের অর্থনৈতিক লালসা এবং প্রাণী নিধনের কৌতূহল বা লিপ্সার সাহায্যে

৩. Robinson, H. (1972) : Biogeography, পৃ. ৪২০

বন্যপ্রাণী বলির (victim) শিকার হয়েছে। অতীতের ১০০ বছরে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ প্রাণিকুলের প্রাকৃতিক বাসভূমি ধ্বংস করা। বনাঞ্চল পরিষ্কারকরণ, তৃণভূমি এলাকার চাষাবাদ, জলাভূমির পানি নিষ্কাশন প্রভৃতি প্রাণিকুলের অস্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল। প্রাণিকুলের চলাচলের পরিসর ভূমি (range lands) হ্রাস পাওয়ার ফলে তাদের খাদ্য সরবরাহও কমে যায়। তাই প্রাণিকুলের বাসভূমি এবং/বা খাদ্যপ্রাপ্তির অভাবই হচ্ছে অনেক প্রাণীর বিলুপ্তি এবং বিলোপ পাওয়ার ভীতির প্রধান কারণ।

ঐতিহাসিক যুগ গত ১০,০০০ বছরে মানুষ একক সংখ্যাভিত্তিক অতি অধিক সংখ্যক প্রাণীকে ধরেছে বা হত্যা করেছে। তার ফলে অন্য যে কোনো ঘটনা অপেক্ষা প্রাণীর প্রজাতিগুলোর বিলুপ্তি বা প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। খাবার, পশম, চামড়া এবং আইভরি বা গজদন্তের জন্য মানুষ পশু শিকার করেছে, চিড়িয়াখানা বা ব্যবসার জন্য মানুষ প্রাণী ধরেছে বা বন্দি করেছে, খেলাচ্ছলে সে পশু শিকার করেছ এবং শিকারের উদ্দেশ্যেই কেবল মানুষ প্রাণী শিকার করেছে। তাই ব্যাপক বা সীমিত সংখ্যার বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী নিধনের পর প্রাণীগুলোর পরিপূর্ণ বিলুপ্তি বা প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে এসেছে। পরোক্ষভাবে মানুষের সাহায্যে বিদেশী প্রাণীর নতুন পরিবেশে প্রবর্তন কিছু সংখ্যক প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক সংখ্যায় হ্রাস করেছে। গালাপোগোস দ্বীপে ছাগল প্রবর্তন দ্বারা দ্বীপটির ঘাসজাতীয় বনানীর হ্রাস বৃহৎ কচ্ছপের খাদ্যের সংকট সৃষ্টি করেছিল। কিউবার ক্ষুদ্রকায় হুটিয়া (dwarf hutia), তীক্ষ্ণ দন্তের প্রাণী (যেমন—ইঁদুর) এবং অন্যান্য পোকামাকড় পতঙ্গভূক–খাদক আনীত প্রাণী, নকুল বা বেজীর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। আর্জেন্টিনায় প্রবর্তিত ইউরোপীয় খরগোশ প্যাটাগোনীয় ক্যাভিকে প্রায় স্থানচ্যুত করে ফেলেছে।

যেসব প্রাণী এই পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে সেই প্রাণীগুলোর তালিকা অতি দীর্ঘ। এই ক্ষেত্রে Fitter, R. and Leigh Pemberton, J., Vanishing wild Aminals of the World, Midland Bank and Kaye & Ward, 1968 পুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাণীর নিশ্চিহ্ন হওয়ার চিত্র কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ইউরোপীয়গণ উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হওয়ার সময় অভ্যন্তরীণ সমভূমির (Interior plains) প্রাকৃতিক তৃণভূমি বন্য বাইসনের চারণভূমি ছিল। এই বন্যপ্রাণী মহিষ নামেও পরিচিত। এই বাইসনগুলো লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় পাল বেঁধে ঋতুভেদে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে চলাচল করতো। যাযাবর ইন্ডিয়ানগণ বাইসনের চলাচল পথে বর্শা ও তীর–ধনুকের মাধ্যমে বাইসন শিকার করতো। এক্ষেত্রে বাইসনের নিধনের সংখ্যা অতি সীমিত ছিল। রাইফেলসহ শ্বেতকায় মানুষের আগমনের পর বাইসন নিধনের হার বৃদ্ধি পায় এবং বাইসনের চামড়ার ব্যবসা চলতে থাকে। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যার বাইসনের পাল অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ১৮৭০ সালের পর আন্তঃমহাদেশীয় (transcontinental) রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মারাত্মকভাবে বাইসন নিধন চলতে থাকে। এই দুঃখজনক কাহিনী (sorry tale) অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় উত্তর প্রশান্ত রেলপথের (Northern Pacific Railway) রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে। রেল কোম্পানি ১৯৮২ সালে বাইসনের ২ লক্ষ চামড়া পরিবহন করে। পরবর্তী বছরগুলো ১৯৮৩ সালে ৪০ হাজার, ১৯৮৪ সালে ৩০০ এবং ১৮৮৫ সালে কোনো

চামড়া রফতানি করা হয়নি। বাইসন নিধন এত ব্যাপক ছিল যে, একজন লোক মাইলের পর মাইল দীর্ঘপথ মাটি স্পর্শ না করে বাইসনের হাড়ের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। বাইসনের প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে বাইসন রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পার্কে নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রায় ৩৫,০০০ বাইসন রয়েছে।

উদ্দেশ্যহীন ব্যাপক প্রাণী হত্যা, দুর্ভাগ্যবশত এখনও সংঘটিত হচ্ছে। কুইন্সল্যান্ডে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের পর প্রায় ১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ক্যাঙ্গারু হত্যা করা হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে এই ক্যাঙ্গারু হত্যা অব্যাহত রয়েছে এবং এটা কুকুরের টিনজাত খাদ্যের ব্যবসার জন্য সংঘটিত হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকার আর্কটিক পতিত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মাস্ক ষাঁড়ের (musk ox) সংখ্যা শিকার করার কারণে দ্রুত গতিতে কমে গেছে। মাস্কের স্ব-রক্ষার জন্য এক আশ্চর্যজনক কৌশল রয়েছে। বলা হয়, সামরিক বাহিনীর প্রসিদ্ধ কোটরগত বর্গ কৌশলের (hollow square) প্রথম আবিষ্কারক হচ্ছে এই মাস্ক অক্স (ষাঁড়) প্রাণীর পাল। নেকড়ে বাঘ বা ভল্লুক দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মাস্ক অক্সপাল বৃত্ত তৈরি করে বাহিরের দিকে মাথা স্থাপন করে। এই প্রাণীগুলোর তীক্ষ্ণ শিং সাধারণত ফলপ্রসূ প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। এস্কিমো বা রেড ইন্ডিয়ানগণ প্রাণীর সমবেত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ মাস্ক অক্সের পালকে ধ্বংস করার ক্ষমতা বহন করত না। কিন্তু রাইফেলসহ মানুষের আবির্ভাব পরিস্থিতি বদলে ফেলে। রাইফেলসহ মানুষের সাথে মাস্ক অক্সের বৃত্তভিত্তিক বহির্মুখী মস্তকের শিং এর দ্বারা প্রতিরোধ এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় এবং তাই সম্পূর্ণ অক্সের পাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে মাস্ক ঘোড়া বৃহৎ অঞ্চল হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত মাত্র কয়েক হাজার মাস্ক অক্স গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর কানাডায় টিকে আছে।

আরব, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার উপমরু ও মরু অঞ্চলের ওরিক্স গ্রুপের (Oryx group) অতি সুদর্শন শুভ্রমরু মৃগ (white desert antelope) অতি পরিশ্রমের সাথে (Assidiously) শিকার করা হয়েছে এবং বর্ণিত বাসভূমি হতে এগুলোকে তাড়ানো (driven) হয়েছে। বর্তমানে রুব আল খালি মরুভূমিতে এই প্রাণী নগণ্য সংখ্যায় (একশতের কম) বিদ্যমান রয়েছে। মালাগাছির পূর্ব উপকূলীয় নিশাচর বিড়ালজাতীয় গোত্রের (Lemur family) অতি বিরল অ্যাই-অ্যাই (Aye aye) এর বাসভূমি, অরণ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার (রাস্তাঘাট তৈরি, চারণভূমি এবং ধান চাষের জন্য) ফলে প্রাণীগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে। অতীতকালীন অনিয়ন্ত্রিত শিকারের কারণে সর্ব বৃহৎ বালিন তিমি (Baleen whale) নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে রয়েছে।

উড্ডয়ন ক্ষমতার কারণে মনে হতে পারে যে, পাখি প্রাণীর অনুরূপ ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিন্তু তথ্য উপাত্ত এই চিত্র প্রকাশ করে না। উড্ডয়ন ক্ষমতাবিহীন পাখি যেমন মরিসাসের ডোডো (Dodo), নিউজিল্যান্ডের মোয়া এবং আর্কটিক অঞ্চলের অ্যাক (Auk) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উড্ডয়ন ক্ষমতার অধিকারী পাখি যেমন কালিফোর্নিয়ার বৃহদাকায় কোনডোর (Giant condor), দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট শকুন, উত্তর আমেরিকার আইভরি চঞ্চুবিশিষ্ট ঠোঁকরা (Ivory billed wood pecker), প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন (Passenger pigion) ও ক্যারোলিনা পারাকিট (Parakit), দীর্ঘ পুচ্ছের ক্ষুদ্র টিয়া পাখি, নিউজিল্যান্ডের নটোরিন

(Notorins) ও স্যাডলব্যাক এবং হাওয়াইয়ের লেসান রেল (Laysan rail) হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে না হয় প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার অবস্থায় রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের নটোরিনের বা লুপ্তপ্রায় (Rudimentary) পাখা বিদ্যমান থাকলেও পাখিগুলো উড়তে অক্ষম। কিন্তু এই পাখিগুলো অতি ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াতে পারে। তাই এগুলো প্রাকৃতিক শত্রুর কবল হতে নিজেদের রক্ষা করে রেখেছিল। পরবর্তীতে মানুষ ও কুকুরের আগমন প্রাণীগুলোকে প্রায় নিশ্চিহ্ন পর্যায়ে এনেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার অতি শ্লথ গতির বংশবৃদ্ধি ক্ষমতার অধিকারী ও খাড়া পাহাড়বাসী নটোরিন মানুষের সীমা লঙ্ঘনের সাথে অভিযোজন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পাখির আবাসভূমি যেমন লুজিয়ানার আদিম অব্যবহৃত অরণ্য পরিষ্কারকরণের ফলে আইভরি চঞ্চুবিশিষ্ট কাঠঠোকরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের লেসান রেলের মৃত্যু খাদ্যের অভাবের জন্য ঘটেছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পাখির খাদ্য, ঘাস খরগোশ দ্বারা ধ্বংস হওয়ার ফলে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল।

তাই সংক্ষেপে বলা যায়, অনেক প্রাণী প্রজাতির নিশ্চিহ্ন বা প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে মানুষের অমিতব্যয়ী (wanton) প্রাণী হত্যা। এই কারণের সাথে জড়িত হয়ে আছে মানুষ দ্বারা পরোক্ষ প্রতিরোধ (intervention)। প্রতিবন্ধকগুলো হচ্ছে অরণ্য ধ্বংস, জীব শিকারের প্রবর্তন ও নতুন পদ্ধতির কৃষিকাজ, বায়ু দূষণ, ব্যাপক সংখ্যক দালানকোঠা নির্মাণ ভূমি উদ্ধার (land reclamation) এবং মানব সভ্যতার পরিবর্তন ও বিস্তৃতির অন্যান্য আনুষঙ্গিক বস্তু।

৮.১২.২. মানুষের কাজে প্রাণী : মানুষের কাজের জন্য প্রাণীকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

ক. প্রাণী মানুষের খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহকারী (Providers) হিসেবে

খ. ভারবাহী পশু (bests of burden) এবং

গ. প্রিয় প্রাণী, সঙ্গী ও মিত্র (Pets, companions and allies) হিসেবে।

প্রাণীর প্রতি মানুষের প্রাথমিক স্বার্থ, ক্ষুধার্ত ভিত্তিক শিকারী হিসেবে প্রকাশ পায়। প্রাণীর মাংস আদিম মানুষের খাদ্যের এক প্রধান উৎস ছিল। এই ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম ছিল পশু শিকার এবং ফাঁদের দ্বারা প্রাণীকে আটকানো। তাই মানুষের প্রাথমিক যন্ত্রপাতি, বর্শা, ধনুক ও তীর (Spears, bows and arrows), মাছ ধরা বড়শি এবং ফাঁদ এই শ্রেণীর কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় যাযাবরীয় ভ্রমণের শেষ পর্যায়ের পর নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ স্থায়ী জীবন (settled life) যাপন আরম্ভ করে এবং তাদের সাহায্যে পশু পালন আরম্ভ হয়। বন্দি গবাদিপশু, মেষ এবং শূকর ছিল প্রথম পর্যায়ের প্রধান পালিত পশু। এ পর্যায়ে বন্দি প্রাণীর বংশবৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং পশু পালন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারবহনের জন্যও পশু ব্যবহৃত হতে থাকে। পশু পালন খামার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ও স্থান নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়নি।

পশু শিকার বা পশু পালন মানুষের খাদ্য ও কাঁচামালের তালিকা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। মাংস, দুধ, ডিম, খাদ্য এবং চামড়া, লোম, পশম, হাড় ও শিং কাঁচামাল হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রক্রিয়াজাত করে মানুষ অন্যান্য খাদ্য মাখন ও পনির এবং শিল্পজাত নতুন দ্রব্য চামড়া, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। সুতরাং প্রাণী মানুষের

নিকট খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও যন্ত্র সরবরাহকারী এবং শক্তির উৎস, বহন ও টানা কার্যক্রমের বাহন হিসেবে চিহ্নিত হয়। সময়ের অগ্রগতিতে প্রাণীর উপ-উৎপাদিত পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ব্যাপক এবং ভিন্ন বস্তু-মাংস, দুধ, চামড়া ও লোম, মধু, ধম্বল (Rennet), ক্ষুদ্র শক্ত লোম (Bristle) "সছেজ ক্যাসিং" (sausage casings অর্থাৎ পাতলা নলাকার আবরণের মধ্যে মাংসের পুর দেওয়া খাদ্য বিশেষ যা শুকরের অন্ত্র হতে তৈরি প্রভৃতি উৎপাদিত হতে থাকে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণী মানুষকে ভিন্নধর্মী অনেক পদার্থ প্রদান করেছে। কোচিনিল পতঙ্গের দেহ হতে প্রাপ্ত টকটকে লাল রঞ্জক মিঠাই তৈরির রঙ এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্পার্ম তিমি হতে প্রস্তর অম্বর (Ambergris) এর কস্তুরী সদৃশ সুগন্ধ বিদ্যমান। এই কারণে সুগন্ধ প্রসাধন তৈরির ক্ষেত্রে এটা এক অপরিহার্য পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মুক্তা-ঝিনুক (pearl oyster) চিত্রাভ বা রামধনুর বর্ণের অনুরূপ নিঃসৃত বা ক্ষরিত রসের দ্বারা খোলকের অভ্যন্তরে মূল্যবান মুক্তা তৈরি করে।

৮.১২.৩. পরিবহন প্রাণী : ভারবাহী পশু (Beasts of burden) বলতে টানা, বোঝাবহন এবং আরোহণের কাজে ব্যবহৃত প্রাণীকে বোঝায়। প্রাণী সর্গের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণী গ্রুপের মধ্যে ভারবাহী পশু অন্তর্ভুক্ত। বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারবাহী পশুগুলো হচ্ছে স্থলজ বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণী। বৃহৎ আকৃতি সব সময় প্রাণীর অতি শক্তি নির্দেশ করে না। বড় আকার বোঝাবহন ও টানার কাজের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আকার ও শক্তি ছাড়াও প্রাণীকে পরিচালনা করার জন্য প্রাণীর বশ্যতা মান্য করার বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন।

কুকুর, হাতি এবং উট ছাড়া সকল ভারবাহী পশু খুরবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। খুরবিশিষ্ট প্রাণী স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম এবং প্রাণীগুলো দৌড়াতে পারে। তৃণভোজী এবং চারণশীল এই শ্রেণীর খুরবিশিষ্ট প্রাণীগুলো সাধারণত আক্রমণাত্মক ও উচ্ছৃংখল বৈশিষ্ট্য বহন করে না বরং প্রাণীগুলো ভীতু প্রকৃতির। বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণিত প্রাণীর বাধ্যতা বা বশ্যতা (amenabilily) নির্দেশ করে। খুরবিহীন ভারবাহী প্রাণী, কুকুরের অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমত্তা, হাতির বৃহৎ আকৃতি ও শক্তি এবং যেসব স্থানে অন্য প্রাণী টিকে থাকতে পারে না সেসব স্থানে উটের অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিক পরিবহন প্রচলন যে রকম যুগান্তকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল পূর্ববর্তীতে ভারবাহী পশুর দ্বারা পরিবহনও অনুরূপ বিপ্লব সম্ভব করেছিল। প্রাণী মানুষকে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করেছিল।

পশুপালনের সময়কালে সকল মানুষ যেমন পশুপালন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি তেমনি অনেক মানুষ পালিত পশুকে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করেনি। কিন্তু মানুষ যখন তাদের কাজে পশুকে ব্যবহার করেছে তখন সে উপকৃত হয়েছে। পুরাকালের মানুষের পশু নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কুকুর অপরিহার্য প্রাণী ছিল। কৃষি কাজে ষাঁড়ের প্রচলন মাটি চাষের জন্য যেমন ভারী লাঙল ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তেমনি স্ত্রীলোকদের কৃষির অনেক কাজও কমে যায়। অনেক স্থানীয় এলাকা যেমন কেন্দ্রীয় আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চল বা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণী গৃহপালিত পশুর জন্য উপযুক্ত না হলেও সার্বিকভাবে প্রাণিজগত বা রাজ্যের উপযুক্ত প্রাণীকে মানুষ কাজে লাগিয়েছে। তাই গাধা, ঘোড়া এবং ষাঁড় ছাড়াও

নিকট খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও যন্ত্র সরবরাহকারী এবং শক্তির উৎস, বহন ও টানা কার্যক্রমের বাহন হিসেবে চিহ্নিত হয়। সময়ের অগ্রগতিতে প্রাণীর উপ-উৎপাদিত পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ব্যাপক এবং ভিন্ন বস্তু-মাংস, দুধ, চামড়া ও লোম, মধু, ধন্বল (Rennet), ক্ষুদ্র শক্ত লোম (Bristle) "সছেজ ক্যাসিং" (sausage casings অর্থাৎ পাতলা নলাকার আবরণের মধ্যে মাংসের পুর দেওয়া খাদ্য বিশেষ যা শুকরের অন্ত্র হতে তৈরি প্রভৃতি উৎপাদিত হতে থাকে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণী মানুষকে ভিন্নধর্মী অনেক পদার্থ প্রদান করেছে। কোচিনিল পতঙ্গের দেহ হতে প্রাপ্ত টকটকে লাল রঞ্জক মিঠাই তৈরির রঙ এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্পার্ম তিমি হতে প্রস্তর অম্বর (Ambergris) এর কস্তুরী সদৃশ সুগন্ধ বিদ্যমান। এই কারণে সুগন্ধ প্রসাধন তৈরির ক্ষেত্রে এটা এক অপরিহার্য পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মুক্তা-ঝিনুক (pearl oyster) চিত্রাভ বা রামধনুর বর্ণের অনুরূপ নিঃসৃত বা ক্ষরিত রসের দ্বারা খোলকের অভ্যন্তরে মূল্যবান মুক্তা তৈরি করে।

৮.১২.৩. পরিবহন প্রাণী : ভারবাহী পশু (Beasts of burden) বলতে টানা, বোঝাবহন এবং আরোহণের কাজে ব্যবহৃত প্রাণীকে বোঝায়। প্রাণী সর্গের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণী গ্রুপের মধ্যে ভারবাহী পশু অন্তর্ভুক্ত। বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারবাহী পশুগুলো হচ্ছে স্থলজ বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণী। বৃহৎ আকৃতি সব সময় প্রাণীর অতি শক্তি নির্দেশ করে না। বড় আকার বোঝাবহন ও টানার কাজের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আকার ও শক্তি ছাড়াও প্রাণীকে পরিচালনা করার জন্য প্রাণীর বশ্যতা মান্য করার বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন।

কুকুর, হাতি এবং উট ছাড়া সকল ভারবাহী পশু খুরবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। খুরবিশিষ্ট প্রাণী স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম এবং প্রাণীগুলো দৌড়াতে পারে। তৃণভোজী এবং চারণশীল এই শ্রেণীর খুরবিশিষ্ট প্রাণীগুলো সাধারণত আক্রমণাত্মক ও উচ্ছৃংখল বৈশিষ্ট্য বহন করে না বরং প্রাণীগুলো ভীতু প্রকৃতির। বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণিত প্রাণীর বাধ্যতা বা বশ্যতা (amenabilily) নির্দেশ করে। খুরবিহীন ভারবাহী প্রাণী, কুকুরের অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমত্তা, হাতির বৃহৎ আকৃতি ও শক্তি এবং যেসব স্থানে অন্য প্রাণী টিকে থাকতে পারে না সেসব স্থানে উটের অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিক পরিবহন প্রচলন যে রকম যুগান্তকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল পূর্ববর্তীতে ভারবাহী পশুর দ্বারা পরিবহনও অনুরূপ বিপ্লব সম্ভব করেছিল। প্রাণী মানুষকে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করেছিল।

পশুপালনের সময়কালে সকল মানুষ যেমন পশুপালন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি তেমনি অনেক মানুষ পালিত পশুকে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করেনি। কিন্তু মানুষ যখন তাদের কাজে পশুকে ব্যবহার করেছে তখন সে উপকৃত হয়েছে। পুরাকালের মানুষের পশু নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কুকুর অপরিহার্য প্রাণী ছিল। কৃষি কাজে ষাঁড়ের প্রচলন মাটি চাষের জন্য যেমন ভারী লাঙল ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তেমনি স্ত্রীলোকদের কৃষির অনেক কাজও কমে যায়। অনেক স্থানীয় এলাকা যেমন কেন্দ্রীয় আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চল বা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণী গৃহপালিত পশুর জন্য উপযুক্ত না হলেও সার্বিকভাবে প্রাণিজগত বা রাজ্যের উপযুক্ত প্রাণীকে মানুষ কাজে লাগিয়েছে। তাই গাধা, ঘোড়া এবং ষাঁড় ছাড়াও

আরববাসীগণ উট, হিন্দুগণ হাতি, তিব্বতবাসীগণ ইয়াক (Yak), দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানগণ লামা, ল্যাপল্যান্ডের অধিবাসীগণ বল্গা হরিণ, চীনাগণ জলহস্তি এবং এস্কিমোগণ কুকুরের সদ্ব্যবহার করেছে।

সকল ভারবাহী পশুর মধ্যে মানুষের নিকট ঘোড়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রধান পরিবহন প্রাণী ছিল। টানা, বহন ও চড়ার কার্যক্রমের সাথে ঘোড়া জড়িত ছিল। যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবহনের প্রচলনের ফলে ভারবাহী পশুর সংখ্যা ও পশুর কার্যক্রম কমে যায়। মাল বা বোঝা বহনের জন্য গাধার প্রচলন বহু পূর্বে আরম্ভ হয় এবং এখনও পৃথিবীর অনেক স্থানে গাধার এই কার্যক্রম বিদ্যমান। মিউল বা খচ্চর হচ্ছে উষ্ণ এবং বন্ধুর ভূখণ্ড যেমন ভূমধ্যসাগর ও আমেরিকার কিছু এলাকায় এটা উপযুক্ত ভারবাহী পশু। পৃথিবীর উত্তপ্ত ও শুষ্ক অঞ্চলে উট, দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চভূমিতে লামা, তিব্বতের পাহাড়ী ও মালভূমি এলাকায় ইয়াক অপরিহার্য ভারবাহী পশু হিসেবে চিহ্নিত। ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অরণ্যে কড়িকাঠ হেচড়ানো ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমের জন্য হাতিকে কাজে লাগানো হয়।

৮.১৩. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে জীবাণুর দ্বারা অন্য জীবকে নিয়ন্ত্রণ করা। অবাঞ্ছিত প্রাণী এবং উদ্ভিদ গণসংখ্যাকে (unwanted animal and plant population) নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিহ্ন করার জন্য জীববিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ/দমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবাঞ্ছিত জীব বা বনানীর নিয়ন্ত্রণ শিকারজীবী জীব, পরগাছা বা রোগের প্রবর্তন দ্বারা সমাধা করা হয়। অবাঞ্ছিত জীব নিয়ন্ত্রণের অনেক চমকপ্রদ উদাহরণ বিদ্যমান।

ব্রিটেনের অধিবাসীগণ বসতি স্থাপনের পর সেনাবাহিনীর উর্দি বা ইউনিফরমের লাল রঙের জন্য কোচিনিল পতঙ্গ অস্ট্রেলিয়ায় প্রবর্তন করে। এই পতঙ্গের খাদ্যের জন্য মেক্সিকোর নাগফনি বা ক্যাকটাস, কন্টকজাতীয় নাশপাতি (pickly pears) আমদানি করা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ক্যাকটাস বা নাগফনি বাসিন্দাগণ বেড়া তৈরির জন্য লাগাতে থাকে। কন্টক জাতীয় এই নাসপাতি শত্রুবিহীন উপযুক্ত পরিবেশে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ১৯২৫ সালের দিকে ৫ কোটি একর (২ কোটি হেক্টর) এলাকা প্রিকলি পিয়ার দখল করে ফেলে এবং এটা বিস্তার পথের সকল কিছুকে প্রতিহত করে। ব্যাপক কর্ষিত এলাকা এবং চারণভূমিতে মনে হয় পিয়ার অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ দ্বারা জয়লাভ করে দখল করে নেয়। মানুষের বাস্তুভূমি এলাকার উন্মুক্ত অংশ প্রিকলি পিয়ার দখল করে নেয়। সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। ক্যাকটাসের এই ছলনামূলক বিস্তার (insidious spread) প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, ট্রাক্টর দ্বারা ক্যাকটাস ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়, আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেল্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এসিড ছড়িয়ে এগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বিফলে যায়। শেষে মেক্সিকো হতে ক্ষুদ্র মথ অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এসে ক্যাকটাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এই মথ প্রিকলি পিয়ার গাছে ডিম পাড়ে। শূককীট এই বনানীকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এই পদ্ধতি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। শূককীট অতি দক্ষতা ও দ্রুতগতিতে কাকটাস ধ্বংস করে ফেলে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই শূককীটের

একমাত্র খাদ্য প্রিকলি পিয়ার। তাই প্রিকলি পিয়ারের প্রায় বিলুপ্তির সাথে সাথে শূককীটেরও বিলুপ্তি ঘটে। এগুলো অবাঞ্ছিত জীব হিসেবে বৃদ্ধি পায়নি।

অস্ট্রেলিয়ার অবাঞ্ছিত প্রাণী, শশকের নিয়ন্ত্রণ আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জীব নয় রোগ মাইক্সোমেটোসিস ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্তার করে শশক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মানবতার দৃষ্টিকোণ (Humanitarian ground) থেকে এই নিধন যুগ্মকে সমালোচনা করা হয়েছিল। নৈতিক দিক থেকে এটা ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন এইরোগ খরগোশের সংখ্যা হ্রাস করেছে যেটা অন্য কোনো পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য জীববিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ক্ষুদ্র মাছ গ্যামবুসিয়া (Gambusia) ম্যালেরিয়ার মশাকে অনেক এলাকা হতে নিশ্চিহ্ন করেছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহদাকায় ব্যাঙ (Giant toad), বিষাক্ত সেন্টিপেড (poisonous centipedes অর্থাৎ বিষাক্ত বৃশ্চিক কেন্নো) এবং আখক্ষেতের রোগের কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৮.১৩.১. **শত্রু ও ক্ষতিকর প্রাণী :** যখন কোনো প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় তখন সেই প্রাণীকে ক্ষতিকর বা অবাঞ্ছিত প্রাণী বলে চিহ্নিত করা হয়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাণী সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যেমন অস্ট্রেলিয়ার শশক।

সাধারণত ক্ষুদ্র শ্রেণীর জীব মানুষের শত্রু বলে চিহ্নিত। নরখাদক বাঘ পৃথিবীর অনেক স্থানে বর্তমানে মাঝে মধ্যে লোকজনদের উৎপাত করলেও (molest) এই বৃহৎ প্রাণীগুলোকে শিকার বা ধ্বংস করা কদাচিৎ প্রয়োজন দেখা দেয়। বিষাক্ত সাপ মানুষের সাংঘাতিক শত্রু বলে পরিচিত। প্রতি বছর ভারতে প্রায় এক হাজার লোক বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা যায়। মায়ানমারে প্রতি বৎসর তিন হাজারের অধিক লোককে সাপ কামড়ালেও মাত্র এই সংখ্যার ১০% লোক মারা যায়। বড় আকারের কিছু সংখ্যক প্রাণী অবাঞ্ছিত ও উপদ্রব পর্যায়ে পৌঁছলেও প্রত্যক্ষভাবে এগুলো কদাচিৎ ক্ষতিকারক বলে পরিগণিত হয়। প্রাণীর এক অতি সাংঘাতিক ভূমিকা হচ্ছে প্রাণীর দেহের সংরক্ষিত রোগের বিস্তার। ইঁদুরের সাথে জড়িত বুবোনিক প্লেগ স্থান হতে স্থানান্তরে পরিবাহিত হলেও ইঁদুরের সাথে জড়িত মাছি এই রোগ বিস্তারের বাহক।

অনেক ক্ষুদ্র জীব প্রধানত কীটপতঙ্গ এবং সংক্রামক রোগ জীবাণু মানুষের ক্ষতি সাধন, রোগ বহন এবং ফসল ধ্বংস করে। পঙ্গপাল বর্তমানে কম ক্ষতিকারক হলেও অতীতে এটা মানুষের এক বড় শত্রু বলে চিহ্নিত ছিল। আফ্রিকায় ১৯৩০ সালের দিকে প্রতি বছর পঙ্গপাল দ্বারা ফসল ধ্বংসের পরিমাণ ছিল ১.৫ কোটি পাউন্ড। পঙ্গপাল অ্যাক্রিডিডে (Acrididae) গোত্রের অর্থোপটেরাস পতঙ্গ (Orthopterous insect)। ফড়িং-এর (Grasshoppers) সাথে এগুলোর নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিছু সংখ্যক প্রজাতি বিশেষ করে প্রচরণশীল পতঙ্গ (Migratory locust অর্থাৎ *Locusta migratoria*) কৃষির প্রচলন হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাঠের ফসলের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করেছে। যখন এই পতঙ্গগুলো দল বেঁধে পরিযায়িত হয় তখন এই পতঙ্গগুলো তাদের পথের সকল সবুজ বস্তু খেয়ে ফেলে। এই পতঙ্গের দল শত শত বর্গ মাইল এলাকা ধ্বংস করে ফেলে।

অনেক প্রকার ধ্বংসাত্মক কীটপতঙ্গ দ্বারা ফসল আক্রান্ত হয়। ফলে কৃষকগণ সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই শতাব্দীতে তুলাগাছের ক্ষতিসাধক পোকা বা বোল উইভিল (এক প্রকার ক্ষুদ্র কাঁচপোকা) যুক্তরাষ্ট্রে তুলা ফসলের বীজ কোষের, প্লেগ রোগের অনুরূপ ক্ষতি সাধন করে। মেক্সিকো হতে ১৮৯২ টেক্সাসে এই উইভিল (weevil) প্রথম প্রবেশ করে। ১৯০৭ সালে মিসিসিপি এবং ১৯২০ আটলান্টিক উপকূলে এই উইভিল পৌঁছে। এই মহামারী বর্তমানে পোকা নিধনের ওষুধ ছিটিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং অন্যদিকে তুলা উৎপাদন শিল্প (cotton growing industry) শুষ্কতর এলাকায় স্থানান্তর করে এলাকাগুলোতে পানিসেচের দ্বারা তুলা চাষ করা হচ্ছে।

অন্য এক সাংঘাতিক জীব হচ্ছে সেৎসি (Tsetse) মাছি। এই মাছির চার প্রজাতি কেন্দ্রীয় ও পূর্ব আফ্রিকার ব্যাপক স্থানে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এই মাছির জন্য গবাদি পশু এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু পালন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই মাছিগুলো রক্ত শোষক। রক্ত শোষণ প্রত্যক্ষভাবে খুব একটা বিপদসঙ্কুল না হলেও এর ফলে রক্তে এক প্রকার পরজীবী সংক্রমিত হয়, যার ফলে পশুর নাগানার (Nagana) সৃষ্টি হয় এবং মানুষ নিদ্রারোগে (Sleeping sickness or Trypanosomiasis) আক্রান্ত হয়।

এই মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলা, আক্রান্ত বন্যপ্রাণী শিকার করে সংক্রমণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ, মাছি নিধনের ওষুধ ছড়ানো এবং বর্তমানে ওষুধ সেবন দ্বারা প্রাণীর এই ব্যাধি প্রতিরোধক শক্তি সঞ্চয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও আফ্রিকার অনেক এলাকায় এই মাছির ব্যাপক ক্ষতিকর অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

পিপিলিকা ও উইপোকা অনেক সময় এক সাংঘাতিক ক্ষতিকর জীব হিসেবে বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে পরিগণিত হয়। কেবল আফ্রিকায় কয়েক শত প্রজাতির উইপোকা বিদ্যমান। কিছু উইপোকা মাটির অভ্যন্তরে বাস করে। অন্যগুলো মাটি পৃষ্ঠে ঢিবি এবং আবার কিছু সংখ্যক গাছে বাসা বেঁধে বাস করে। বাড়ির মালিকের নিকট উইপোকা এক অতি ভীতিকর জীব। এটি যে কোনো কাগজ, কাঠ বা কাপড় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ইতিহাসবিদদের নিকট অতীতের ঘটনাসমূহের আলোকপাতকারী দালানকোঠা এবং দলিল দস্তাবেজ ধ্বংসকারী এবং আধুনিক কৃষকদের নিকট এই অবাঞ্ছিত কীটের টারমিটারিয়া (Termitaria) কর্ষণের বাঁধা হিসেবে কাজ করে এবং এটি আধুনিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ফাঁদের সৃষ্টি করতে পারে উইপোকা প্রায়শ অসুবিধা সৃষ্টিকারক এবং ধ্বংসকারক হিসেবে পরিচিত হলেও এরা জৈব পদার্থ ধ্বংস ও পচনক্রিয়া সমাধা করে এলাকাকে বর্জ্য মুক্ত করে। এই কার্যক্রম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কেঁচোর কার্যক্রমের অনুরূপ।

৮.১৩.২. ক্ষতিকর জীবাণু : কিছু অল্প সংখ্যক পোকামাকড় দংশন ও হুলবিদ্ধকরণ দ্বারা মানুষের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর ক্ষুদ্র জীব (জীবাণু) রোগ, বিশেষ করে সাংঘাতিক মহামারী রোগের বাহক হিসেবে চিহ্নিত এবং এগুলো ক্রান্তীয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এসব রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর বা সংক্রামক জ্বর (Yellow fever), প্লেগ, নিদ্রারোগ (Sleeping sickness) এবং টাইফাস (উকুন দংশনজনিত) সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বর (Typhus) প্রধান।

এগুলো ছাড়াও কম পরিচিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্লীপদ রোগ (*Filariasis*) পুনরাক্রামণ জ্বর (Relapsing fever) এবং কালা জ্বর (*Kala azar*) ক্রান্তীয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। ম্যালেরিয়াকে অতি পুরাতন শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়। সম্ভাব্য ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে কমপক্ষে ১৫৬ কোটি লোক বাস করে। পূর্বে ম্যালেরিয়ার কারণে প্রচুর সংখ্যায় লোক মারা যেত। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ এর প্রচেষ্টার ফলে ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা কমে গেলেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ম্যালেরিয়া বিস্তারকারী মশা গতানুগতিক ওষুধ প্রয়োগ করে একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি ম্যালেরিয়া জ্বরকে গতানুগতিক ওষুধ দিয়ে জ্বর মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই নতুন উদ্যমে মশা এবং ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ম্যালেরিয়া মানুষকে না মেরে ফেললেও মানুষকে দুর্বল করে ফেলে, দৈহিক শক্তি শুষে নেয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি শেষ পর্যায়ে আনে। সুতরাং মানুষের বাস্তব এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু হচ্ছে রোগজীবাণু।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের উদ্ভিদকুল এবং প্রাণিকুল

৯.০. উদ্ভিদকুল

ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু এবং উর্বর মৃত্তিকা এ দেশটিকে প্রাকৃতিক সবুজ উদ্ভিদ আবরণে আবৃত করে রেখেছিল। আর এই আবরণে বিচিত্র ধরনের প্রাণিকুলের বসবাস ছিল। পরবর্তীকালে মানুষের আগমন প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের উপর বিরূপ ফলাফল, বনানীর ও প্রাণীর অপসারণ সীমিত পর্যায়ে মানুষের অভিগম্য স্থান হতে শুরু হয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে মানুষের সংখ্যা ও তাদের জ্ঞানের অগ্রগতিতে সম্পদ প্রাপ্তি ও এগুলোর অতি আহরণের লিপ্সা জড়িত হয়ে উদ্ভিদের অপসারণ প্রথমদিকে অতি ধীরগতিতে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে অপসারণ গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে এটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বাংলাদেশে চরম বিপর্যয়ের পর্যায়ে নেমেছে। এজন্য বাংলাদেশের অতি সীমিত এলাকা ছাড়া সমগ্র দেশটি কর্ষিত ভূদৃশ্য (cultivated landscape), কৃষি ফসলের বনানীতে আবৃত হয়ে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত ১০ গোত্রের উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায়—যেগুলোর অধিকাংশই চাষাবাদভুক্ত। এগুলো হচ্ছে—

ক. Graminae গোত্রের ঘাস (grasses) ;

খ. Leguminosae গোত্রের ডাল বা কলাই, চীনাবাদাম, তেঁতুল প্রভৃতি ;

গ. Compositae গোত্রের সূর্যমুখী, গুজিতিল ইত্যাদি (sunflower, gujitil etc.) ;

ঘ. Scrophulariaceae গোত্রের ধানী জমির কিছু কিছু আগাছা ;

ঙ. Malvaceae গোত্রের তুলা, ঢেঁড়স ইত্যাদি (cotton, lady's finger etc.) ;

চ. Acanthaceae গোত্রের হারগোজা, বাসক প্রভৃতি (hargoza, basak etc.) ;

ছ. Euphorbiaceae গোত্রের রেড়ির তেলজাতীয় বৃক্ষ, রাবার, লটকন, প্রভৃতি (castor oil, rubber, latkan etc.) ;

জ. Cyperaceae গোত্রের হোগলা (sedges) ;

ঝ. Convolvulaceae গোত্রের মিষ্টি আলু, মরনিং গ্লোরি (পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ) প্রভৃতি (sweet potato, morning glory etc.) ; এবং

ঞ. Labiatae গোত্রের পুদিনা, তুলসী ও অন্যান্য ভেষজ লতাপাতাজাতীয় বনানী (mint, basil and other herbe।

এগুলো ছাড়া Palmae গোত্রের বাঁশ, তাল (palm), Dipterocarpacae গোত্রের গর্জন ও অন্যান্য (garjan etc.) Cucurbitaceae গোত্রের বিভিন্ন প্রকারের শাকসবজি (various vegetables), Asclepiadacea গোত্রের আকন্দ ও অন্যান্য (Akanda etc.) এবং Magnoliaceae গোত্রের চম্পা (*Champa* etc.) ও অন্যান্য বনানী অন্যতম।

বাংলাদেশের অতি সাধারণ শ্রেণীর বহুল সংখ্যক বৃক্ষ হচ্ছে আমগাছ (Mango-*Magnifera indica*)। বাংলাদেশের উত্তর কেন্দ্রীয় অংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশের দক্ষিণে আমগাছ বসতবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত আকারে এবং এলাকা দুটির অন্যত্র বাগান আকারে প্রধান গাছ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। সুপারি গাছ (*Areca catechu*) সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রয়েছে। এই গাছের সংখ্যা আনুমানিক ১১ কোটি ধরা হয়েছে। এই গাছ বাগান আকারে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ এবং পূর্বাংশে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

জলাশয় (নদী, পুকুর, খাল, বিল) সংলগ্ন এলাকায় মাদার (Madar—*Erythrina indica*), জিয়ল বা বিডি (Jiyol or Bidi-*Lannea grandis*) এবং হিজল (Hijol-*Barringtonia acutangula*) প্রধান ও সাধারণ গাছ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। কাটা ডাল মাটিতে পুঁতে রাখলে জিয়ল গাছ জন্মে। তাই এগুলো সাধারণত বেড়া আকারে লক্ষ্য করা যায়।

তরুবীথিকার (groves) অভ্যন্তরে কাঁঠাল (Jak fruit—*Artocarpus heterophyla*), জাম (Jam—*Syzygium jambolana*), কলা (Banana—*Musa sapientum* ও *paradisiaca*) এবং দক্ষিণে নারিকেল গাছ (Coconut—*Cocos nucifera*) হচ্ছে অন্য শ্রেণীর সাধারণ ও বহুল সংখ্যার গাছ। খেজুর গাছ (Khejur palm—*Phoenix sylvestris*) ও তাল গাছ (Tal palm-*Borassus flabellifer*) তরুবীথিকা কুঞ্জবন হতে দূরের জলাশয়, রাস্তা-ঘাট বা জমির 'আইল' (জমির সীমা নির্ধারণের দীর্ঘাকৃতি মাটির সরু উঁচু অংশ)-এ জন্মে থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্পল গাছ তরুবীথির প্রান্ত এলাকায় জন্মে। ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে এলাকায় পর্ণকাণ্ডজাতীয় গুল্মও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্নাগোত্রীয় গাছ (Orchids) যেমন—জীবন্তী (Jibanti-*Desmostrichum fimbriatum*), বুদবর (Budbar-*Eulophia Muda*), রাস্না (Rasna-*Vanda tessellata*), সালিব মিশ্রি (Salib-misri-*Eulophia campestris*) এবং সেথুলি (Shethuli-*Zauxine strateurnatica*) ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জন্মে থাকে।

উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠের প্রান্ত এলাকা, রেলপথ ও রাস্তার বাঁধে এবং পতিত ভূমিতে বহুবর্ষজীবী গাছ যেমন *Jatropha gossypifolia*, বেগুন (*Solanum indica*), লজ্জাবতী (*Mimosa pudica*) ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পর এই গাছগুলোসহ প্রধান তৃণজাতীয় ঘাস-দূর্বা (*Cynodon dactylon*) এবং ছন ঘাস (*Imperata arundinacea*) দৃষ্টিগোচর হয়।

বট (Banyan—*Ficus bengalensis*) এবং অশ্বত্থ বা ওসোট গাছ (Oshot—*Ficus. religiosa*) বৃহৎ শ্রেণীর বৃক্ষ এবং এগুলো ডিম্বুর গোত্রের বৃক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (Fig family)। এগুলো ছায়াদানকারী বৃক্ষ বলে পরিগণিত। কড়ই গাছও (Rain tree—*Samania saman*) বৃহৎ আকার ধারণ করে। প্রথম দুই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক গাছ সাধারণত পুরাতন দালান-কোঠা বিশেষ করে ছোট শহরের সরকারি অফিস ভবন যেমন—কোর্ট ভবন প্রাঙ্গন ও অতি পুরাতন রাস্তার সংযোগস্থল বা মোড়ে লক্ষ্য করা যায়।

বর্ণিত দুই শ্রেণীসহ তৃতীয় শ্রেণীর গাছ প্রায় অবলুপ্তির পথে। প্রলয়ঙ্কারী ক্রান্তীয় ঝড়ে (টাইফুন) গাছগুলো উপড়িয়ে পড়ে। পুরাতন গাছ কাটা হয় বিশেষ করে রাস্তা চওড়া ও গাছ পুনঃরোপণ করার জন্য। ফলে বর্ণিত গাছগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। এই গাছগুলোর কাণ্ডের (ভূমি উপরে ৩/৪ উর্ধ্বে) ঘের ৩½ মিটার বা তার উর্ধ্বে লক্ষ্য করা যায়।

জলাভূমি, খাদ এবং অনেক পুষ্করিণীতে বিভিন্ন প্রজাতির বনানী বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে পানি-লেটুস (Water lettuce-*Pistia stratoites*), অগভীর জলজ পুষ্পল উদ্ভিদ (Duckweed-*Lemna minor*), শাপলা, পানি পদ্ম (Water lily-*Nymphea stellata*), শালুক প্রভৃতি প্রধান। পানি প্রবাহের গতিপথের প্রান্ত এলাকায় অরুন্ডো ডোনাক্স (Arundo donax), আখ (*Sacchrarum spontaneum*) এবং বিভিন্ন প্রকারের *Andropogon* জাতীয় নলখাগড়া ও দীর্ঘাকৃতি তৃণ জন্মে থাকে। মধুপুর ভূখণ্ডের শুভ্রফুল, বাঙলা গোলাপ (Bengal Rose-*Rosa involucrata*), ছাতিম এবং নতুন জলবায়ু পরিবেশ সহ্যকারী বাগান গোলাপও বাংলাদেশের বনানীর মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে রয়েছে।

বাংলাদেশের বিশেষ করে শহর ও নগর এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর তীব্র সুগন্ধী ফুলগাছের চাষ করা হচ্ছে। রজনীগন্ধা (Rajanigandha-*Polianthes tuberosa*), বেলী (Beli-*Tabernaemontae*), বকুল (Bakul-*Mimusops elengi*), কামিনী (Kamini-*Murraya exotica*), জেসমিন (Jasmine-*Jasminum officinalae*), কুইন অব দি নাইট (Queen of the night—*Nyctanthes arbortristis*) প্রভৃতি ফুলগাছের চাষের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৯.১. বন

বাংলাদেশের বনাঞ্চলে যুথচর বা সঙ্গলিপ্সু (gregorious) প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান থাকলেও প্রধান একক বা দ্বি-প্রজাতি উদ্ভিদের প্রাধান্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের মধ্য এবং উত্তরাঞ্চলের অরণ্যে শাল (Sal-*Shorea robusta*) এর প্রাধান্য এবং সুন্দরবনে গেওয়া (Gewa *Excoecarica agallocha*) ও সুন্দরী (Sundri-*Heritiera* fomes) যুথচর হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার অরণ্যে গর্জন (Garjan—*Excoecaria agallocha*) এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ গাছ লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের অরণ্যগুলোতে ক্রান্তীয় কিছু কিছু প্রজাতির ওক এবং বাদামজাতীয় গাছও জন্মে থাকে (মানচিত্র ৯.অ)।

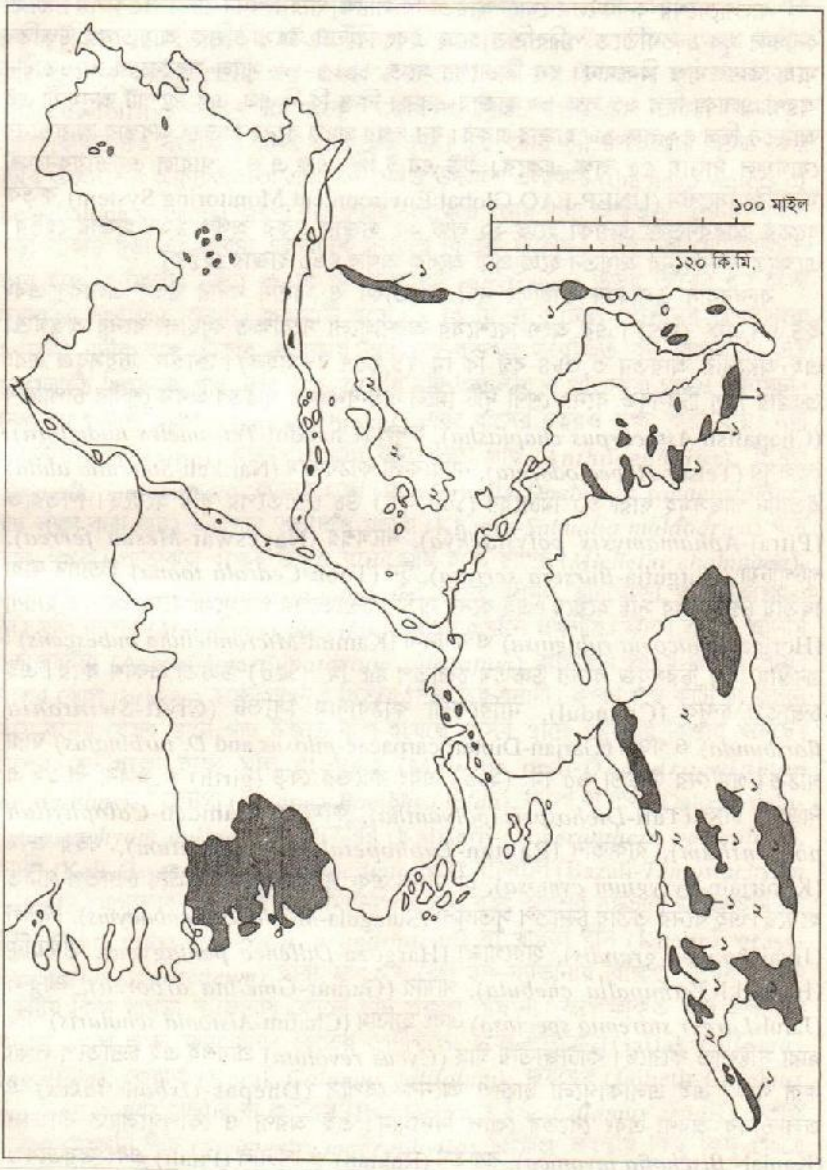

মানচিত্র ৯.অ : বাংলাদেশের অরণ্য। ১. ঘন বন, ২. বিক্ষিপ্ত বন এবং ঝোপ-ঝাড়

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মোট আয়তনের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়। কারণ বনাঞ্চল খুব দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন উৎসভিত্তিক আয়তনের উদ্ধৃতির মধ্যে তারতম্যও বিদ্যমান। বন বিভাগের মতে, ১৯৮১–৮২ সালে সরকারের আওতাধীন অরণ্য এলাকা ছিল ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার একর। কিন্তু বি.বি.এস. এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই আয়তন ছিল ৫২ লক্ষ ৯৮ হাজার একর। বন দপ্তর প্রদত্ত বনের বিভক্ত অবস্থার আয়তনের যোগফল দাঁড়ায় ৫৫ লক্ষ একরে। ইউ.এন.ই.পি.–এফ.এ.ও. গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম (UNEP-FAO Global Environment Monitoring System) কর্তৃক বৃক্ষের আবরণভুক্ত এলাকা হচ্ছে ২২ লক্ষ ২৫ হাজার একর অর্থাৎ ৯২৭ হাজার হেক্টর। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের আয়তন হচ্ছে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৪৬০ হাজার হেক্টর।

বান্দরবান এলাকার কাছালং নদী উপত্যকা ও মাইনি নদীর উৎস এলাকা এবং ইউ.এস.এফ. (USF) এর অংশ বিশেষের অরণ্যগুলো সংরক্ষিত কাছালং বনের অন্তর্গত। এই অরণ্যের আয়তন ৩,৩৮৪ বর্গ কি.মি. (১,৩০৭ বর্গমাইল)। ক্রান্তীয় চিরসবুজ এবং ক্রান্তীয় মিশ্র চিরসবুজ বনের শ্রেণী দুটি মিলে এই বনাঞ্চল গঠিত। প্রথম শ্রেণীর চাপালিশ (Chapalish-*Astocarpus chaplasha*), চন্দুল (Chandul-*Tetrameles nudeflora*), তেলসুর (Telsur-*Hopea odorata*), নারিকেলী কাঠবাদাম (Narikeli-*Sterculia alata*) ইত্যাদি গাছসমূহ দ্বারা ৩০ মিটারের (১০০ ফুট) উঁচু চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হয়েছে। পিতরাজ (Pitraj-*Aphamamyxis polystachya*), নাগেশ্বর (Nageswar-*Mesua ferrea*), গুটগুটিয়া (Gutgutia-*Bursera serrata*), টুন (Toon-*Cedrala toona*) ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হয়েছে। এই বনের তৃতীয় চন্দ্রাতপের গাছগুলো হচ্ছে প্রধানত হরিনা (Horina-*Panicovia rubiginsa*) ও কামিনী (Kamini-*Micronneluna pubescens*)। ক্রান্তীয় মিশ্র চিরসবুজ বনের উচ্চতম চন্দ্রাতপ ৪৫ মি. (১৫০) উচ্চতা প্রকাশ করে। এই চন্দ্রাতপ চুন্দুল (Chundul), নারিকেলী কাঠবাদাম সিভিট (Civit-*Swintonia floribunda*) ও গর্জন (Garjan-Dipterocarpacae-*pilosus* and *D. turbinatus*) দ্বারা গঠিত। গর্জনের উচ্চতা ৬০ মি. (২০০) এবং কাণ্ডের বেড় (girth) ৩.৬ মি. বা ১২ এ দাঁড়ায়। টালি (Tali-*Dichospsis polyantha*), কামদেব (Kamdeb-*Calophyllun polyanthum*), রাকতান (Raktan-*Laphopetalum fimbriatum*), খইর জাম (Khoirjam-*Syzygium cymosa*), চাপালিশ এবং নাগেশ্বর দ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রাতপ গঠিত হয়েছে। এই বনের তৃতীয় চন্দ্রাতপ সুতাগুলা (Sutagula-*Machilus bombacyms*), জিয়ল (Jiyal-*Lannea grandis*), হারগোজা (Hargoza-*Dillenec pentagyna*), হরিতকি (Haritaki-*Terminalia chebula*), গামার (Gamar-*Gmelina arborea*), জারুল (Jarul-*Larger staremia speciosa*) এবং ছাতিম (Chatim-*Alstonia scholaris*) গাছ দ্বারা সৃষ্টিলাভ করেছে। কাঁটাজাতীয় গাছ (*Cycus revoluta*) প্রায়শই এই চন্দ্রাতপে লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকাগুলো ছাড়াও অনেক ধেপাস (Dhepas-*Oxbow lakes*) এ জলাভূমির অরণ্য এবং বেতের ঝোপ বিদ্যমান। এই অরণ্য ও ঝোপগুলোতে কাঁজাল (Kanjal- *Bischofia javanica*), রকতন (Raktan) ও পিটালি (Pitali) এবং জয়তবেত (Jaitbeth- *Calamus vininalis*) নামক বেতের অফুরন্ত ঝাড় (luxurious growth) লক্ষ্য করা যায়। ধেপাসহ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বা জলাশয়গুলো পলি দিয়ে রুদ্ধ (silted up) অবস্থা ধারণ করলে জারুল ও জামগাছের বিস্তার ঘটে এবং বিক্ষিপ্ত বাঁশ ঝাড় (ঝোপ)

সচরাচর লক্ষ্য করা যায়। এ অরণ্যগুলো ব্যাপক এলাকা দখল করে থাকলেও বন দপ্তর কর্তৃক বিভক্ত ১৯ বিভাগের মধ্যে এই বিভাগ টিম্বার (timber) উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং জ্বালানি কাঠের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। এই কম উৎপাদন হার অগম্যতার (inaccessibility) কারণে ঘটে থাকে। রাঙখিয়াং, সিতা পাহাড় এবং বরকল (রামগড়) এলাকার অরণ্যও সংরক্ষিত বনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রাঙখিয়ার নদী উপত্যকার অরণ্য থেগা নদীর উর্ধ্বাংশের অরণ্য এলাকা এবং নদীবাহিত উর্ধ্বাংশ এলাকায় (the head waters of the subalong streams) অরণ্য রাঙকিয়াং সংরক্ষিত বনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শৈচাল মুয়াল খাড়া পাহাড় চূড়া এই অরণ্য এলাকাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন নগর হতে কর্নফুলীর নদীর ৭২ কি.মি. উজানের (upstream) উভয় তীরের বন হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি সংরক্ষিত অরণ্য। রাঙামাটি হতে ৪৮ কি.মি. দূরে টোল স্টেশনের অপরদিকে কর্ণফুলী নদীর বাম তীরের এলাকায় অবস্থিত বরকল সংরক্ষিত বন বিদ্যমান। এই বনগুলোতে চিরসবুজ গাছ এবং আর্দ্র ক্রান্তীয় নদী অঞ্চলীয় ও পাতাঝরা গাছও বিদ্যমান। বনগুলোতে বাঁশ ঝোপ (Bamboo brakes) এবং ঘাসের চত্বরও লক্ষ্য করা যায়। নদী অঞ্চলীয় (riveraine) আর্দ্র-পাতাঝরা বনে কদম গাছ (*Anthocephalus*), শিমুল (*Salmalia malabarica*), বান্দেরহোল্লা (Banderholla-*Duabanga sonneratoides*) গাছ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যের তলদেশে খাগরা (Khagra-*Salmalia malabarica*) ঘাস জন্মে থাকে। পাতাঝরা বৃক্ষের উন্মুক্ত বনের গাছ হচ্ছে চাম্পা (*Michelia champaca*), চিকরাশি (Chikrasi-*Chukrassia tabularis*), কড়ই, শিমুল, হারগোজা, বন্দেরহোল্লা ও টুন। মুলি বাঁশের (*Melocanna baccifera*) প্রাচুর্য এখানে লক্ষণীয়। ফাঁকা অংশে আসাম লতাজাতীয় (Assam lota-*Eupatorium odoratum*) আগাছার প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। বাঁশের ঝোপ (brakes) হচ্ছে প্রধানত দ্বিতীয় সিরিজের বনানী। কারণ গাছ কাটা বা আগুন দিয়ে বনের যেসব স্থানে গাছ উজাড় করা হয়েছে সেসব স্থানে এগুলোর বিস্তার ঘটেছে। বাঁশের শ্রেণীগুলো হচ্ছে মুলি বা ওরাহ (Muli or orah-*Denodrocalamas longspathas*), মিটেনগা (Mitenga-*Bambusa tulda*), দালো বা দালু (Dalo or dalu-*Teinostachyum dulloa*), ক্যালিসেরির (Kaliserii-*Oxyteranthera ouriculata*), ক্যালি (Kali-*Oxyteranthera negrociliata*) এবং ব্যাজালি (Bazali-*Teinostachyum grifithii*)। এগুলোর মধ্যে মুলি এবং মিটেনগা প্রধান। বৃহৎ অংশের স্যাভানা বা তৃণভূমি ছন ঘাস (Shon grass-*Imperata arundinacea*) বা খাগড়া ঘাস (Khagra grass-*Saccharum sponteneum*) দ্বারা আবৃত থাকে। ছন-স্যাভানায় বিক্ষিপ্ত গাছের বিস্তার লক্ষণীয় কিন্তু খাগড়া স্যাভানায় কোনো গাছ প্রকাশ পায় না। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এলাকায় বেতের ঝোপ লক্ষ্য করা যায়। বেতের শ্রেণীগুলো হচ্ছে গাল্লাক (Gallak-*Calamus flagellum*), কেরাক (Kerak-*Calamus talifolum*), জয়বেথ (Jaibeth-*Calamus vaminalis*) এবং বান্দারি বা ক্যারিস (Banderi or Karis-*Calamus tenuis*), প্রশস্ত পাতার মেহগনি গাছ (*Swietenia macrophylla*) বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণ তাদের নিজস্ব ভূমিতে রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রচেষ্টায়ও এই গাছসহ অন্যান্য বিদেশী গাছ ও দেশী গাছ খাস জমি, রাস্তা ও বাঁধে রোপণ করা অব্যাহত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কাপ্তাইয়ের নিকটে ধামেশ্বরায় ১৮৯১ সালে বনায়নের জন্য

প্রশস্ত পাতার মেহগনি গাছ লাগানো হয় এবং এই বিদেশী গাছ এখানকার পরিবেশের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়। এরপর চট্টগ্রাম এলাকার অনেক স্থানে এই গাছ রোপণের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এই অঞ্চলে চট্টগ্রামের সেগুন গাছ বিদেশী দক্ষিণ ভারতীয় সেগুন গাছ অপেক্ষা উপযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় এই গাছের চাষও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সীমিত আকারে হলেও শুরু হয়েছে।

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার পাহাড়গুলোতে সংরক্ষিত বন ছাড়াও শ্রেণিবিহীন রাষ্ট্রাধীন বন (unclassed state forests) বিদ্যমান। বনাঞ্চল দপ্তরের আরণ্যের শ্রেণী, দক্ষিণ পাহাড়ীয় ভূখণ্ড বিভাগের (hill tracts south division) কাঠের মোট উৎপাদনের অর্ধেক এই অশ্রেণীভুক্ত বন হতে আসে। এসব বন অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করা হয়। এই শ্রেণীর বন ৫,৪৬২.৭৬ বর্গ কি.মি. এলাকা দখল করে রয়েছে। এই বনভূমির এক-চতুর্থাংশ গাছের আওতায় রয়েছে। অবশিষ্ট এলাকা বাঁশ, আসাম লতা এবং ইম্পোরাটা তৃণ-ভূখণ্ডের দিয়ে আবৃত। এই বন এলাকাগুলো অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এই অবনতি স্থান পরিবর্তন চাষ অর্থাৎ জুমের সাহায্যে প্রধানত সংঘটিত হয়েছে। পরবর্তীতে জুম শ্রেণীর চাষ পরিত্যক্ত এলাকায় দ্রুতগতিতে আসাম লতা (Assam lata-*Eupatorium odoratum*), বাঁশ বা ছন (Shon- *Imperata arundinacea*) প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। কক্সবাজারের সংরক্ষিত বন বিভাগের এলাকাগুলো হচ্ছে মাতামহুরী নদীর বদ্বীপ, টেকনাফ, রাজু, গারজানিয়া, হারবাগ এবং খুটনা খালি। মাতামহুরী নদীর বদ্বীপ এর চকোরিয়া বনভূমির উদ্ভিদ প্রজাতি সুন্দরবনের অনুরূপ। কিন্তু এখানে বিশেষ ধরনের বনানী, চুলিয়া কান্ত (Chulia Kanta-*Dalbergia spinosa*) এবং নুনিয়ার (Nunia-*Aegialites rotundifolia*) প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র টেকনাফ উপদ্বীপ এলাকা জুড়ে টেকনাফ অরণ্য, মাতামহুরী নদীর শীর্ষ এলাকাব্যাপী বৃহৎ সংরক্ষিত বন এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য এলাকা। সাঙ্গু হতে নাফ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘাকৃতি পাহাড় শ্রেণীগুলো এই বিভাগের অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রাম উপঅঞ্চলের অন্যান্য অরণ্যের অনুরূপ পাহাড় শ্রেণীগুলোর পশ্চিম ঢালে উন্মুক্ত পাতাঝরা এবং উপত্যকা ও পূর্বঢালে আর্দ্র চিরসবুজ অথবা ক্রান্তীয় মিশ্র চিরসবুজ অরণ্য বিদ্যমান। এই বন বিভাগের এলাকায় গর্জন শ্রেণীর গাছের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ঝাউ বন (Jhau-*Casuarina equisetifolia*) সমুদ্র সৈকতের অনেক স্থানে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণের সমুদ্র সৈকত সমভূমির এই সকল বনের তলদেশে *Ipomoea biloba* সহ মাদার গাছ জন্মে থাকে। বৃহৎ সীতাকুণ্ড, পটিয়া, জলদি এবং সাঙ্গু অরণ্য চট্টগ্রাম বন বিভাগের অন্তর্গত। সীতাকুণ্ড পাহাড়ের সংরক্ষিত বন, পাহাড়ের পশ্চিম ঢালের উন্মুক্ত পাতাঝরা এবং পূর্ব ঢালের মিশ্র চিরসবুজ শ্রেণীর গাছ নিয়ে গঠিত। এ বনের হাজারিখিলে বনবিদ্যাভিত্তিক বাগান (Silvicultural garden) অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ প্রজাতি যেমন—রাবার (Rubber-*Hevea brasiliensis*), পাদউক (Padauk), পিনকাদো (Pynkado), বিজুশাল (Bijosal-*Pterocarpus marsupium*), রোজউড (Rosewood-*Dalbergia latifolia*), মাজারি (Majari-*Anogeissus acuminata*) এবং চন্দনকাঠ (Sandalwood-*Pterocarpus santalimus*) চাষ করা হয়েছে এবং এগুলোর ফলাফলও সন্তোষজনক। রাওজানের নিকট বেশ ব্যাপক এলাকায় রাবারের চাষ শুরু হয়েছে।

বন দপ্তরের সিলেটের সংরক্ষিত বন বিভাগের এলাকা চারটি উপবিভাগে বিভক্ত। হবিগঞ্জ উপবিভাগে রঘুনন্দন পাহাড়, তরপ পাহাড়ের অংশবিশেষ, সাতগাঁও–দিনাজপুর পাহাড় এবং উচৈলের (uchail) অরণ্য অন্তর্ভুক্ত। এই উপবিভাগের বনের আয়তন ৭৭.৮২ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম ভালুগাছা (লওয়াছড়া), বরশিঝুরা, ভাটেরা, হারারগঞ্জ এবং পাথারিয়া ও সাতগাঁও–দিনাজপুরের পাহাড়ের অংশবিশেষের অরণ্যসমূহ মৌলভীবাজার উপবন বিভাগের অন্তর্গত এবং এর আয়তন ১৩৫.৪০ বর্গ কি.মি.। উত্তর সিলেট উপবিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে টিলাগড়, বাটেশ্বর (Bateshor), রাণীখাই, বতরগুল, খাদিমনগর, সারি এবং জাফলং–এর বনসমূহ। এই উপবিভাগের বনগুলো ১২.৯৭ বর্গ কি.মি. এলাকা অধিকার করে রয়েছে। লৌরগড় এবং ডিপচর (Dipchor) এর বনদ্বয় নিয়ে সুনামগঞ্জ উপবন বিভাগ গঠিত এবং এর আয়তন ৫.৩০ বর্গ কি.মি.। এ বনগুলো হচ্ছে বেসরকারি এবং অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন।

হবিগঞ্জের (দক্ষিণ সিলেট ও মৌলভীবাজার) বনে ক্রান্তীয় চিরসবুজ গাছ দ্বারা তিনটি চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হয়েছে। ঊর্ধ্বের চন্দ্রাতপ সৃষ্টিকারী গাছ হচ্ছে গর্জন, চাপালিশ, কড়ই, চন্দুল, রাকতন এবং বান্দরহোল্লা। চিকরাশী, টুন, নাগেশ্বর, গামার, রতা (Rata-*Amoora walichii*) ও গন্দোরী (Gondori-*Cinnamomum cecidodaphne*) গাছ দ্বারা মধ্যম চন্দ্রাতপ গঠিত। আর নিম্ন চন্দ্রাতপের গাছগুলো হচ্ছে জারুল, কাঞ্চন (Kanchon-*Buhinia* spp.) এবং বাঁশ। দারল, পারুয়া, পেচা, ডাল্লো, ওরা, বাজালি, কালি, মিটেঙ্গা এবং মুলি হচ্ছে এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের বাঁশ। এখানকার মুলি বাঁশ চট্টগ্রামের মুলি বাঁশ অপেক্ষা নিম্নমানের। উত্তর সিলেট ও সুনামগঞ্জ বনদ্বয়ে হিজল, জাম ও জারুল গাছ এবং নলখাগড়া ও শরজাতীয় একরা (Ekra-*Erianthus revaneae*) বনানী, বা নলখাগড়া (Reed) লক্ষ্য করা যায়।

সিলেটের অরণ্যগুলোতে গাল্লা (Galla-*Damaenorps jenkinsiana*), হর্না (Horna-*Calamus latifolius*), সুন্দি (Sundi *Calamus guruba*) এবং জৈত বেতজাতীয় বেত (Cane) লক্ষ্য করা যায়। এই বেতগুলো অতীতে অতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাতিপাতা (Chhatipata-*Licuala peltata*) গাছের পাতার দ্বারা বৃহৎ বা চওড়া আকারের কানাবিশিষ্ট (Wide brimmed) টুপি বা হ্যাট (ঝাপা) তৈরি হয়।

ঢাকা ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলের বনভূমিগুলো একত্রে এক অবিচ্ছিন্ন বনভূমি সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রধান বন মধুপুর ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং তা পৃথকভাবে ভাওয়াল, আতিয়া, কাগমারি এবং মধুপুরের গড়ের অরণ্য নামে পরিচিত। এগুলো একত্রে গড় গাজালি (Garh Gazali) বলে পরিচিতি। প্রতি বনের অনেক সীমা বিদ্যমান এবং এগুলো ভূমির প্লট এবং বসতবাড়ির সাহায্যে পৃথক হয়ে রয়েছে। আতিয়া এবং কাগমারীর বন এলাকা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে এবং মালিকানাবিহীন লোকজন এই এলাকাকে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। মধুপুর গড়ের বনভূমিতে প্রধানত শাল, সালকোপিক (Sal. Salcoppices) গাছ (যা গজারি নামে পরিচিত) লক্ষ্য করা যায়। গজারি বৃক্ষ শাল গাছের অনুরূপ উচ্চতা বা পুরুত্ব প্রকাশ করে না। এই বনগুলোর শাল গাছ (গাজায়ের) (Sal Gazair) তৃতীয় শ্রেণীর গুণাগুণ বিশেষ করে গাছের পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। শাল গাছ ছাড়া এই বনগুলোর অন্যান্য গাছ হচ্ছে আজুলি (Ajuli-*Dillenmia pentagyna*), কুম্ভি (Kumbhi-*Careya arborea*), বহেরা (Bahera-*Terminalia belerica*), জিয়ল (Jiyal-*Lannea grandis*), দিধা

(Didha-*Laegerstroemia*), কৈকা (Kaika *Adina cordifolia*), গান্ধিগাজারি (Gandhi ghajari *Milliusa velutura*) এবং চাপালিশ। শাল (গজারি) বনের তলদেশে অতি সীমিত বনানী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্যত্র বনের তলদেশের বনানী যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এই বন ভূমির তলদেশীয় বনানীগুলো হচ্ছে ফুলকুড়ি সুটি (Fulkuri sotti-*Pennisetum setosum*), সর্পগন্ধা, কালমেঘ, বাসক (Sarpagandha, kalomegh, basak), কাঁটাখই (Katakhai-*Bridelia retusa*), বেত (Cane-*Calamus tenuis*), বন আম (Bon-Am-*Mangifera oppositifolia*), চিরতা, সোনালু (Chirata, shonalu) এবং বিরক্তিকর আগাছা যেমন স্প্যাথোলোবাস (Spatholobus), রক্সবারঘিল (Roxberghil–*Entada ascanden*), *Mucana pruriens* এবং স্বর্ণলতা (Sharnolata-*Cuscuta reflexa*)। গুপ্ত বৃন্দাবনে বেঙ্গল কফি (Bengal coffee-*Coffea bengalensis*) গাছ লক্ষ্য করা যায়।

এই এলাকার অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বনভূমিতে ব্যাপক এলাকা জুড়ে কোরি (Korii) প্রধান বনানীসহ তলদেশে কুরচি (Kurchi), আকন্দ (Akanda), মানকাঁটা (Mankata-*Randia dometorum*), খড় ঘাস (Thatch grass-*Arundinacea cylindrica*) এবং লজ্জাবতী লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু মধুপুর ভূখণ্ডের অরণ্যে কোনো বাঁশ লক্ষ্য করা যায় না। সুসাঙ পাহাড় শ্রেণীর উত্তর দিক বরাবর ১১২.৬৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেখাকারে ক্ষুদ্রফালি আকারে বন বিদ্যমান। অন্যত্র ফুলকুড়ি এবং বাঁশভিত্তিক বন বিদ্যমান। এই এলাকায় বনায়ন করার ক্ষেত্রে শাল গাছ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাছাড়া গর্জন, কাজুবাদাম (Cashew nut), রাবার, কফি, টেন্ডু গাছ (Tendu-*Dspyros melanoxylon*) প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই এলাকাসমূহের বনে কফি এবং টেন্ডুর প্রচলন করা সম্ভব এবং এই গাছগুলোর ভবিষ্যৎ এখানে উজ্জ্বল। এই এলাকার বনভূমির শত্রু–মানুষ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার আগুন ছাড়া প্রধান শত্রু হচ্ছে পত্রশূন্যকারী ড্যাসিচিরা হর্সফিল্ডি (Dasyichira horse fielde) এবং তসর সিল্কসহ (Tassor silk moth Antheraea paphia)।

বাংলাদেশের বন দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সংরক্ষিত উত্তর বন বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের ধামুইর হাট, গোবিন্দগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ, দিনাজপুর, খানসামা এবং হরিপুর থানার ১২টি বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বনগুলো নিয়ে গঠিত। এ বনগুলোর বৃক্ষের পরিবর্ধন তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। প্রায় সকল বনভূমিতে শাল গাছ হচ্ছে প্রধান। এই গাছ ছাড়াও কিছু সোনালু এবং *Hollarhino antidysenterica* গাছ এই সকল বনভূমিতে লক্ষ্য করা যায়। এই বনগুলোতে শিশু (Shisham-*Dalbergia sissoo*), কাথ (Kath-*Acacia catechu*) এবং টেণ্ডু গাছ প্রবর্তন করা সম্ভব। উত্তরের অধিক বৃষ্টিপাত এলাকায় টিক গাছের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। অধিক পরিমাণে গাছ কেটে ফেলার ফলে এই বনগুলো প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে। অতীতে এই বনগুলো বেসরকারি আওতাধীন ছিল। বর্তমানে এইগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। নরম কাঠের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এই সব বনে শিমুল গাছ লাগানো হচ্ছে।

গঙ্গা–পদ্মা–ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে হুগলী নদী হতে রাবনা দ্বীপ এবং স্থলভাগের অভ্যন্তরে অনেক স্থানে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত। এই বনভূমির ২/৩ অংশ বাংলাদেশের অধীনে রয়েছে। এই বনাঞ্চলের নিম্ন বদ্বীপের অংশে অসংখ্য নদী আড়াআড়িভাবে পরস্পরকে ছেদ করে অবস্থান করছে। এই নবভূমি তিন চন্দ্রাতপবিশিষ্ট।

এই অরণ্যের নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা বিদ্যমান। এটি সুন্দর বন (beautiful forest), সুন্দরী বন (সুন্দরী গাছের সমাবেশ), সমুদ্র বন (সমুদ্রের নিকটবর্তী বন) বা চন্দ্রবন্ধ (Chandrabandha) গোত্রের বসবাসহেতু এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রকাশ। উৎপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, সুন্দরী গাছের নাম হতে এই বনের নাম সুন্দর বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ বনভূমিতে ঘন ঝোপ আকারে তালজাতীয় (Palmae) গাছ গড়ে উঠেছে এবং সুবিন্যস্ত শ্যামল ফাঁকা জায়গা প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র সুন্দরবন এলাকা সংরক্ষিত পর্যায়ের অন্তর্গত (reserved category)। বনটির যে সব ব্লক এলাকায় পূর্ণবয়স্ক গাছের সমাবেশ বিদ্যমান সেই সব বনের আশ্চর্যজনক ঘনত্ব (thickness of the forest) প্রকাশ পায়। আমাজানের সেলভার সাথে এই বনাংশ তুলনীয়। পূর্ব দিক হতে পশ্চিমে বনের আবরণের তারতম্য প্রকাশ পায়। কারণ হরিণঘাটা নদীর পশ্চিম হতে বদ্বীপের অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে পরিবর্তিত ঘটে। এই বনাঞ্চলকে দুটি প্রধান ভাগ অর্থাৎ কোবাডাক স্টেশন হতে হরিণঘাটা নদীর মোহনার নিকটবর্তী কাঁটাখাল পর্যন্ত রেখা বরাবর পূর্বাংশের মিঠা পানির অরণ্য এবং এই রেখার পশ্চিমাংশ মধ্যম পর্যায়ের লবণবিশিষ্ট পানির অরণ্যে বিভক্ত করা যায়। এই শিরোনামদ্বয় আপেক্ষিক অর্থ প্রকাশ করে। কারণ গ্রীষ্মকালে মিঠা পানি এলাকায় লবণাক্ত বেশি পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই অঞ্চলের নদীর পানির প্রাধান্য অরণ্যের উপর প্রতিফলিত হয়। কারণ এই বনাঞ্চল এলাকা সমুদ্রের গড় জোয়ার তলের নিচে অবস্থিত। তাই সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোহনাভিত্তিক এবং জলাভূমিভিত্তিক। মিঠা পানির বনাঞ্চলে পশুর, হরিণঘাটা এবং বুড়িশর নদীগুলোর দ্বারা প্রচুর মিঠা পানি প্রবাহিত হয়ে আসে। ফলে বনটি পশ্চিম অংশ অপেক্ষা এই অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশীয় পানির লবণাক্ত বৈশিষ্ট্য অতি নিম্নমানের পর্যায়ে থাকে। হরিণঘাটা হতে পশুর নদী মধ্যবর্তী অঞ্চলে সুন্দরী গাছ মোট গাছের ৭০% দখল করে রয়েছে। কিন্তু এই পরিমাণ কমে অর্পণগাছিয়া নদী বরাবর ৫০% এ দাঁড়িয়েছে। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ গাছ হচ্ছে গেওয়া (Gewa-*Excoecarica agallocha*)। এই বনাঞ্চলগুলোতে এ গাছের সংখ্যা ২০%। এই গাছের নরম অর্থাৎ কড়ি কাঠ (soft timber) খুলনায় নিউজপ্রিন্ট ফ্যাক্টরি এবং বিভিন্ন দিয়াশলাই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের সকল বনানী প্রজাতির মধ্যে এই গেওয়া গাছ সর্বাধিক কষ্টসহিষ্ণু গাছ হিসেবে পরিচিত তা জলাভূমি এলাকা, নদীর তীরের শুষ্ক বাঁধ (levee) এবং প্রথম সৃষ্ট ঠিক সমুদ্রমুখী এলাকায় এটি প্রথম জন্মলাভ করে। এই এলাকায় অন্যান্য উদ্ভিদ হচ্ছে ধুন্দুল (Dhundul-*Carapa obovata*), আমুর (Amur-*Amoora cuculla*), পশুর (Pasur-*Carapa obovata*), বেইন (Bain-*Avicennia tomentoa*), কাঁকড়া (Kankra-*Brugniera gymnorhiza*) এবং সোন্দল (Sondal-*Afzelia bijuga*)। দুই প্রজাতির তালজাতীয় গাছ হাতাল (Hantal-*Phoenix paludosa*) এবং গোলপাতা (Golpata-*Nipa fruticans*) যা উইলো গাছের অনুরূপ, কেরোয়া (Keroa-*Sonnteratia apetala*) ও ছোট আকারের গাছ—যেমন কিরপা (Kirpa-*Lumnitzera recemosa*), সিংরা (Shingra-*Cynometra remiflora*), সিঙ (Shing-*Cynontetra bijuga*), পরশ পিপুল (Parash pipul-*Thespesea populnea*) এবং ওরা (Ora-*Sonneratia acida*) লক্ষ্য করা যায়। এই বনের গুরুত্বপূর্ণ আগাছা সদৃশ বনানী হচ্ছে ভোলা (Bhola-*Hibiscus tiliaceus*), কেওয়া কান্ত (Kewa Kanta-*Pandanus*

odoratissimus), হোডো বা টাইগার ফার্ন (Hodo or Tiger Fern-*Achrostichum auruum*) এবং সুন্দরীলতা (Sundri lota-*Browntonia lanceolata*)। "মধ্যম পর্যায়ের লবণাক্ত" অঞ্চলে গেওয়া গাছের বেশ প্রাধান্য লক্ষণীয়। এখানে সুন্দরী গাছ কমতে থাকে ও গেওয়া সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে গরান ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। পশ্চিমে খুলনা–যমুনা নদী পর্যন্ত সুন্দরী অতি সাধারণ গাছ হিসেবে দৃষ্টিগোচরে আসে। গরান (Goran-*Ceriops roxburghiana*), দাবুর (Dabur-*Cerbera odallam*), করঞ্জ (Karanj-*Pongamia glabra*), কেনকটি (Kenkti-*Acanthus ilicifolius*), খালশি (Khasi-*Aegiceras corniculata*), বায়েন (Baen), পশুর, ভোলা এবং হানতাল পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ। গরান গাছ দ্বারা সৃষ্ট তলদেশের চন্দ্রাতপ এই অঞ্চলের বনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম সমুদ্র তীর সংলগ্ন এবং নদীর নিম্ন মোহনা এলাকায় চার শ্রেণীর গরান বন লক্ষ্য করা যায় : ভারা (Bhara-*Rhizophora mucranata*), গোরিয়া (Goria-*Kandelia rheedii*), গরান এবং কানাক্রা। একেবারে দক্ষিণের বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির বনানী যেমন—*Milreota oldenladiode* এবং *Mitrascame alsinoide* বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের অরণ্য ধ্বংস করার ক্ষেত্রে মানুষ, বায়ুপ্রবাহ, নদী এবং প্রাণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। টাইফুন (যার গতি প্রায় ২০০ কি.মি./ঘণ্টা) উপকূল সংলগ্ন বনের যথেষ্ট ধ্বংস সাধন করে, যেমন ১৯৬৫ এবং ১৯৭০ সালের টাইফুনের সাহায্যে সুন্দরবনের যথেষ্ট ধ্বংস সংঘটিত হয়েছিল। বদ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বছর নদীর গতি পরিবর্তন দ্বারা বনাঞ্চলের বনানীর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাণী যেমন চিতল হরিণ (Chital dear-*Axis axis*) কেওড়া গাছের পাতা ও ফল অতি ভক্ষণকারী জীব এবং এই হরিণগুলো অন্যদিকে সুন্দরী, কেওড়া, গেওয়া, আমুর এবং গোলপাতা গাছের চারাও নষ্ট করে ফেলে। বন্য শূকর এবং কাঁকড়া গাছের বীজের অঙ্কুরোদ্গমকে ব্যাহত করে। বাংলাদেশের অরণ্য সম্পদের যথেষ্ট অংশ গ্রাম্য এলাকা, প্রতি বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাছ এবং বাঁশ ঝাড় বিদ্যমান। অনুমান করা হয় যে, বসতবাড়ি সংলগ্ন বনের কড়ি কাঠ ও জ্বালানি কাঠের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ঘনমিটার। অন্যদিকে সরকারি বনভূমির কড়ি কাঠ এবং জ্বালানি কাঠের মোট পরিমাণ ৫ কোটি ঘনমিটার।

সরকারি বনভূমিগুলোর অগম্য (inaccessible) বৈশিষ্ট্যের কারণে বর্তমানের কাঠ ও বাঁশের চাহিদার অল্প পরিমাণ সরকারি অরণ্য সরবরাহ করে। ১৯০০ সালে পাহাড়ী বনভূমি হতে বাঁশ সংগ্রহের সংখ্যা ছিল ৮.১ কোটি। অন্যদিকে বাসভবন সংলগ্ন বনভূমি হতে ৮৩ কোটি বাঁশ সংগ্রহ করা হয়েছিল। একই সালে সরকারি সকল বনভূমির কাঠের উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৫৯.৮ লক্ষ ঘনফুট। অন্যদিকে ৭৭.০৭০ কোটি ঘনফুট কাঠ বাসভবন সংলগ্ন গাছ হতে সংগৃহীত হয়েছিল।

৯.২. প্রাণিকুল

বাংলাদেশে প্রাণিকুলের মোটামুটি ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বনাঞ্চলে এবং অন্যত্র এই প্রাণিকুল বসবাস করে। প্রাণিকুলের মধ্যে পশু, পাখি, সর্পজাতীয় জীব এবং পোকামাকড় অন্তর্ভুক্ত। জীববৈচিত্র্য (biodiversity) দ্রুত হ্রাস পাওয়ার কারণ হচ্ছে দেশটির পূর্বের

পরিবেশের অবনতি। বাংলাদেশ প্রাচ্য প্রাণিজগতের (oriental zoological region) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সীমাভুক্ত এলাকায় প্রায় ২০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব, ৬৫০ প্রজাতির পাখি, ১৫০ প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর (reptiles and batrachians) এবং ৩০০ প্রজাতির লবণাক্ত এবং মিঠা পানির মাছ বিদ্যমান।

৯.২.১. উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণী : প্রাইমেটের (Primate) মধ্যে বাংলাদেশে বানর, দীর্ঘভুজ উল্লুক, গিবন এবং ভামবিড়াল লক্ষ্য করা যায়। রেসাস বানর (Rhesus monkey-*Macaca mulatta*) এক সাধারণ প্রাণী হিসেবে বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৃহদাকৃতি হনুমান (Larger hanuman-*Simnophithecus entelluss*) সচরাচর দৃষ্টিগোচর না হলেও পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় এগুলো কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য দুই প্রজাতির হনুমান মায়ানমার সীমান্ত এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রাম সমুদ্র উপকূল বরাবর কাঁকড়া খাদক, ম্যাকাকুয়ে বসবাস করে। নর বানর 'হুলোক গিবন' (Hoolock gibbon-*Hylobates hoolock*) চট্টগ্রাম উপঅঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর ভামবিড়াল কৌতুহলী স্লো-লোরিস (Curious slow Loris-*Nycticebus concang*) বাংলাদেশের পূর্বদিকে ঘন অরণ্যে বাস করে।

৯.২.১.১. মাংসাশী প্রাণী (Carniivores) : বাংলাদেশে ৬ প্রজাতির বিড়ালজাতীয় প্রাণী (Felidae) লক্ষ্য করা যায়। বাঘ (Tiger-*Panthera tigris*) এক অতি বিখ্যাত এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ভীতি উদ্রেককারী প্রাণী। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কুখ্যাত মানুষ খেকো প্রাণী নামে পরিচিত। সুন্দরবন ছাড়াও চট্টগ্রাম উপঅঞ্চলে এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক বাঘ বিদ্যমান। চিতাবাঘ (Leopard-*Panthera pardus*) দৃষ্টিগোচরের দিক থেকে এক অতি সাধারণ প্রাণী। কিছু চিতাবাঘ বনের পরিবেশ হতে দূরে ঘনবসতি অঞ্চলে টিকে থাকার কৌশল অবলম্বন করতে পেরেছে। তাই পাবনা জেলায় চিতাবাঘ দেখতে পাওয়া যায়। চিতাবাঘগোত্রীয় বিড়াল (Leopard cat-*F. bengalensis*) বাংলাদেশের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এই বিড়াল কুখ্যাত মুরগী হরণকারী নামে খ্যাত। এই গোত্রের আরও তিন শ্রেণী ক্লাউডেড নেকড়ে বাঘ (Clouded Leopard-*F. nebulosa*), মার্বলড বিড়াল (Marbled cat-*F. marmorata*) এবং গোল্ডেন বিড়াল (Golden cat-*F. tenmincki*) চট্টগ্রামের পূর্ব উপঅঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। ফেলিডির অন্তর্ভুক্ত মেলানিজমও (Melanism) এখানে লক্ষ্য করা যায়। এই চট্টগ্রাম আবার একমাত্র অঞ্চল যেখানে কৃষ্ণ বাঘ (Black tiger) এর উপস্থিতি জানা যায় (Imperial Gazette, 1989)।

৯.২.১.২. লম্বা মাথাবিশিষ্ট বিড়ালজাতীয় প্রাণী (Virverridae) : বৃহৎ গন্ধগকুল (Civits the large-*Vivera zibetha*) এবং ছোট গন্ধগকুল (*Viverricula malaccenis*) পূর্ব অঞ্চলের অরণ্যে লক্ষ্য করা যায়। দুই শ্রেণীর নকুল বা বেজি, প্রথম শ্রেণী—যেগুলো সচরাচর দৃষ্টিগোচরে আসে সেগুলো হচ্ছে *Herpestes edwardsi* এবং দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি *H. auropunctatus*। সার্বজনীন নয় এবং কৌতূহল উদ্দীপক প্রাণীদ্বয় হচ্ছে তালগাছীয় গন্ধগকুল (Palm civet-*Paradoxurus hermaphroditus*) এবং বিনটারঙ্গ (Bintarong-*Arctictis bintarong*)।

৯.২.১.৩. **কুকুরজাতীয় প্রাণী** (Caninae) : এই উপ-গোত্রের মধ্যে শিয়াল (Jackal-*Canis aureus*) হচ্ছে অতি সার্বজনীন প্রাণী। এই প্রাণীর ভূতুড়ে বা ভৌতিক ডাক সর্বত্র শোনা যায়। এক প্রজাতির বন্য কুকুর (Wild dog-*Cyon alipnus*) পূর্বাংশের বনে লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর কুকুর দলবদ্ধভাবে হরিণ এবং শুকর শিকার করে থাকে। ক্ষুদ্রাকৃতি বাংলা শেয়াল (Small Bengal fox-*Vulpes bengalensis*) এক সার্বজনীন প্রাণী। দুই প্রজাতির ভোঁদড়, লুট্রো ম্যাক্রোডাস ও লুট্রো সিনেরি (Otter-*Lutra macrodus* এবং *L. cenerea*) বাংলাদেশে বিদ্যমান। মালয়ান কৃষ্ণ ভল্লুক এবং স্লথ ভল্লুক (Malayan Black Bear-*Ursus torquatus* এবং Sloth Bear-*Melursis ursinus*) চট্টগ্রাম অঞ্চলের গভীর বনভূমিতে কখনও কখনও লক্ষ্য করা যায়।

৯.২.১.৪. **কীটভোজী প্রাণী** (Isectivora) : বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির কাঁটাচুয়া (Hedge hog), গেছো ক্ষুদ্র পতঙ্গভুক (tree shrew) ও পতঙ্গভুক বিদ্যমান। কাইরোপটেরার (Chiroptera) অনেক প্রজাতি বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে বৃহৎ উড়ন্ত বাদুড়ের (Flying fox-*Pteropus giganteus*) কেবল বৃহৎ আকার ও বৃহৎ ঘুমাবার স্থান বা দাঁড়ের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বরং ফলমুলের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের জন্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট প্রাণী বর্গ যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান। পাঁচ প্রজাতির কাঠবিড়ালের মধ্যে মালয় (Malay-*Sciuropterus bicolar*) প্রজাতি হচ্ছে সর্ববৃহৎ। ছুঁচো ইঁদুর Mole rat-(*Nesocia bengalensis*) এবং ধেঁড়ে ইঁদুর (Bandicoot-*Nesocia nemorivaga*) ইঁদুর প্রজাতির মধ্যে বৃহৎ আকারের মুষিক। উত্তর ভারতীয় খরগোশ বা শশক (Northern Indian hare-*Lepus ruficaudatus*) এবং শক্ত লোমযুক্ত খরগোশ (Hipid hare-*Caprologus hispidus*) বাংলাদেশের কীটভোজী প্রাণী হিসেবে সচরাচর দৃষ্টিগোচরে আসে।

৯.২.১.৫. **খুরবিশিষ্ট প্রাণী** (Ungulates) : বর্তমানে বাংলাদেশে খুরবিশিষ্ট প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে খুরবিশিষ্ট প্রাণীর ভিন্নধর্মী প্রজাতি এবং প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। গণ্ডারের দুই প্রজাতি, মালায়ান ও সুমাত্রীয় সাধারণত অতীতে দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু ৫০ বছর পূর্বে এই দুই প্রজাতির প্রাণী বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। হাতি (Elephants-*Elephus maximus*) শুধু চট্টগ্রামের উপ বনাঞ্চল এবং উত্তর পূর্বাংশের সিলেটের বনে লক্ষ্য করা যায়। হাতির অনেক দল বর্ষা ঋতুতে ভারত ও মায়ানমারের উঁচু পাহাড়ে দেশান্তরিত হয়। অন্যগুলো বাংলাদেশেই থেকে যায়। বর্তমানে অনেক সময় সীমান্ত এলাকায় উপজাতির লোকজন হাতিকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়, যদিও হাতি মারা বা শিকার করা নিষিদ্ধ। অতীতে বন বিভাগ হাতির দলকে খেদায় আটকিয়ে বন্দি করত এবং বিদেশের চিড়িয়াখানায় এই হাতিগুলোকে সরবরাহ করা হতো। এই ব্যবসায় ছেদ পড়েছে। বর্তমানে টেকনাফের বনাঞ্চল হাতির জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। বন্য মহিষ ৫০ বৎসর পূর্বে সুন্দরবনে লক্ষ্য করা যেত। বর্তমানে এই প্রাণী বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বন গরু বা ব্যানটেং (Bon goru or Banteng-*Boss indaicus*) যা লোহিত পিঙ্গল বর্ণের বন্য ষাঁড় বলে পরিচিত সেগুলো উপজাতীয় লোকেরা কখনও কখনও পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। এই প্রাণীগুলো বান্দরবান এবং সাবেক পার্বত্য

চট্টগ্রামের পূর্বাংশের বনে লক্ষ্য করা যায়। চমৎকার ও বৃহৎ গউর বা এশিয়ান বাইসন (The magnificent Gaur or Asian Bison-*Bos gauras*) বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। বিরল কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপক বা আকর্ষণীয় প্রাণী হচ্ছে গোরাল (Gooral-*Cemas goral*) এবং সেরু (Serow-*Capricornis sumatrensis*)। স্থানীয়ভাষায় এগুলো হচ্ছে বন্য ছাগল। এগুলো মৃগ হতে কিছু ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এই ছাগল কখনও কখনও কৃষ্ণসার মৃগ নামে পরিচিত। বান্দরবান, চট্টগ্রামের পাহাড় এবং অত্যন্ত খাড়া ঢালের অন্যান্য পাহাড়ে এগুলো লক্ষ্য করা যায়।

৯.২.১.৬. **কৃষ্ণসার মৃগ** (Antelope) : প্রায় দুই দশক পূর্বে তেঁতুলিয়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিমে নীল গাই (Nilgai-*Boselephus tragocamelus*) ফসল কাটার সময় দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত এই বৃহৎ প্রাণী নেপালের টেরাই হতে এসেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো স্থানে এগুলো দেখা যায় না।

৯.২.১.৭. **হরিণজাতীয় প্রাণী** (Cervidae) : চিতল হরিণ (Chital-*Axis axis*) সুন্দরবনে যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান। এখানে এই হরিণগুলোকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ময়মনসিংহের মধুপুরের জাতীয় উদ্যান এবং সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাবলাখালি শিকার-অভয়ারণ্যে চিতল হরিণ প্রবর্তন করা হয়েছে। গর্জনকারী হরিণ (The Barking dear-*Muntiacas muntjac*) হচ্ছে এক ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণী। এই প্রাণী চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের বনে বাস করে। এসব এলাকায় বৃহৎ স্যামবার (Sambar-*Cervus unicolor*) লক্ষ্য করা গেলেও এর সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। শূকর শ্রেণীর হরিণ (The Hog Dear-*A. porcinus*) অতীতে সুন্দরবনে লক্ষ্য করা যেত। বন্যবরাহ (Wild boar-*Sus scrofa*) বাংলাদেশের অনেক স্থানে দেখা যায়। পূর্বদিকের পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকায় আমন ধান পরিপক্ব হওয়া এবং কাটার সময় এই প্রাণীগুলো যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটায়।

৯.২.১.৮. **দন্তরতিমির** (Cetacea) : এই গোত্রের প্রাণীর মধ্যে পদ্মা বা গাঙ্গেয় ডলফিন (Gangetic Dolphin-*Platanista gangetica*) অতি সাধারণ প্রাণী এবং এগুলো আশ্চর্যজনক হলেও মিঠাপানিতে বাস করে। এর সংখ্যা দ্রুত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে এবং এগুলো বিলুপ্তির পথে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভোতা নাকবিশিষ্ট শশক (The blunt nosed Porpoise-*Orcella brevirostris*) বঙ্গোপসাগরে যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান। ডানাবিশিষ্ট বৃহৎ তিমি (Large Fin Whale-*Physeter macrocephalus*) এই উপসাগরের উত্তরাংশে লক্ষ্য করা গেছে। আশ্চর্যজনক স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী, ডিউগং (Dugong-*Halicore dugong*) এই শতকের প্রথমদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর লক্ষ্য করা যেত। চকোরিয়া বন ধ্বংস হওয়ার পর সম্ভবত এই প্রাণীগুলো আর লক্ষ্য করা যায় না।

৯.২.২. পাখি (Aves)

বাংলাদেশে নয় শতের উর্ধ্বে বিভিন্ন প্রজাতি ও উপপ্রজাতির পাখি লক্ষ্য করা যায়। শুধু ২০০ প্রজাতির পাখি ঋতুভিত্তিক দেশান্তরের বৈশিষ্ট্যবাহী এবং অন্যান্যগুলো বাংলাদেশে সবসময় বাস করে। দেশী পাখির ২২০ প্রজাতি ও উপপ্রজাতি বনে বাস করে। বন উজাড় হওয়ার

ফলে এই প্রজাতির পাখিগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বসতি এলাকায় পাখির মধ্যে ৬ শ্রেণীর পাখি কর্ষিত এলাকা এবং শহর এলাকায় সর্বত্র বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে বাসা কাক (House crow-*Corvus splendens*), বাসভবন চড়ুই (House crow sparrow-*Passer domesticus indicus*), শালিক (Shalik-*Acridothers tristis*), কৃষ্ণ ফিঙ্গা (Black Drogo-*Dicrurus macrocercus albirictus*), রেডভেনটেড বুলবুল (Redvented Bulbul-*Pycnontus cafer bengalensis*) এবং পরিয়া চিল (Pariah Kite-*Milvus migrans govinda*)। এই পাখিগুলোর প্রায় অনুরূপ সার্বজনীনতার পাখি হচ্ছে দোয়েল (Doel-*Copsychus saularis*), বাবুই (Taitar Bird-*Orthotomus sutorius guzerate*), ময়না বা শালিক (Myna or Shalik-*Sturnopaster contra*), সাধারণ বাবুই পাখি (Common weaverbird-*Ploceus phillipinus*), হোয়াইট আই (White eye Zosterops-*P. palpebrosa*), সবুজ মৌমাছি খাদক (Green Bee-Eater-*Merops leschenaulti*) এবং সাধারণ মাছরাঙা (The Common Kingfisher-*Alcedo atkis bengalensis*)। দীর্ঘ পুচ্ছ ক্ষুদ্র টিয়া বাংলাদেশের আর এক শ্রেণীর পাখি। এই বিরক্তিকর পাখিগুলো ধান এবং মরিচ পাকার সময় ফসল দুটির যথেষ্ট ক্ষতি করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে লাল বুকবিশিষ্ট টিয়া পাখির (Redbreasted parakeet-*Psittacula alexamdri fasciatus*) ঝাঁকে ১০ হাজার পর্যন্ত টিয়া বিদ্যমান থাকে এবং এগুলো অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মাঠের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। অন্যদিকে শকুন দেখতে কুৎসিত হলেও স্ক্যাভেঞ্জার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে অনেক সংখ্যায় জলাশয় থাকার কারণে মাছরাঙার সংখ্যা অনেক বেশি। অন্যান্য মাছ শিকারী পাখি হচ্ছে পিঙ্গল মাছ পেঁচা (Brown Fish Owl-*Ketupa Zeylonensis leschenaulti*) এবং (অপ্রধান) প্যালাস মৎস্য শিকারী ঈগল (Pallas Fishing Eagle-*Haliaetus leucoryphus*)। শীতকালে তিব্বত, চীন এবং সাইবেরিয়া হতে যেসব পাখি বাংলাদেশে আগমন করে সেগুলো প্রধানত হাঁসজাতীয় যেমন—গাডওয়াল, উয়িডজেয়ন, সেলড্রেক, পোচার্ড ইত্যাদি (Gadwall, Widgeon, Sheldrake, Pochard etc.)। বাংলাদেশের হাওড় ও বৃহৎ বিলে হাজার হাজার সংখ্যায় হাঁসের দল লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ নদীতে নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বারবিশিষ্ট মস্তক হাঁসী (Barheaded geese-*Anser indicus*) লক্ষ্য করা যায়।

৯.২.২.১. সারাড্রিডি (Charadridae) : বাংলাদেশের জলাভূমিতে পাখাসদৃশ এবং দীর্ঘ সরু লেজবিশিষ্ট কাদা খোঁচা (Fantail and pintail snipes-*Capella gallinago* এবং *C. stenura*) এক অতি সাধারণ পাখি হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। টিট্টিভজাতীয় পাখিবিশেষ টিট্টিভ ও বালুতট–বিহারী তীক্ষ্ণ রবের পাখিগুলোও দেশের অনেক এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে শিকারোপযোগী পাখি হচ্ছে হাঁস, বিশেষ করে বালিখান বা কটন তিল (Balithans or cotton Teal-*Nettapus coromandelianus*), লাল বুনো মুরগি (Res jungle Fowl-*Gallus gallus*) শুধু পূর্বাংশের জঙ্গলে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ সবুজ কবুতর এবং অন্য চারাড্রিয়েডে পাখিসমূহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট ঘুঘু (Spotted Dove-*Streptopelia chinensis*) ও প্যাডি পাখি (Paddy Bird-*Ardeola grayii*) হচ্ছে অতি সাধারণ শিকারোপযোগী পাখি। বাংলাদেশের পাখিকুল সমৃদ্ধ এলাকা হচ্ছে দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট এবং এদেশের উত্তর–উত্তরাংশের অঞ্চলসমূহ।

৯.২.৩. সরীসৃপ প্রজাতি (Reptilia)

এই প্রজাতির মধ্যে কুমীর হচ্ছে সর্ববৃহৎ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জলাভূমির কুমীর (Swamp crocodile-*Crocodilus palastris*) সর্বাধিক সংখ্যায় বিরাজ করতো। এই কুমিরের প্রতি সকলের ভীতি বিদ্যমান। কারণ মানুষ খাদক হিসেবে এগুলো পরিচিত। এই শ্রেণীর কুমির বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস, যদিও সুন্দরবন এলাকায় এটি পরিদৃষ্ট হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। বৃহত্তর সামুদ্রিক কুমির (marine crocodile-*Crocodilus palastris*) বরিশাল এবং খুলনার সমুদ্র উপকূলে লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর কুমির চট্টগ্রামের উপকূলে লক্ষ্য করা যায় না। রাবনাবাদ দ্বীপগুলোর আশেপাশের সমুদ্রে এই কুমির সচরাচর দেখা যায়। ঘড়িয়াল (Gharial-*Garialis gangeticus*) এক শ্রেণীর কুমির যেগুলো মাছ খাদক, মানুষকে আক্রমণ করে না। এই প্রাণীও বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্নের পথে।

৯.২.৪. চেনোলিয়া (Chelonia)

বাংলাদেশের ১৮ প্রজাতির মিঠাপানি এবং ৪ প্রজাতির সামুদ্রিক লবণাক্ত (বঙ্গোপসাগরে লক্ষণীয়) প্রাণী বিদ্যমান। স্কোয়ামাটা (squamata) সাধারণত ব্যাপক সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায়। একুশ প্রজাতির গিরগিটির মধ্যে গৃহ গোকো বা টিকটিকি (House gockoes or Tik Tiki-*Hemidactylus* spp.) সবচেয়ে সর্বজনীন এবং অতি পরিচিত প্রাণী। বৃহৎ আকারের টোক্কের (Tokkay-*Gecko verticillatus*) উচ্চস্বরের (গ্রীষ্মকালীন দিনসমূহের বিকালে) জন্য বেশ পরিচিত। বিভিন্ন ভ্যারানাস গিরগিটি বা গুইসাপের (Varanus lizards) দৈর্ঘ্য ২.৫ মিটার প্রকাশ পায়। এগুলোর চামড়া মূল্যবান। এজন্য এই প্রাণীগুলো অতি শিকারের আওতায় পড়ার ফলে এগুলো প্রায় নিশ্চিহ্নের পর্যায়ে এসেছে। সাপের অনেক প্রজাতি বিদ্যমান। সাপ অধ্যুষিত এলাকাগুলো হচ্ছে সাবেক রাজশাহী, কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলা। ক্ষুদ্রাকৃতি সাপ হচ্ছে অটল কুইচা (Atal Kuicha-*Typhlops braminus*) এবং এগুলোর দৈর্ঘ্য বড়জোর ৭ ইঞ্চি এবং বৃহৎ আকার ঊর্ধ্বে ৬ মিটারবিশিষ্ট জালক পাইথন (Reticulated Python-*Python reticulatus*) লক্ষ্য করা যায়। ইঁদুরে সাপের (Rat snake) মধ্যে অতি সাধারণ হচ্ছে ধামন (Dhamon-*Zamenis mucosus*) সাপ। এই শ্রেণীর সাপ ঊর্ধ্বে ৭ ফুট দৈর্ঘ্যে পৌঁছে। মানুষের বসতি সংলগ্ন এলাকায় এই সাপগুলো বাস করে এবং কৃষকগণ কদাচিৎ এই সাপগুলোকে উত্তেজিত করে থাকে। অতি ভয়ঙ্কর বা মারাত্মক প্রজাতির সাপ হচ্ছে বৃহৎ গোখুরে সাপ বা কালোকেউটে (King cobra-*Naga bungarus*), ক্রেট (Krait-*Bungarus caeruleus*) এবং রাজসাপ বা রাজাসাপ (King snake-*Bungarus fasciatus*)। গোখরো সাপ এবং রাজা সাপ (King snake) প্রধানত অন্য সাপ খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে।

৯..২.৫. বট্রাচিয়ান (Batrachian)

প্রজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাট্রাচিয়ানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ নয়। বর্ষা ঋতুতে ভারি বৃষ্টিপাত বা বর্ষণের পর নিচু এলাকার জলাভূমি হতে এগুলোর বিরামহীন শ্রুতিকটু ধ্বনি

চলতে থাকে। দুই প্রধান শ্রেণী হচ্ছে (ক) ক্ষুদ্র সবুজ রানা সিয়ানো ফ্লিকটিস (*Rana cyanophlyctis*) ব্যাঙ এগুলো লাফ দিয়ে পানি পৃষ্ঠে অবস্থান নেয় এবং (খ) বৃহৎ আকারের রানা টাইগ্রিনার ব্যাঙের দেহ প্রায় ৭ ইঞ্চি লম্বা। এর পা বেশ দীর্ঘ এবং মুখ এত বৃহৎ যে এগুলো সময় সময় হাঁস এবং মুরগির বাচ্চা গিলে খেয়ে ফেলতো। অতীতে ব্যাঙের পা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বাধা না থাকার ফলে কিছু সংখ্যক প্রজাতির বৃহৎ ব্যাঙ বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এটি ছাড়াও ফসলে রোগবালাই নিধনের বিষজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ ব্যাঙের সকল প্রজাতিকে নিশ্চিহ্নের পথে নিয়ে এসেছে।

৯.২.৬. কীটপতঙ্গ

বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যায় প্রজাপতি এবং কীটপতঙ্গ বিদ্যমান। বলা হয় এগুলোর প্রজাতির সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। এগুলোর মধ্যে কয়েকশ অতি সুন্দর এবং কৌতূহল উদ্দীপক (interesting)। হকমথ বা দেয়ালি পতঙ্গ (বা ভ্রমর hawk moths-Spingidae) সুস্বাদু পানীয়ের জন্য ফুলসমূহের উপরে গুঞ্জনবিশিষ্ট পাখির অনুরূপ ইতস্তত উড়ে বেড়ায়।

৯.২.৭. মাছ

বাংলাদেশে অনেক প্রকার মাছ বিদ্যমান। মাছ বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কার্প প্রজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মাছ বাংলাদেশের পুকুর, খাল-বিল-হাওড়, নদী মোহনান্ত জলাশয় ও ভেড়ি এবং বঙ্গোপসাগরে লক্ষ্য করা যায়। কাতলা (*Catla catla*) রুই (Rui-*Labeo rothia*), মৃগেল (Mrigel-*Cirrhina mrigala*) এবং কাল বাউশ (Kalbaus-*Labeo calbasu*) পুকুরে পালন করা হয় এবং পুকুরে এই মাছগুলোর পোনা ছাড়ার প্রয়োজন পড়ে। এই মাছগুলো ছাড়াও শোল (Shole-*Ophicephalus striatus*), বোয়াল (Boal-*Wallago alli*), চিতল (Chital-*Notopterus chitala*), মাগুর (Magur-*Clarias batrachus*), শিং (Shing-*Hetero phneustes fossilis*), বাটা (Bata-*Cirrhina reba*) এবং শরপুটি (Sharputi-*Barbus sarana*) যেমন পুকুরে লক্ষ্য করা যায় তেমনি এই মাছগুলো বিল, হাওড় ও বাওড়ে বাস করে। এই মাছগুলো ছাড়াও এসব জলাশয়ে জাগুর (Jagur- *Clarias jagur*), কই (Koi-*Anabas tesludineus*), বাচা (Bacha-*Eutropichthys vacha*), চাপিলা (Chapila-*Gadusea chapra*), টাকি (Taki-*Ophic cephalus*) এবং পাবদার বাসস্থান। বর্ধনশীল মাছ তেলাপিয়া (Tilapia-*Tilapia mossambica*) ও দ্রুততর বর্ধনশীল মাছ, নাইলোটিকা (Nilotica-*Tilapia nilotika*) যথাক্রমে ১৯৫৪ ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে চাষের প্রচলন শুরু হয়। চীনের মাছ সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, ব্ল্যাক ও বিগহেড কার্প বাংলাদেশে চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে। এজন্য এই মাছগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মাছগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পুকুরে কাঁচো চিংড়ি (Kuncho chingri-*Palaemonla marii*) ও কয়রা ইচা (Kaira Icha-*P. dayanus*) এবং এই দুই শ্রেণীর চিংড়িসহ গোদা চিংড়ি নদী ও বিলে লক্ষ্য করা যায়। চিংড়ি মাছ চাষের মোট এলাকার পরিমাণ ১৯৮৫-৮৬ সালে ছিল ৮২,৬৪৬ হেক্টর।

৯.২.৮. মৎস্যজাতীয় প্রাণী

নদী মোহনাস্থ মৎস্য এলাকা বৃহৎ প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর এবং এই ক্ষেত্রগুলো মৎস্য সমৃদ্ধ এলাকা বলে পরিচিত। এসব জলাশয়ে বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া, কাছিম এবং ঝিনুক লক্ষ্য করা যায়। এই জলাশয়গুলোতে সামুদ্রিক ভেটকি (Bhetki-*Lates calcifer*), তপসি (Topshi-*Polynemus paradiseus*), টেরাভাঙ্গন (Terabhangan-*Polynemus indecus*) ও ইলিশ প্রধান। মিঠাপানির কই, ট্যাংরা (Tengra-*Mystus vitatus*), রাঙচ গোলাস (Rangchgolash-*M. gulio*), এয়ার (Air-*M. aor*), বাঁশপাতা (Bashpata-*Cynoglossus hamiltonii*), পাঙ্গাস (Pungush-*Pungus pungasius*) এবং আরও কিছু সংখ্যক মাছ বাস করে। ভেড়ির অভ্যন্তরের জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ বর্তমানে চাষকৃত চিংড়ি মাছকেন্দ্রীক। ভেড়ি হচ্ছে নিকটবর্তী নদী সংযুক্ত পানি প্রবেশপথের সাহায্যে ধানী ভূমির চতুষ্পার্শস্থ বাঁধবিশিষ্ট জলাশয় এলাকা। মৌসুমী ঋতুর আরম্ভের সময় হতে নদীর জোয়ারের পানির সাথে বড় মাছ উপরে বর্ণিত পথ দ্বারা ক্ষেত্রগুলোতে প্রবেশ করে থাকে। যথেষ্ট সংখ্যক মাছ প্রবেশের পর ভেড়ি সংলগ্ন নদীর সাথে সংযুক্ত পথ বন্ধ করে মাছগুলোকে আটকে ফেলা হয়। এই পদ্ধতির ভেড়িগুলোতে ভেটকি, টেংরা, ভাঙ্গন (Bhangon-*Mugil tade*), তারুল (Tarul-*M. parsia*) এবং করসুলা (Corsula-*M. corsula*) প্রবেশ করে। মোহনাস্থ জলাশয়গুলো ও ভেড়ির চিংড়ি মাছগুলো হচ্ছে বাগদা চিংড়ি (Bagda Chingri-*Penaeus semisulcatus*), চাপদা চিংড়ি (Chapda chingri-*P. indicus*), বাগতারা ইচা (Bagtara Icha-*Parapeneopsis sculptiles*), গুড়া ইচা (Gura Isha-*Leander styliferus*) এবং গলদা চিংড়ি (Golda Chingri-*Palaemon lamarric*)।

৯.২.৯. কাছিমজাতীয় প্রাণী

কাছিম ও কচ্ছপ (Turtle and Tortoise) অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং সমুদ্রে বাস করে। মিঠা পানিতে কাটুয়া (Kattua) ও কাছিম বাস করে। সামুদ্রিক কচ্ছপ হচ্ছে চেলোনিয়া (Chelonia)। খাউলা (Khaula-*Trionys gengeticus*), ধালুয়া (Dhalua-*T. hurum*), জাট্টা (Jatta-*Pelochelys bibroni*), সিম (Sim-*Chitra indica*), সিন্ধি (Shindhi-*Lissemys punctata*) প্রভৃতি হচ্ছে কাছিমের বিভিন্ন শ্রেণী। কাছিমের প্রধান শ্রেণীগুলো হচ্ছে, কালি (Kali-*Hardella thurgi*), হলদি (Haldi-*Morenia peterlsi*) এবং পোরো (Poro-*Kachuga tectum*)। কচুগা সিলহেটেনসিস (*Kachuga sylhetensis*) সিলেটের জলাশয়ে লক্ষ্য করা যায়। পদ্মা নদীর শুশুক (Ganges porpise-*Platanista gangetica*) পদ্মা নদীতে লক্ষ্য করা যায় এবং মূল্যবান তেল প্রক্রিয়াজাত করার জন্য এগুলো শিকার করা হয়। এই শ্রেণীর শুশুকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে।

অতীতে সামুদ্রিক মৎস্য শিকার উপকূল হতে ২০ মাইল দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে নৌকার যান্ত্রিকীকরণের ফলে সমগ্র মহীসোপানীয় এলাকায় (২০০ মিটার গভীর) এটা বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশের মহীসোপানীয় এলাকার মোট আয়তন হচ্ছে ৬৬,৪৪০ বর্গকিলোমিটার। এসব এলাকার প্রধান মাছ হচ্ছে ভেটকি, লুকওয়া (Luckwa-*Polynemus indicus*), লোটিয়া (Lotia-*Harpodon nereus*), চেলা (Chela-*Chirocentrus dorab*), চুরিমাছ (Churimach-*Trichinur hanmela*), খৈবাল

(Khaibal-*Cromileptes attivelis*), খয়ের (Khair-*Clupe afimbriata*), নূর হিলশ (Nurhilsa-*Clupia toli*), খানদা মাগুর (Khanda Magur-*Pristis cuspidatus*), জুলিয়া মাগুর (Julia Magur-*Zygaena blochii*), হ্যামারহেড সার্ক (Hammerhead shark), দিওয়া-অ্যান ইলেকট্রিক রে (Dewa-an electric ray-*Astrpe diptenygia*), ফিদোমিনি (Phedomini-*Petroplatea micrura*), ফেসা (Fessa-*Eugraulis parva*), ওলুয়া (Olua-*Coiliadassumieri*), টুটিয়া (Tutia-*Belone choram*), দাঁতিনা (Datina-*Chrysophrys datina*), ভোলা (Bhola-*Scheama Semiluctuosa*), হোয়াইট পোমফ্রেট (White pomfret-*Stromateus sinensis*) এবং রূপচাঁদা (Rupchanda-*S. cinereus*)।

৯.২.১০. শামুকজাতীয় প্রাণী

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মিঠাপানির লক্ষ লক্ষ শামুক সংগৃহীত হয়। সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন পানিতে বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকায় প্রচুর সংখ্যক শামুক বা ঝিনুকের বাসস্থান। প্রধান প্রধান ঝিনুক হচ্ছে ক্ল্যাম্প (Clamps-*Meretris*), টপ (Tops-*Trochidae*), হর্ন (Cerithiliade), স্ক্রু (Screw-*Turrittelledae*), অলিভ (Olive-*Olividae*) এবং কাউরি। মুক্তা বহনকারী প্রজাতির ঝিনুক হচ্ছে পিয়ালী নওটিলাস (Nautilus-*Nautilus pompilius* এবং *Amussium plenronectes*)।

৯.২.১১. অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী

গত ৫০/৬০ বছরের মধ্যে গণ্ডার, বন্য মহিষ, বড় শিঙ্গার (Bara Singa) হরিণ বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। গৌর এবং সাম্বর (Gaur and Sambre) হরিণ নিশ্চিহ্নের পর্যায়ে রয়েছে। বারকিং হরিণ (Barking deer) অবিচারে শিকার করা হচ্ছে। তাই এগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে। হর্ণ বিল (শিঙ্গযুক্ত পাখি) (Hornbill) এবং প্যাঙ্গোলিনের (Pangolin) তেলের দ্বারা গ্রাম্য ওষুধ তৈরির জন্য অত্যধিক শিকারের কারণে এই ক্ষুদ্র শ্রেণীর জীবও বাংলাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে। কাদাখোঁচা ও হাঁস জালের ফাঁদ দিয়ে প্রচুর সংখ্যায় শিকার করা হচ্ছে। কিং ক্র্যাব (King crab-*Tachyphies gigus*) জীবন্ত জীবাশ্ম হিসেবে স্মৃতিচিহ্নের জন্য প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে। সুতরাং এই জীবও নিশ্চিহ্নের পথে।

বর্ণিত তথ্যের আলোকে জীবমণ্ডলীয় সংরক্ষিত এলাকার অতি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে চারটি জাতীয় পার্ক এবং শিকারের জন্য একটিসহ (one game reserve) সাতটি বন্য জীব সংরক্ষণের আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে এগুলোর ভূমিকা না থাকার কারণে সীমিত পর্যায়ে থাকলেও ভবিষ্যতে এগুলো প্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

Allee, W.C.; Emserson. 1949. Principles of Animal Ecology, W.B. A.E; Park, O; Park. T.& Saundes, Schimdt, K.P.

Anderson, M.S. 1951. The Geography of Living Things. English Univ. Pub.

Balling, W.D. 1964. Plants and Ecosystem, McMillan.

Boulenger, G.A. 1890. Fauna of British India. London.

Campbell, D.H. An Outline of Plant Geography.

Chapman, R.N. 1931. Animal Ecology. McGraw Hill.

Cole, M.M. 1964. Biogeography in the Service of Man. Inangural Lecture, Bedford College.

Dansereau, P. 1957. Biogeography : An Ecological Perspective. Ronal Press.

Darlington, P.J. 1957. Zoogeography. John Wiley and Sons.

Day, F. 1976. Fishes in India. London.

Ekman, S. Trnsl, E. 1953. Zoogeography of the Sea. Sidwick and Jackson Ltd. Palmer.

Eyre, S.R. 1963. Vegetation and Soils : A World Picture Edward Arnold.

Fitter, R. & Leigh Pemberson, J. 1968. Vanishing Wild Animals of the World, Midland Bank and Kaye & Ward.

Fullar, H.J. 1995. Plant World. Henry Holt & Co.

George, W. 1962. Animal Geography, Heinemann.

Good, R.D. 1953. The Geography of Flowering Plants, Longmans.

Hardy, M.E. 1952 . The Geography of Plants. Clarendon Press.

Hesse, R.; Allee, W.C.and Schmidt. K.P. 1951. Ecological Animal Geography. John Wiley and Sons.

Koopowitz, H. 1990. Plant Extinction (2nd Ed).

Money, D.C. 1965. Climate, Soils and Vegetation, University Tutoiral Press London.

Neil, W.T. 1969. The Geography of Life. Columbia University Press.

Newbigin, M.I. 1936. Plant and Animal Geography. Methuen.

Odum, F.P. 1970. Fundamentals of Ecology, W.B. Soundera

Polunin, N. 1960. Introduction to Plant Geography, McGraw Hill.

Rahman, A.K.A. Fresh Water Fishes of Bangladesh.